শতাব্দীর
অভিশাপ

SATABDIR ABHISHAP

—Bedouin

Rupees Eight only.

শতাব্দীর অভিশাপ

বেদুইন

ক্লাসিক প্রেস
৩/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অনুরাধা গোস্বামী

কল্যাণীয়াসু—

এই লেখকের—

ঘানার কালোমানুষ

সিয়া একটি গোপন চক্র

হ্যানয় থেকে সাইগন

পথে প্রান্তরে ১ম ও ২য় পর্ব

কবি কংক (রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত)

রাজনীতির দাবাখেলা

রূপ রস রঙ্গ

বাদশা বেগম নফর, ইত্যাদি।

এক

কোন লগনে জনম আমার?—সেদিন আকাশে মেঘ ছিল, বাতাসে ছিল তুফান, অঝোরে কেঁদেছিলেন বরুণ দেবতা, ধরা প্লাবিত হয়েছিল আকাশের অশ্রুতে, খরতোয়া খরতর হয়ে উন্মাদিনী প্রকৃতির সঙ্গে হেসেছিল অট্টহাসি। সেই লগ্নের সঙ্গে সজ্ঞানে সাক্ষাত পরিচয় ঘটেনি, তবুও আমার মনের সঙ্গে এই ক্ষণটির বড়ই আত্মীয়তা, এর সঙ্গে পরিচয় ও যোগাযোগ সৃষ্টি করিয়ে দিয়েছিলেন গর্ভধারিণী। ক্ষণহীন মনের কোনায় ঐ ক্ষণটি স্থায়িত্ব-লাভ করেছিল আমার অজান্তে; কারণ, জ্ঞানলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মুখে শুনেছি ঐ অশুভক্ষণের কথা।

মা বলতেন, কু-ক্ষণে তোর জন্ম, 'কু' দিয়েই কাটবে তোর জীবন, 'কু' নিয়েই চলবে তোর জীবিকা। তোর জন্মদিনে বন্যায় ভেসে গিয়েছিল দেশ, সাতদিন বয়সেই তোর বাপ মরেছে, এরপর তোর জন্য জমা রয়েছে দুর্ভাগ্য।

ছোটবেলায় মায়ের এই হিতবাণীর সারমর্ম গ্রহণ করতে পারতাম না। মায়ের মুখের দিকে অবাক দৃষ্টিপাতে ব্যাখ্যা জানতে চাইত আমার ছোট ছোট দুটো ভীরু চোখ। মৌন প্রশ্নের উত্তর দেননি জননী। দেবার প্রয়োজনও হয়ত ছিল না। দুর্ভাগাকে দুর্ভাগা বলার পর কোন ব্যাখ্যার দরকার কোন সময়ই হত না, হয়ও না। আমার আগ্রহও খুব বেশি ছিল না ব্যাখ্যা শোনার। চোখের জিজ্ঞাসা মনের-কোনায় কোন দাগ কাটতে পারত না।

ছোটবেলা কেটে গেছে মায়ের পায়ের কাছে শুয়ে। মাতৃস্তন্য পানের কোন নজীর আমার কাছে নেই, নজীর কারও কাছেই বোধহয় নেই। যখন ধীরে ধীরে বুঝতে শিখলাম তখন মাকে

দেখতে পেতাম সকালে আর সন্ধ্যায়। সারাদিন কোথায় যেন যেতেন কাজ করতে। আমি একাই থাকতাম সারাদিন আমাদের ঘরে। পাশের ঘরের মেনিমাসী মাঝে মাঝে খবর করত। দুরন্তপনা আমি করতাম না, করবার মত দেহের সামর্থ্যও আমার ছিল না। চুপ করে বসে থাকতাম একাই, তাই বোধহয় মা খুশী মনে নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারতেন বাইরে কোথাও।

রাতের বেলায় মা ফিরতেন। হাতে থাকত থালা বোঝাই ভাত তরকারী। আমরা দুজনে খেতাম, কিছুটা থাকত সকালবেলায় খাবার জন্য। সকালের সেই বাসী ভাত-তরকারী খেয়ে আমার দিন কাটত। সারাদিন খিদে লাগলেও আর খেতে পেতাম না, কোন কোনদিন মেনিমাসী মুড়ি দিত দু'এক মুঠো। তাই বসে বসে চিবোতাম, আর অপেক্ষা করতাম মায়ের জন্য।

পাঁচ পেরিয়ে ছয়ে পা দিয়েছি।

পরিবেশকে বুঝবার মত ক্ষমতা জন্মাচ্ছে ধীরে ধীরে। নতুন পৃথিবীকে চোখ ভরে দেখতাম, শুনতাম নতুন নতুন কথা। ময়নার মত কথাগুলো নিজে নিজে আউড়ে নিতাম মাঝে মাঝে; যা দেখতাম তাই নতুন, আরও দেখবার বাসনা জাগত মনে কিন্তু কোন রকমেই বস্তিবাড়ির সেই গণ্ডীটুকু পেরিয়ে বাইরে যেতাম না। মায়ের নিষেধ। সমবয়সী আরও ক'জন ছেলে উঠোনে খেলত, খেলতে খেলতে তারা বাইরে যেত। আমি না পারতাম খেলায় যোগ দিতে, না যেতাম বাইরে। সবাই জানত আমি রোগা ছেলে, আমি ছুটোছুটি হুটোপুটি ভালবাসি না। তা করবার ক্ষমতাও আমার ছিল না।

মেনিমাসী আমাকে মাঝে মাঝে আদর করত, আর আদর করত নিরুপিসী ও অসীম হালদার। মেনিমাসী কখনও বাইরে যেত না, অনিল মেসো সন্ধ্যাবেলায় আসত। পরনে তার বেশ চিকনাই ধুতি আর আদ্দির পাঞ্জাবী। তাকে মাঝে মাঝে দেখতাম,

কখনও তার সামনে যেতাম না। নিরুপিসী গতর খাটানো লোক। বাবুদের বাড়িতে ঠিকে কাজ করে। সকাল সন্ধ্যায় কাজ শেষ করে নিজেই রান্না করত। রান্নার সময় আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে ভূত-পেত্নীর গল্প বলত। আমি চুপ করে বসে বসে শুনতাম।

অসীম হালদার সন্ধ্যার পর আমাদের ঘরে আসত। কোন কারখানায় কাজ করত শুনেছি, কেউ বলত অসীম হালদার নিজেই কারখানার মালিক। বেশি জানতে চাইনি কখনও, প্রয়োজনও ছিল না। জানবার মত বয়সও তখন ছিল না।

অসীম হালদারের গায়ের রং শ্যাম, স্বাস্থ্য নিটোল। চেহারার সবটা আজ মনে নেই, তবে সুপুরুষ ছিল বলেই আমার মনে হয়। পান খেত প্রচুর, দোক্তার কৌটোটা ট্যাঁকে নিয়েই আসত সন্ধ্যার পরে। মা না আসা অবধি আমার সঙ্গে গল্প করত। কোনদিন নিরুপিসীর ঘরে থাকলে ডেকে আনত। কখনও কখনও চানাচুর অথবা বাদাম ভাজা দিত আমাকে। কোলে বসিয়ে মাঝে মাঝে গালে চুমু দিত। আমিও তার আদর পেয়ে আত্মহারা হয়ে পড়তাম। অনেক ক'দিন তার গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম। ঘুমিয়ে পড়লে সে রাতে আর খাওয়া হত না। ডেকে তুলে খেতে দেওয়া মায়ের কুষ্ঠিতে ছিলনা। পরের দিন সকালবেলায় রাতের বাসী খাবার পেট ভর্তি খেতাম। যেদিন জেগে থাকতাম সেদিন মায়ের সঙ্গে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়তাম। তখনও অসীম হালদার আর মা গল্প করতেন বসে বসে। আমি শোবার আগে অসীম হালদারকে দেখতে পেলেও ঘুম থেকে উঠে দেখতে পেতাম না। আমি মনে মনে অসীম হালদারকে সকালবেলায় খুঁজতাম, তাকে কোথাও না পেয়ে হতাশ হতাম।

অসীম হালদার সম্পর্কে অসীম ঘৃণা থাকাই উচিত কিন্তু হয়েছে উল্টো। কেমন যেন অনুভূতি রয়েছে মনে। শিশুমনের

ওপর তার যে অস্পষ্ট ছবি তা আজও মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে। আজও ভাবি অসীম হালদারের স্নেহ ছিল অকৃত্রিম। মায়ের কাছে যা প্রাপ্য ছিল তার কণিকাও যদি পেতাম তা হলে অসীম হালদারের স্নেহ অকিঞ্চিৎকর হত নিশ্চয়ই।

ভাল করে জানতে পারিনি বাবার পরিচয়। শুনেছিলাম তার নাম। কোন এক সময়ে তাঁর বাসস্থান ছিল পশ্চিমবঙ্গের কোন অখ্যাত পল্লীতে। সেখান থেকে কর্মব্যপদেশে গিয়েছিলেন পূর্ববঙ্গের কোন অজ পাড়াগাঁয়ে। সেখানেই বিয়ে হয়েছিল আমার মায়ের সঙ্গে। যেটুকু বললাম, তার কিছুটা সত্য কিছুটা অনুমান।

মা সব কথা বলতেন না। প্রতিবাসীরা যা শুনেছিল তাই আমি শুনেছি।

অবশ্য মা ছিলেন সুন্দরী। বাবাকে দেখিনি, শুনেছি তিনিও ছিলেন রূপবান। মেনিমাসী আর নিরুপিসীব কাছে শুনেছি বাবা রাগ করে চাকরি ছেড়ে কলকাতায় এসেছিলেন ভাগ্য অন্বেষণে। আমার জন্মের সাতদিনের মধ্যেই হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে গাড়ি চাপা পড়ে মারা যান। আমার জন্মের দিনে খুবই দুর্যোগ ছিল, মা-ও খুব অসুস্থ ছিলেন। বাবা রোজ বিকেলে যেতেন মাকে দেখতে হাসপাতালে। হাসপাতাল থেকে বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে ফিরছিলেন। নতুন সড়ক পেরিয়ে আসতেই গাড়ি চাপা পড়েন। দুদিন তার কোন পরিচয় কেউ জানতে পারেনি। নিরুপিসীই সনাক্ত করেছিল তাঁকে, তখন তাঁর জ্ঞান ছিল না। পরদিন তিনি মারা যান।

নিরুপিসী গিয়েছিল মাকে দেখতে। মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, বউ মানিককে তো দেখছি না দু'দিন।

সে তো বাড়ি গেছে পরশু। আমার কাছে এসেছিল, বলল, কাজ বেশি, সময় কম। হয়ত কাল পরশু আসবে না। আমি ভাবছি সেজন্যই বুঝি আসে না। কারখানায় খবর করেছ নিরুদি।

না। তাহলে খবর করতে হয়।

মা উদ্বিগ্নভাবে বলেছিল, তাই কর। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এস নিরুদি।

নিরুদিদি কারখানায় খবর করেছিল, শেষে থানায়, থানা থেকে হাসপাতালে। একই হাসপাতালে মা আর বাবা। কেউ কারও খোঁজ জানে না।

বাবা মারা গেলে নিরুপিসীই তার সৎকারের ব্যবস্থা করেছিল। কাঁচা পোয়াতি বলে মাকে সংবাদ জানায় নি।

হাসপাতাল থেকে নিরুপিসীই আমাদের নিয়ে এসেছিল। বাড়িতে এসে বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মা একেবারে গুম হয়ে বসল। সেদিন থেকে আমাকে বুকের দুধও খেতে দিত না। কেমন একটা বিতৃষ্ণা তার মনে।

এ সবই শোনা কথা।

আরও শুনেছিলাম, অসীম হালদার প্রথম এসেছিল বাবার পাওনা টাকা মেটাতে। তারপর থেকে মাঝে মাঝেই আসত মায়ের খবর নিতে।

বিরূপ ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলেন মা। অসীম হালদারের সহানুভূতি ক্রমেই আবিষ্ট করেছিল মাকে। নইলে বাবা মারা যাবার বছর ঘুরতে না ঘুরতে অসীম হালদার নিশ্চয়ই কায়েমীভাবে আসা যাওয়া করতে পারত না।

বাল্যের সঙ্গী আমার কেউ ছিল না, সঙ্গ পেতাম মায়ের। কিন্তু সে সঙ্গ বয়স বাড়বার সাথে সাথে তিক্ত মনে হত। মাতৃস্নেহের ভরাডুবি কেন ঘটেছিল তা বুঝবার আগেই আমার ভাগ্যবিপর্যয় ঘটালেন জননী স্বয়ং।

জননী তার একমাত্র সন্তানকে বিশ্বের করুণাপ্রার্থী করে বিদায় নিলেন একদিন, আমি-ই বোধহয় তাঁর জীবনে একমাত্র বন্ধন, তাই বন্ধনমুক্ত হতে একদিন খুব ভোরে ঘুমন্ত সন্তানকে বস্তির

ঘরে ঈশ্বরের ভরসায় রেখে অসীম হালদারের হাত ধরে বিদায় নিলেন। আট বৎসর অপেক্ষা করবার পর হঠাৎ ঘর ছাড়বার কারণ শুনেছিলাম নিরুপিসীর কাছে। নিরুপিসী বলেছিল, পোয়াতির আবার লজ্জা কিসের। যখন লজ্জা করার ছিল তখন তো বেহায়াপনা করেছিলি, ছেলেটাকে ভাসিয়ে পালিয়ে কেন গেলিরে বাপু! আমরাও তো তোর মতন। কে তোকে ছোট করে দেখবে বলতো।

মা যখন চলে গেলেন তখন আমার বয়স ছিল আট। এখন বয়স আটত্রিশ।

সুদীর্ঘ তিরিশটা বছর কেটে গেছে ঘটনার স্রোতে গা ভাসিয়ে। পেটের দানা সংগ্রহের জন্য সে যে কি ভীষণ সংগ্রাম তা বলে বুঝানো সম্ভব নয়। এমন সময় গেছে যখন একদানা চালকে মনে হয়েছে এক তোলা সোনার চেয়ে মূল্যবান।

সকালবেলায় উঠে দেখি মা ঘরে নেই।

ভাত ঢাকা ছিল।

মুখ ধুয়ে এসে রোজকারমত ভাত খেয়ে মায়ের অপেক্ষায় বসেছিলাম। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল তবুও মায়ের দেখা নেই।

কাঁদছিলাম।

মেনিমাসী আমার কান্না শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

জিজ্ঞেস করল, কাঁদছিস কেন নিমু?

কাঁদতে কাঁদতে বললাম, মা কোথায় গেছে মাসী?

তা তো জানি না। কাজে গেছে বোধ হয়। আসবে এখুনি। কাঁদিসনা।

কান্না থামিয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হল।

খিদেয় পেটের নাড়ীভুঁড়ি হজম হবার উপক্রম।

আবার কাঁদছি।

মেনিমাসী এসে বললে, তাইতো তোর মা এখনও তো ফিরল না। খেয়েছিস কিছু ?

না।

আয় আমার সঙ্গে। বিরজার আক্কেলের বলিহারি। ছেলেটা না খেয়ে আছে সারাদিন, ঘরে ফেরার নামটি অবধি নেই। আয় আমার সঙ্গে।

ভাবছিলাম এ সময় অসীম হালদার রোজ আসে। আজ এলে নিশ্চয়ই খাবার ব্যবস্থা করবে। তাই বললাম, পরে যাব মাসী।

পরে গেলে পেট শুনবে কেন! চল আমার সঙ্গে। কিছু খেয়ে এসে শুয়ে পড়।

মেনিমাসীর সঙ্গে তার ঘরে গিয়ে বসতেই কাগজের ঠোঙাতে কয়েক মুঠো মুড়ি দিল মেনিমাসী। বলল, নে খেয়ে নে।

মুড়ি আর জল খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সে রাতে।

সকালবেলায় ঘুম ভাঙ্গল সেই দুষ্ট খিদে পেটে নিয়ে। মা রাতে আসেনি, অসীম হালদারও আসেনি। যেমন দরজা খুলে ঘুমিয়েছিলাম ঠিক তেমনি খোলা রয়েছে দরজা।

মাকে না দেখে আবার কাঁদতে থাকি মা-মা চিৎকার করে।

বস্তির অনেকেই এসেছিল আমার কান্না শুনে। অতি নগণ্য ঘটনা মনে করেই তারা ফিরে গিয়েছিল নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে করতে। নিরুপিসী দু'বাড়ির কাজ শেষ করে বাড়িতে ফিরেই আমার কান্না শুনতে পেয়ে এগিয়ে এসেছিল। সে-ই ভীড় সরিয়ে আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল তার ঘরে।

দু'খানা বাসি রুটি আর তরকারি হাতে দিয়ে বলল, খা। তোর কপাল! তখনই বুঝতে পেরেছিলাম। পোয়াতি হলেই পালাতে হবে! দুর্মতি। পালালি কেন রে বাপু। কলকাতার

বস্তিতে হামেশাই এরকম হয়। তোকে তো সমাজে আটক করত না কেউ। পেটের ছেলেকে লজ্জা, তাই সহ্য করতে পারলি না বুঝি। মরণ আর কি। নে খেয়ে নে, আমি আবার কাজে যাব। তিনটে বাড়ির কাজ এখনও বাকি। খেয়েদেয়ে চুপ করে শুয়ে থাক, ফিরে এসে আবার তোকে খেতে দেব।

নিরুপিসীর সব কথা বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, মা কোথায় গেছে পিসী?

চুলোয়। তুই যা দিকি। সে আর আসবে না, গলায় দড়ি দেবে এবার। মরুক মাগী।

আমি চুপ করে খেতে থাকি। বলবার কিছুই ছিল না।

সারাদিন বসে বসেই কাটল। মাঝে মাঝে মায়ের জন্য কষ্ট অনুভব করেছি, তবুও কাঁদতে পারিনি।

কাজ থেকে ফিরে নিরুপিসী ভাত ফুটিয়ে আমাকে খেতে দিল, নিজেও খেতে বসল। খেতে খেতে বলল, তোর কপালই মন্দ। ছোটবেলায় বাপকে হারিয়েছিস, বড় হতে না হতেই মা পালাল। এবার পেটের ভাত জোগাতে পথে পথে ঘুরতে হবে তোকে।

আমার ভাগ্য এইভাবেই পরিস্ফুট হল আমার সামনে।

ঘরটা ছেড়ে দিতে হল সেদিনই।

নিরুপিসীর ঘরে আশ্রয় পেলাম সেদিন থেকে।

আশ্রয় বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, অবশ্য নিরুপিসী আমাকে নিরাশ্রয় করে পথে ছেড়ে দেয়নি। তার আশ্রয় থেকে চলে যেতে বলার সঙ্গে সঙ্গেই আরেকটা আশ্রয় তৈরী করে দিয়েছিল।

নিরুপিসীর ঘরে আসত রামখেলাওন।

মোটাসোটা কালো কুচকুচে যমদূতের মত তার চেহারা।

বড়বাজারে তার দোকান ছিল, বোধহয় পান-বিড়ির দোকান।

রামখেলাওন আসত অনেক রাতে। আমি তখন ঘুমিয়ে পড়তাম। কোন কোনদিন শেষরাতে ঘুম ভাঙ্গলে দেখতে পেতাম

তাকে। রামখেলাওন তখন অঘোরে ঘুমোত, তার নাক ডাকত মেঘের মত। তার নাক-ডাকার শব্দেই বোধহয় আমার ঘুম ভেঙ্গে যেত। অন্ধকার ঘরে মাঝে মাঝে আঁতকেও উঠতাম। নিরুপিসীর বিছানায় শুতো রামখেলাওন। অন্ধকারে তাদের ভাল করে দেখতে পেতাম না, আন্দাজে মনে হত তুজনে এক বিছানায় শুয়ে রয়েছে।

সকাল হতেই রামখেলাওন দাঁতন করতে করতে বের হত বস্তি থেকে, তারপর সারাদিন তাকে আর দেখা যেত না।

রামখেলাওনকে দিনের আলোতে দেখিনি ভালো করে। তার কাছে যেতেও ভয় হত। তার চোখের চাহনিতে মনে হত, সে যেন আমাকে সহ্য করতে পারছে না। চোখ তুটো থেকে যেন আগুনের গোলা ছিটকে বের হচ্ছে।

সত্যিই রামখেলাওন আমাকে সহ্য করতে পারত না।

নিরুপিসীর মুখে শুনেছি আমার মত পোড়াকপালে ছেলেকে ঘরে স্থান দিতে রামখেলাওন মোটেই রাজি নয়। আমি ঘরে থাকলে লছ্‌মি পালিয়ে যায়।

অবশেষে একদিন তুজনের ঝগড়া বেধে গেল। তাদের ঝগড়ায় ঘুম ভাঙ্গলো, উঠে বসলাম।

নিরুপিসী আমার পক্ষ নিয়ে অনেক কথাই বলছিল, আর রামখেলাওন ষাঁড়ের মত চিৎকার করছিল। আমি সব কিছু বুঝতে না পেরে চুপ করে ছিলাম, ভয়ও হচ্ছিল।

ওদের ঝগড়া মিটে গেল।

আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম।

তু'দিন পরের কথা।

নিরুপিসী বিকেলবেলায় আমাকে কাছে ডেকে বসাল, বলল, ইচ্ছে ছিল তোকে কাছেই রাখব। মিন্‌সে কিছুতেই রাজি নয়। খোট্টার বুদ্ধি, কিছুতেই বাগ মানাতে পারলাম না। লাহাবাবুদের বাড়িতে একটা বাচ্চা চাকর দরকার, পারবি কাজ করতে।

আমার বয়স তখন পুরো আট, নয়ে পা দিয়েছি।

দেহও আমার মোটেই শক্ত নয়।

মাথাতেও উঁচু নই।

বললাম, খুব পারব পিসী।

আমার গায়ে হাত বুলিয়ে নিরুপিসী বলল, এই তো মরদের বাচ্চা মরদ। পেটের ক্ষিধে মরবে দেহের মেহনত দিয়ে। তোকে কাজ করতে হবে সারাজীবন। আমাদের মত লোকের কপালে এর বেশি কিছু নেই। তুই পারবি। কালকেই নিয়ে যাব তোকে।

আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়লাম।

পরেরদিন নিরুপিসী হাজির করল লাহাগিন্নির সামনে।

ওমা, এতটুকু ছেলে পারবে কেন কাজ করতে।—প্রথমেই হতাশ করল লাহাগিন্নি।

নিরুপিসী জোর করে বলল, খুব পারবে মা ঠাকরুণ, গরীবের ঘরের ছেলে, ছোট থেকেই খেটে খায়।

নাক সিঁটকে গিন্নি বলল, পারবে না ও ছেলে কাজ করতে। পারবি রে ছোঁড়া?

মাথা নেড়ে বললাম, পারব।

বলতে ভয় করছিল।

খুব সাহস নিয়েই বলেছিলাম।

গিন্নি খুশী হল না, বলল, না বাপু অতটুকু ছেলেকে রাখতে পারব না।

তার সাফ জবাবের পর আর কিছুই বলার নেই। নিরুপিসীর হাত ধরে ফিরবার চেষ্টা করছি।

পেছন থেকে প্রশ্ন ভেসে এল, কি নাম তোর?

মুখ ফিরিয়ে দেখি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় একটা মেয়ে আমার দিকে চেয়ে প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে। আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বললাম, নির্মল।

নির্মল কি ?—কি জাত ?

নির্মল রায়।

কি জাত ?

জানি না।

গিন্নি বলল, অত শুনে কাজ নেই বড় খুকী। ওদের জাত থাকে কি কোনকালে! বাবার নামটাও হয়ত বলতে পারবে না। মরুকগে, ছেড়ে দে। ওকে রাখা চলবে না।

কথাগুলোর তাৎপর্য কিছুটা না বুঝলাম তা নয়। আমি বোকার মত দাঁড়িয়ে। বড় খুকী দিল উত্তর, কি যে বলছ মা। বাবার নাম নিশ্চয়ই জানে। হাঁরে নির্মল তোর বাবার নাম কি ?

বললাম, অমূল্যকুমার, ডাক নাম মানিক।

তোর বাবা কোথায় থাকে ?

আকাশের দিকে হাত উঁচিয়ে বললাম, ঐখানে।

আমার শিশুসুলভ সরলতায় মেনকাদিদি অর্থাৎ সেদিনের সেই বড় খুকী সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল, নইলে সে নিশ্চয়ই বলত না, একে রেখে দাও মা। বড় হলে এই ছেলে কাজের ছেলে হবে।

কেন যে একটা পেট বাড়াতে চাস বড় খুকী। চাল কি খুব সস্তা!

বড় খুকী গম্ভীরভাবে বলল, ছোট্ট একটা পেট ভরাতে তোমার ভাঁড়ার খালি হবে না মা। পাত কুড়িয়ে দিলেও ও বেঁচে যাবে।

গিন্নি অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হল, আমি আশ্রয় পেলাম লাহা-বাবুদের বিরাট অট্টালিকার একটি নিভৃত সিঁড়ির তলায়।

সেই লাল রং-এর বাড়িখানা আজও মনে পড়ে। বাল্যের কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে ঐ বাড়ির সঙ্গে, সে সব কথা কেউ জানে না। আজও আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ঐ বাড়ির

দরদালান, দুর্গামণ্ডপ, বিরাট বিরাট শোবার ঘর। আর মনে পড়ে একটি মূর্তিমতী স্নেহকরুণার আধারকে। সেই আধার হল মেনকাদিদি।

মেনকাদিদি বড়দিদি।

সবাই তার ছোট।

ছোট ভাইবোনের সংখ্যা মাত্র তিন।

তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় বিশেষ ঘনিষ্ঠ নয়, আর তারা সব সময় রাশভারী বড়দিদির কাছ থেকে দূরে থাকত, আমি থাকতাম বড়দিদির কাছে তাই তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার অবসর পাইনি। পরে বুঝেছিলাম, ঘরের চাকরের প্রতি অহেতুক করুণা-বর্ষণ করত মেনকাদিদি। সবাই তা পছন্দ করত না, চাকরকে চাকরের মর্যাদা দেওয়া ছিল লাহাবাড়ির চিরাচরিত রীতি। চাকর হুকুম তালিম করবে, প্রভুর সঙ্গী হবে না কোনক্রমেই। এই রীতির ব্যতিক্রম ঘটিয়েছিল মেনকাদিদি, তাই অপরে আমাকে খুব পছন্দ করত না। মেনকাদিদির ভয়ে অবশ্য কেউ কিছু বলতও না। আমি নিশ্চিন্তেই ছিলাম।

সিঁড়ির তলা থেকে আমাকে ডেকে জায়গা দিল তার নিজের ঘরে।

মেনকাদিদি খাটে শুত, আমি শুতাম মেঝেতে।

অনেক রাত অবধি পড়াশোনা করত মেনকাদিদি। আমি ঘুমিয়ে পড়তাম, টেরও পেতাম না কখন মেনকাদিদি পড়া শেষ করে শুয়ে পড়েছে।

লাহাবাড়ির কাজ ছিল সামান্য।

ফরমাইস শুনে ছুটে বেড়ান ছিল আমার কাজ।

অন্য সময় থাকতে হত মেনকাদিদির পাশে পাশে।

একদিন মেনকাদিদি বলল, পড়তে জানিস?

সহজভাবে বললাম, না।

মেনকাদিদি অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, কাল থেকে সকাল সন্ধ্যায় বই নিয়ে বসবি আমার কাছে।

মাথা নেড়ে বললাম, আচ্ছা।

আমার মনে হয়েছিল পড়াশোনা করাটা আমার চাকরির একটি অঙ্গ। পেটের ভাত আর এই আশ্রয় হারাতে হবে পড়াশোনা না করলে, তাই তখুনি রাজি হয়ে গেলাম।

পড়াটা যে কত কঠিন তা আমার জানা ছিল না। ফরমাইস শোনার মত পড়াশোনা একটা কাজ, এ-কাজ না করলে চাকরির গাফিলতি, তাই সম্মত হয়েছিলাম। অক্ষর চিনতে বসে কেমন যেন হয়ে যেত। মেনকাদিদি যদি ধৈর্যের সঙ্গে আমার প্রথম পাঠজীবনে সাহায্য না করত তা হলে কি যে হত তা বলতে পারি না।

মেনকাদিদি বেশ মোটামোটা বই নিয়ে পড়তে বসত। আমি তার পাশে বসে অক্ষর পরিচয় করতাম। পড়াটা যে চাকরির অংশ নয় তা বুঝতে দেরী হল না। কাজের গাফিলতি হলে তিরস্কারলাভ করতাম, পড়ার গাফিলতি হলে সস্নেহ উপদেশ দিত মেনকাদিদি।

মেনকাদিদি বলত, ভাল করে লেখাপড়া শেখ নিমু। লেখাপড়া শিখেই বড় হতে হবে। উন্নতি করতে পারবি জীবনে।

উন্নতি বলতে কি বুঝায় তা জানতাম না, তাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

কি দেখছিস ?—জিজ্ঞেস করত মেনকাদিদি।

বলতাম, না কিছু নয়। আপনাকে দেখছি।

মেনকাদিদি রেগে যেত এই কথা শুনলেই।

সুন্দরী বলতে যা বুঝায় মেনকাদিদি তা ছিল না। রংটা ফ্যাকাশে, মুখের কাটিং দেখে অনেকেই নাক সিঁটকাতো, দেহের গড়ন ছিল পুরুষ্টু। স্বাস্থ্যটা ছিল অনিন্দনীয় নিটোল। হাত-পা

ছিল নরম তুলতুলে। অমন স্বাস্থ্যবতী মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে দেখতাম তাকে। আমার মনে হত স্বর্গের কোন দেবী। কলেজে যাবার সময় পিঠে এলিয়ে দিত কোঁকড়ানো চুলের গোছা। বাতাসে দুলত চুল, মুখে এসে পড়ত গোছা গোছা চুল। কোন রকমে হাত দিয়ে মুখের ওপর থেকে চুল সরিয়ে গাড়িতে উঠে বসত মেনকাদিদি। তার পেছন পেছন ছোটদি আর দাদারা গাড়িতে বসত। সবাই চলে যেত স্কুল কলেজে। গাড়ি চলে গেলেও আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম। এমন সুন্দর দেবীমূর্তি তখনও আমার চোখে ভাসত।

মেনকাদিদি কলেজে গেলেই তার ঘর গোছানো আমার কাজ। ধুয়ে পুঁছে আলনা সাজিয়ে টেবিল ঘষে ঝক্‌ঝকে করে রাখতাম। মেনকাদিদি ফিরে এসে বলত, বেশ তোর কাজের হাত।

আমি খুশী মনে আবার ঝারন নিয়ে যদি কাজ করতে এগোতাম মেনকাদিদি মানা করত, বলত, হয়েছে। এ বেলায় ওকাজ করতে হবে না। যা তো বাগানে, কটা গাঁদাফুল নিয়ে আয় বাগান থেকে।

আমি ছুটে যেতাম বাগানে। ফিরে এসে বলতাম, গাঁদাফুল নেই বড়দিদি।

বড়দিদি হেসে বলত, আমারই ভুল হয়ে গেছে রে। শীতকালে গাঁদা ফুল ফোটে। যা, কটা রজনীগন্ধা নিয়ে আয়।

ফুল এনে দিলে মস্ত বড় একটা ফটোর সামনে সন্ধ্যাবেলায় সেগুলো রেখে প্রণাম করত মেনকাদিদি।

সবাই জানে ও ফটোটা কার। আমিও জানতাম কিন্তু বিশ্বাস করতাম না। মানুষের দুটো মা থাকতে পারে তা তখন বিশ্বাস করতাম না। গিন্নিমা-ই তো মেনকাদিদির মা, আবার ফটোটা কি করে মা হল!

অলকামাসীর মুখে শুনেছি, এই মা নতুন মা। মেনকার মা

মারা গেছে ছোটবেলায়। তারপর কর্তা বিয়ে করেছে এই গিন্নি-মাকে। গিন্নিমা মেনকার সৎমা।

অলকামাসী আগের গিন্নির দূর সম্পর্কে বোনঝি। স্বামী মারা যেতেই আশ্রয় পেয়েছিল লাহাবাড়িতে। তার কাজ রান্না করা। গোনাগুন্তিতে প্রায় পঁচিশ জন, তাদের রান্না করত অলকা মাসী। বেলা দুটোর আগে রান্নাঘর থেকে বের হতে পারত না। যখন বের হত তখন ঘেমে চুপসে যেত।

অলকামাসী এ বাড়ির সব ঘটনা জানে। মাঝে মাঝে তার কাছে গিয়ে বসলে শ্রোতার অভাবে আমাকেই সে সব কথা শোনাত।

আমার বয়স বাড়তে থাকে।

মেনকাদিদির স্নেহে ও যত্নে বেশ কাটছিল দিনগুলো। আমিও তৃতীয় ভাগ পড়া শেষ করে বড় বড় বই পড়তে পারি। ইংরেজী বইও পড়তে পারি কিছু কিছু। আমি যে এ বাড়ির অনুগৃহীত ভৃত্য, সে কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

অলকামাসী বলল, শুনেছিস ছোঁড়া, মেনকার বিয়ে।

খুব খুশী হলাম।

মেনকাদিদির বিয়ে।

কোনদিন কারও বিয়ে হতে দেখিনি। মনে মনে বেশ একটা উত্তেজনা বোধ করলাম। কবে বিয়ে জানতে চাইলাম অলকামাসীর কাছে।

এই তো শ্রাবণের দশ তারিখে।

হিসাব করে দেখলাম বিয়ের দেরী আছে সতের দিন।

আমি দিন গুণতে থাকি আর অধীর প্রতীক্ষা করি সেই নির্দিষ্ট দিনটির।

সতের দিনে লাহাবাড়ির চেহারা গেল পাল্টে।

ঘোরতর বৃষ্টি।

তার মাঝেই গোটা বাড়িটার রং ফেরানো হল।

ধীরে ধীরে আত্মীয় কুটুম্বে ভর্তি হল গোটা বাড়িটা। সব ঘরেই দুটো তিনটে উপরি বিছানা পাতা হল। লোক গিস্ গিস্ করতে থাকে চত্বরে চত্বরে।

অলকামাসীর বড় কষ্ট। এত লোকের রান্না করতে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছিল। তার কষ্ট দেখে দু'জন রাঁধুনী বামুনকে নিয়ে এল কর্তাবাবু।

মেনকাদিদির ঘরে সব সময় ভীড়।

রাতের বেলায় কোন রকমে খাটের তলায় বিছানা পেতে শুয়ে পড়তাম। আমাকে শুতে দেখে মেনকাদিদির আত্মীয়রা বলত, কোথাকার কে, তাকে কেন ঘরে থাকতে দিস মেনি ?

মেনকাদিদি হাসত, বলত, ও আমার আগের জন্মের ভাই। এ জন্মে চাকরি করতে এসেছে বলে ছোট নয় মোটেই।

ঢং আর কি। মন্তব্য করত কেউ কেউ।

সত্যিকারের ঢং যে কি তা জানিনা তবে আমাকে ছোট ভাইয়ের মতই স্নেহ করত মেনকাদিদি। তার ঋণ জীবনে শোধ করা সম্ভব নয়।

দেখতে দেখতে বিয়ের দিন এসে গেল।

হৈ-হৈ ব্যাপার। দরজায় সানাই, ভেতরে সাজসজ্জা, রান্নাঘরে ঢালাও রান্না।

স্যাকরা আসছে, ভিয়েনওলা আসছে, নাপিত আসছে, আসার আর শেষ নেই।

অবশেষে বিয়ের দিন এসে গেল।

আকাশে মেঘ আর মেনকাদিদির চোখে জল।

আমার কিন্তু ভালই লাগছিল।

জড়োয়া গহনায় গা ঢেকে মেনকাদিদি বিয়ের পিঁড়িতে, মনে হচ্ছিল সত্যিকার দেবীমূর্তি। স্বর্গের কোন দেবী এসে বসেছে

ছাদনা তলায়। মেনকাদিদিকে কোনদিন সাজতে দেখিনি, আজ প্রথম দেখলাম সাজসজ্জায়। চমৎকৃত হলাম। অবাক হয়ে মেনকা-দিদিকে দেখেছি সেদিন।

বিয়ের সব শেষ।

বর বউ বাসরে।

সেখানে বেশ সোরগোল।

গান বাজনায় মুখর বাসর।

আমি দরজার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে।

মেনকাদিদি আমাকে দেখে ইসারায় ডাকল।

কাছে যেতেই বলল, নিমু তোর খাওয়া হয়েছে?

মাথা নেড়ে বললাম, হাঁ বড়দি।

এবার শুয়ে পড়।

এতদিন মেনকাদিদির ঘরে তার পায়ের নীচে শুয়ে থেকেছি। আজ সে ঘর বেদখল হয়ে গেছে। ঘরে মেনকাদিদিও নেই, শোবার জায়গাও নেই। কোথায় শোব ভাবছিলাম।

মেনকাদিদি চাপা গলায় ধমক দিয়ে বলল, অনেক রাত হয়েছে, শুতে যা।

ভয়ে ভয়ে বললাম, কোথায় শোব বড়দি!

মেনকাদিদির মনে পড়ে গেল, আমার অসুবিধা বুঝল।

হেসে বলল, আমার ঘরে গিয়েই শুয়ে পড়। কাল আমার সঙ্গে তুইও যাবি।

ধীরে ধীরে দরজার পাশ ছেড়ে মেনকাদিদির ঘরের দিকে গেলাম। রাত অনেক হয়েছে। বিয়ে বাড়ির কোলাহল থেমে এসেছে। মেনকাদিদির ঘরের সামনে এসে দেখি ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। সাহস করে ডাকতে পারলাম না কাউকে।

আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নেমেছে।

সবাই নিজের নিজের আশ্রয়ে চলে গেছে।

হঠাৎ মনে পড়ল সিঁড়ি তলার ঘরখানার কথা। লাহাবাড়িতে আমার প্রথম রাত কেটেছিল ঐ অন্ধকার সিঁড়ির তলায়। আজ কোথাও জায়গা না পেয়ে ছুটে গেলাম সেখানে। সে জায়গাও খালি নেই। কতকগুলো নেড়ী কুকুর আশ্রয় নিয়েছে সেখানে। তাদের তাড়িয়ে নিজের জায়গা করে নিলাম সিঁড়ির তলায়। শুতে শুতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

শেষ রাতে স্বপ্ন দেখলাম, মেনকাদিদির সঙ্গে যাচ্ছি জামাই-বাবুর বাড়িতে। সে যে কত বড় বাড়ি! উঃ! চোখ ঝলসে গেল। মেনকাদিদি আমাকে পাশে বসিয়ে খেতে দিয়েছে, আমি ঘুমে ঢুলছি।

স্বপ্ন শেষ হতেই সকাল হয়ে এল।

ঘুম ভাঙ্গল বিয়েবাড়ির গোলমালে।

উঠে বসতেই দেখি নেড়ী কুকুররা তখনও আমার পাশে শুয়ে। ওদের তাড়িয়ে দিলেও বৃষ্টির মধ্যে কোথাও না গিয়ে ফিরে এসে জায়গা করে নিয়েছিল আমার পাশে।

গা ঝাড়া দিয়ে বের হলাম সিঁড়ির তলা থেকে।

আমাকে দেখেই অলকামাসী বলল, কোথায় ছিলি রে ছোঁড়া। বরযাত্রীদের পান দিতে হবে, তোকে না পান দিতে বলেছে বড় কর্তা। শীগ্‌গীর যা পানের ঝুড়িটা নিয়ে।

আমার হাতে পানের ঝুড়ি তুলে দিল অলকামাসী।

ইচ্ছে ছিল মেনকাদিদির কাছে যাব। তা আর হল না। পান দেওয়া শেষ করে ছুটে গেলাম মেনকাদিদির বাসর ঘরের সামনে।

আমাকে দেখেও মেনকাদিদি কোন কথাই বলল না আমার সঙ্গে। মেনকাদিদি দু'একবার তাকিয়ে দেখেও যখন কোন কথা বলল না তখন আমার চোখ ফেটে জল নামল। একটা রাতের মধ্যেই মেনকাদিদির এতটা যে বদল হবে তা ভাবতে পারছিলাম না।

তবুও আশা ছিল মেনকাদিদির সঙ্গে যাবার। আমার কাপড়-জামাগুলো সাজিয়ে রেখেছিলাম। আশায় বুক বেঁধেছিলাম মেনকা-দিদির সঙ্গী হবার।

বিকেলবেলায় ঘটল বহুজনের সমাবেশ।

আমিও মেনকাদিদির সামনে ঘুরঘুর করে ঘুরলাম। তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে নানাভাবে চেষ্টাও করলাম। মেনকাদিদি ঘোমটা দিয়ে সেই যে গম্ভীরভাবে বসেছিল তেমনি রইল। আমার দিকে ফিরেও তাকাল না। বড় জামাইবাবুর হাত ধরে মেনকাদিদি গিয়ে উঠল গাড়িতে। আমি জামাকাপড়ের পোঁটলা নিয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম, মেনকাদিদি একবার তাকিয়েও দেখল না। কষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছিল, কিছু বলতেও পারছিলাম না।

আমাকে রেখেই মেনকাদিদি চলে গেল তার স্বামীর ঘরে। যাবার সময় আমার সঙ্গে কথা বলেনি। অভিমানে বুক ফাটলেও চোখ দিয়ে এক ফোটা জলও পড়ল না। আমি যে লাহাবাড়ির অনুগৃহীত ভৃত্য তা বুঝতে মোটেই বেগ পেতে হল না আজ।

আমার মা-ও একদিন এমনিভাবে আমাকে না বলেই চলে গেছেন। সেদিনের স্মৃতি খুবই ঝাপসা। যা কিছু জেনেছি পরের মুখে শুনে। তাই ব্যথাটাও কম, বিস্মরণ ঘটেছে খুবই সহজে। আজ কিন্তু বেদনাটা অনুভব করলাম। অনুভব করবার মত মন তখন কিছুটা তৈরী হয়েছে তাই মেনকাদিদির চলে যাওয়াটা আমার জীবনে একটা ইতিহাস। এই ইতিহাস রচনার প্রথম পৃষ্ঠা থেকেই আমার সুখের দিনের পরিসমাপ্তি।

কষ্টকর জীবনের দিকে এগিয়ে চললাম ধীরে ধীরে।

'আহা' বলবার একটিও লোক রইল না এত বড় লাহাবাড়িতে। বয়স বেড়েছে, মাথায় উঁচু হয়েছি, বুঝতেও শিখেছি। তাই অবমাননা আর অত্যাচার বুঝতেও অসুবিধা হত না।

বিয়ে বাড়ির হাঙ্গামা মিটল দু'দিনেই।

আত্মীয় কুটুম্ব ফিরে গেল নিজ নিজ ঘরে।

আগের মত সকালবেলায় বই নিয়ে বসেছিলাম, বাধা দিল গিন্নিমা। আমাকে ডেকে বলল, আর পড়তে হবে না। পড়ে লাটসাহেব হতে পারবি না ছোঁড়া। আজ থেকে রান্না ঘরে অলকাকে সাহায্য করবি। বুঝলি। বই তুলে রাখ, যা রান্না ঘরে।

অলকামাসীকে হাতে হাতে জোগাড় দেবার কাজ আমার। সবচেয়ে কষ্ট হত মশলা পিষতে। অতবড় বাড়ির অতগুলো লোকের জন্য মশলা পেষা মোটেই সহজ কাজ নয়। আগে মশলা পিষত নিরোদা ঝি! সে গেছে মেনকাদিদির সঙ্গে। সে জায়গায় বহাল হলাম আমি।

সেদিন থেকে পড়া ইতি। শুরু হল সত্যকার চাকরের জীবন।

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে অলকামাসীর কাছে গিয়ে বসতে হত। তেল নিয়ে আয়, কয়লা ভেঙ্গে আন, উনুন খুঁচিয়ে দে, তারপর মশলা পেষ। আমার ঐ বয়সে ওসব কাজ করা সম্ভব হত না, তবুও করতে হত পেটের দায়ে। মশলা পিষতে পিষতে কেঁদে ফেলতাম, পিষতেও দেরী হত। দেরী হলে অলকামাসীর কঠিন রূঢ় গালাগালি শুনতে হত।

গিন্নিমা বলত, বড় খুকী ছেলেটার মাথা খেয়েছে। চাকর ছোঁড়াকে অত আদর দেওয়া উচিত হয়নি। কুকুরকে আস্কারা দিলে মাথায় ওঠে, এ ছোড়াও মাথায় উঠেছে। কোন কাজই করতে পারে না, হতচ্ছাড়া ব্যারিষ্টার হবে, চাকরের কাজ করবে কেন! এক গামলা ভাত গিলতে শিখেছে, কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা।

আমাকে ডেকে বলল, তোকে আর কাজ করতে হবে না। যে চুলোয় ইচ্ছে চলে যা।

মেনকাদিদি থাকলে এসব শুনতে হত না, এত কাজও করতে হত না। ভাবতাম কত তাড়াতাড়ি মেনকাদিদি ফিরে আসবে। এলেই আমি এদের হাত থেকে বাঁচব।

সত্যিই যে আমাকে তাড়িয়ে দেবে তাও ভাবতে পারতাম না।

অষ্টমঙ্গলে মেনকাদিদি এল।

মেনকাদিদি আর আগের মেনকাদিদি নয়। কত যে পরিবর্তন হয়েছে তা তার চলন দেখেই বুঝতে কষ্ট হয়নি। আমার দিকে ফিরেও তাকাল না একবার।

আমি গিয়ে বললাম, আপনি আমাকে নিয়ে গেলেন না বড়দি!

আমার কথা শুনে মেনকাদিদির যেন ধ্যানভঙ্গ হল। তার সেই আশ্বাস আমি যে মনে করে রেখেছি তা ভাবতেও পারেনি মেনকা-দিদি। বেশ ইতস্তত করে বলল, নিয়ে যাব রে যাব। কটা দিন অপেক্ষা কর। এখানে তোর কষ্ট হচ্ছে বুঝি!

আমি উত্তর দিতে পারলাম না। চোখ দুটো ছলছল করে উঠতেই মেনকাদিদি বলল, কাঁদিস নারে, আমি তো এসেছি। এবার সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি তোর সব ব্যবস্থা করব সবার আগে।

মেনকাদিদির সেই স্নেহময়ী মূর্তি আবার দেখতে পেলাম।

জামার হাতায় চোখ মুছে বললাম, আমি আপনার কাছেই থাকব। এখানে থাকব না।

মেনকাদিদি কোন কথা না বলে শুধু হাসল।

আমাকে কাছে ডেকে বসিয়ে বলল, আমি ব্যবস্থা করছি, তোর আর কষ্ট হবে না।

মেনকাদিদি আশ্বাস দিলেও আমার কষ্টের খুব বেশি লাঘব হল না। মেনকাদিদির ঘরে তার পায়ের কাছে শোবার অধিকার আর ফিরে পেলাম না। মেনকাদিদি তার পুরানো ঘরে এসেই উঠেছিল, কিন্তু সেখানে রাতের বেলায় আমার প্রবেশ ছিল নিষেধ। রোজ সন্ধ্যার পর জামাইবাবু আসত, তাই আমার সামনে তারা দরজা বন্ধ করলে আমার সেখানে প্রবেশের অধিকার থাকত না।

কলকাতার এ-পাড়া আর ও-পাড়া, তাই জামাইবাবু আসত রোজই। মেনকাদিদির ঘরে যেতে পেতাম তখনই যখন সে দয়া করে আমাকে ডাকত। সেও কিছু ফরমাইস শুনতে।

জামাইবাবু আসবার আগেই সিগারেট দু'প্যাকেট আনতে হত সামনের খোটমলের দোকান থেকে। কখনও কখনও ডাব আনতে যেতে হত। আমিও উদগ্রীব থাকতাম মেনকাদিদির ফরমাইস শুনতে।

আমাকে যে মেনকাদিদি যথেষ্ট স্নেহ করত তা বুঝতে পেরেছিল জামাইবাবু।

একদিন আমারই সামনে মেনকাদিদিকে বলল, চাকরকে বেশি প্রশ্রয় দিও না মেনকা। মাথায় উঠে গেলে বেগ পেতে হবে নীচে নামাতে।

আমি আর বাকিটুকু শুনতে অপেক্ষা করতে পারিনি। মেনকা-দিদি যেমন প্রথম দিকে গতজন্মের ভাই বলে আমাকে তার কাছে টেনে নিয়েছিল, তেমন করে যুক্তি দিয়ে জামাইবাবুকে নিশ্চয়ই বুঝিয়ে দেয়নি নইলে পরদিন তাদের ঘরে যেতেই জামাই-বাবু নিশ্চয়ই ধমকে উঠত না। আমিও তাকে ভয় না করে ভক্তি করতে শিখতাম।

আমি মেনকাদিদির কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছি তা বুঝবার মত বয়স আমার হয়েছিল, আর আমি যে একটি ভৃত্য মাত্র তাও বুঝতে শিখেছিলাম।

যেদিন জামাইবাবু আমার সামনেই প্রশ্রয় না দেবার কথা বলেছিল সেদিন মেনকাদিদির চোখ দুটো ছলছল করে উঠেছিল তা আমি লক্ষ্য করেছি। মেনকাদিদির হৃদয়ের গোপন স্থলে আমার জন্য যে স্নেহ সঞ্চিত ছিল তা বুঝতে মোটেই ভুল করিনি।

কদিন পরে মেনকাদিদিকে নিয়ে জামাইবাবু গেল সিমলায় বেড়াতে।

গিন্নিমা মেনকাদিদিকে বলেছিল, দু'জনে নতুন জায়গায় যাবি, ছোঁড়াটাকে সঙ্গে নিয়ে যা, সময়ে অসময়ে কাজ দেবে।

মেনকাদিদি সম্মতি দিলেও জামাইবাবু রাজি হয়নি।

জামাইবাবু বলেছিল, আমরা হোটেলে থাকব। চাকরের দরকার কি। আমাদের মাঝে একটা দেওয়াল তুলে কদিনের সুখের জীবনকে কেন যে তোমরা নষ্ট করতে চাও তা বুঝছি না। ও ছোঁড়াকে সঙ্গে নিতে হবে না।

মেনকাদিদি জোর করতে পারেনি।

জামাইবাবুর যুক্তি ও মত স্বীকার করে বলল, তুমি যা ভাল বোঝ।

আমার আশা ছিল সত্যিই এবার মেনকাদিদির সঙ্গে থাকতে পাব। তা আর হলনা। আমার সামনেই মেনকাদিদিকে নিয়ে জামাইবাবু গাড়িতে উঠল। সেই বিয়ের পরে যেমন দু'জনে আমার সুমুখ দিয়ে চলে গিয়েছিল তেমনি চলে গেল, সেবারের মত এবারও আমি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দেখলাম।

মেনকাদিদিকে তিন বছর দেখেছি। তিন বছর তার জীবনের সঙ্গে আমি মিশে গিয়েছি। কোনদিন দেখিনি মেনকাদিদি যা বলেছে তার ব্যতিক্রম কোথাও ঘটেছে। লাহাবাড়িতে মেনকাদিদি যা বলত তাই হত। গিরীনবাবু অথবা গিন্নিমা কোনদিনই বড় খুকীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করেনি। আজ ঠিক উল্টোটা ঘটল। মেনকাদিদির ইচ্ছাটা যেন কিছু নয়, জামাইবাবুর ইচ্ছাটাই হল প্রবল। মেনকাদিদির সেই তেজ যেন ঢিমিয়ে গেছে জামাইবাবুর ব্যক্তিত্বের কাছে! আজ মেনকাদিদি যা করবে তার নির্ধারক হল জামাইবাবু।

অলকামাসীকে একদিন জিজ্ঞেস করতেই সে হেসে বলেছিল, বিয়ের পর প্রথম প্রথম ও-রকম হয়। পরে দেখবি বড় খুকী যা বলছে জামাইবাবাজী কেঁচোটির মত তাই করছে। সবই উল্টে যাবে।

অলকামাসী প্রমাণ দিয়ে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে হেসে বলেছিল, তোর মেসো কি রাশভারী লোক ছিল তা তো জানিস না। বিয়ের পর ভয়েই মরতাম। তারপর আর বলিস না। আমি যা বলতাম তাই ছিল বেদবাক্য। আহা লোকটা মরে গেছে, নইলে দেখতে পেতি।

অলকামাসীর বিয়ে হয়েছিল এগার বছর বয়সে আর বিধবা হয়েছে তের বছরে।

মেনকাদিদি কিভাবে এবং কবে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল তা জানবার অবসর বা সুযোগ পাইনি। তবে অলকামাসীর থিওরীটা আজও ভাল করেই মনে আছে।

সিমলা থেকে ফিরে এসে মেনকাদিদি বেশিদিন লাহাবাড়িতে থাকেনি। তার স্বামী সরকারী চাকুরে, চাকরি করতে জামাইবাবু গেল বগুড়াতে, মেনকাদিদিও তার সঙ্গে চলে গেল।

জামাইবাবু মুন্সেফ। কলকাতার বনেদী ঘরের ছেলে, অর্থবানও। মেনকাদিদির বিয়েটা তাই সবাইকে খুশী করেছিল, খুশী হয়নি শুধু কর্তাবাবু, কারণ বদলীর চাকরি। কর্তাবাবু সাধারণত বাড়ির ভেতর আসত না। অনেক রাতে বাইরের কাজ শেষ করে কখন যে গিন্নিমার ঘরে যেত তা অনেকেরই অজানা ছিল। অমন রাশভারী লোকের সামনে দাঁড়াতেও অনেকে ভয় পেত। অথচ তার সে গাম্ভীর্য সেদিন ভেঙ্গে গিয়েছিল। আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল বৈঠকখানায়।

আমি তো ভয়ে মরি। কোথাও কোন অপরাধ করেছি নিশ্চয়ই, নইলে কর্তাবাবুর সদরে ডাক পড়ে না কারও।

মিঠু দারোয়ান আমার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল সদরে। কর্তাবাবুর সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে কি যেন বলবার চেষ্টা করতেই কর্তাবাবু মিঠুকে বলল, তুমি যাও।

আমি বলির পাঁঠার মত কাঁপছি।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কর্তাবাবু বলল, বড় খুকী তোর কথা লিখেছে। তাকে চিঠি লিখতে বলেছে। বুঝলি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কর্তাবাবু।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি পরবর্তী আদেশের।

চিঠি লিখে আমাকে দিয়ে যাস। অনেক দূরে থাকে, আমার চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে দেব।

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতেই কর্তাবাবু বলল, যা এখুনি লিখে নিয়ে আয়। সরকার মশায়ের ঘর থেকে কাগজ কলম নিয়ে লিখে আন।

চিঠি কি করে লিখতে হয় জানি না। সোজা সরকারবাবুর ঘরে এসে বললাম, একটু কাগজ কলম দেবেন বাবু।

সরকারবাবু পাশের ঘরে বসে কর্তাবাবুর সব কথাই শুনেছিল। বিনা প্রতিবাদে কাগজ কলম এগিয়ে দিল।

কাগজ কলম নিয়ে ভাবছি কি লিখব।

সরকারবাবু বলল, লেখ।

কি করে চিঠি লিখতে হয় জানিনা।

সরকারবাবু পাশে বসিয়ে চিঠি লেখাল। চিঠি লেখা শেষ করে বারবার পড়লাম, খুবই আনন্দ হল। মেনকাদিদি আমাকে ভোলেনি, চিঠি লিখতে বলেছে একি কম আনন্দের কথা।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে চোরের মত কর্তাবাবুর সামনে দাঁড়ালাম। হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিয়ে কর্তাবাবু পড়ল।

পড়তে পড়তে চোখ দুটো ছলছল করে উঠল, পড়া শেষ করে বলল, বেশ হয়েছে।

আমি পড়ি-মরি করে পালিয়ে এসে বাঁচলাম।

অনেকদিন পরে সেদিনের সেই দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। সেদিন ভাবতে শিখেছিলাম, ভেবে দেখলাম একটিমাত্র মানুষ খুশী হতে পারেনি এই বিয়েতে। সেই মানুষটি

হল কর্তাবাবু, আর তার খুশী না হবার কারণ, জামাতার বদলীর চাকরি।

মেনকাদিদি চলে যাবার পর আমার স্থান হয়েছিল সিঁড়ির তলায় সেই অন্ধকার গর্তটা। আর অবসর সময় কাটত পথে বেড়িয়ে। মাঝে মাঝেই বাইরের ফুটপাতে এসে দাঁড়াতাম, কখনও কখনও হাঁটতে হাঁটতে শেয়ালদহের দিকে যেতাম। আগে বাইরে যেতে শঙ্কাবোধ করতাম, সে শঙ্কা ধীরে ধীরে কেটে গেল। এখন একাই বেশ বাইরে ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারতাম। এতদিন লাহা-বাড়ির প্রাচীরের ওপারে দিবারাত্র কাটিয়ে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সামান্য। নেহাৎ দরকার না হলে বাইরে পাঠাত না মেনকাদিদি। তাও মাঝে মাঝে সঙ্গে থাকত মিঠু দারোয়ান। খোলা আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে যেন কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পেলাম।

সামনেই ছোট একটা পার্ক।

বিকেলবেলায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলতে আসত সেখানে। আমারও ইচ্ছা হত ওদের সঙ্গে খেলবার। ওদের কাছে এগিয়ে যেতাম কিন্তু খেলবার সময় আমাকে ওরা ডাকত না। সাহস করে ওদের সঙ্গী হতেও পারতাম না।

পার্কে বিকেলবেলায় বাঁদর নাচ হচ্ছিল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। খেয়াল ছিল না সন্ধ্যাবেলায় উনুনে আগুন দেওয়া আমার কাজ। হঠাৎ যখন মনে পড়ল তখন উঠিপড়ি করে ছুটে এলাম রান্না বাড়িতে। অলকামাসী সবে উনুনে আগুন দিয়ে বেরিয়ে আসছিল রান্নাঘর থেকে। আমাকে দেখেই কাছে ডেকে তীব্রকণ্ঠে বলল, কোথায় ছিলিরে হতভাগা?

বললাম, পার্কে বাঁদর নাচ দেখছিলাম।

অলকামাসী কাছে এসে কান ধরে বলল, তাই বুঝি বাঁদরামি শিখেছিস।

এতদিন কেউ কখনও আমার গায়ে হাত তোলেনি, অলকামাসী কানে হাত দিতেই প্রচণ্ডভাবে আঘাত করল আমার আত্ম-সম্মানকে। আমি ক্ষিপ্তের মত তার হাত ঝটকা দিয়ে সরিয়ে কষে কামড়ে দিলাম।

তারপর হৈ-হৈ কাণ্ড।

ছুটে এল সব ঝি চাকর দারোয়ান। অলকামাসীর চিৎকারে বাড়িশুদ্ধ ভেঙ্গে পড়ল সেখানে। তারপর আর মনে নেই।

বেধড়ক প্রহার ছিল আমার ভাগ্যে। অলকামাসী, মিঠু দারোয়ান যথেচ্ছভাবে হাতের সুখ মিটিয়ে প্রচণ্ড প্রহার করেছিল। আমার সর্বাঙ্গে ফুটে উঠেছিল ঐ প্রহারের কালো দাগ। সেই রাতেই সারা দেহে ভীষণ ব্যথাসহ জ্বর এল। বেহুঁস হয়ে পড়েছিলাম কয়েকদিন।

ক'দিন যে কেটে গেছে তা জানিনা।

আবার জ্ঞান ফিরে এল একদিন। সেদিন আমি আমার পাশে কাউকে দেখিনি। একটা গেলাসে ছিল জল। কোন রকমে উঠে বসে ঢক্‌ঢক্ করে জল খেয়ে আবার শুয়ে পড়লাম। আমি যে কোথায় রয়েছি তাও জানিনা। মাঝে মাঝে মেনকাদিদির কথা মনে হচ্ছিল। মেনকাদিদিকে যেন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।

পরে মিঠু দারোয়ানের কাছে শুনেছি। ঐ রকম অমানুষিক প্রহারের সংবাদ পেয়ে কর্তাবাবু ছুটে এসেছিল অন্দরে। আমাকে বেহুঁস দেখে সে-ই ডাক্তারের ব্যবস্থা করেছিল। ভয় পেয়েছিল অলকামাসী আর মিঠু দারোয়ানও। যদি মরে যেতাম সেদিন তাহলে তাদের যে কঠিন শাস্তি পেতে হতো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না।

আমার ধীরে ধীরে মনে পড়ল সেদিনের সব ঘটনা।

দেহে তখনও প্রচণ্ড বেদনা। বাইরে বের হতে পারছিলাম না। আবার শুয়ে পড়লাম।

দুপুরবেলায় ছোট খুকী মনিকা এসে দেখে গেছে আমাকে। আমাকে দেখে সে-ই সংবাদ দিল গিন্নিমাকে। গিন্নিমা সদলে এল আমাকে দেখতে। খাবারও এল সঙ্গে।

গিন্নিমা বলল, কেমন আছিস নিমু?

খেতে খেতে বললাম, ভাল।

গিন্নিমা নিজে নিজেই বলল, কি ভাবনা। জ্বর ছেড়েছে দেখছি।

বেশি দেরী করল না গিন্নিমা। ফিরে গেল তখুনি। ছোট খুকী আমার চেয়ে বয়সে ছোট। আমার কাছে কোনদিনই আসত না, চাকরকে প্রশ্রয় দেওয়া ওদের রীতি নয়। তাই আমাকে পরিহার করেই চলত। আমারও কোন সময়ই ওদের কাছে যেতে হত না, মেনকাদিদির আঁচলের তলায় থেকেছি, সব রকম ঝড়-ঝাপটা থেকে মেনকাদিদিই বাঁচিয়েছে। আমার এই অসুস্থ অবস্থা দেখেই মনিকা বোধহয় একটু দাঁড়িয়ে দেখছিল। গিন্নিমা চলে যেতে ছোট খুকী বলল, তোর খুব কষ্ট হচ্চে, তাই না? কোথাও যাস না যেন। এখানেই চুপ করে শুয়ে থাক।

বললাম, আচ্ছা দিদিমণি।

কিছু খাবি?

না।

লজেন্স! চকোলেট! বিস্‌কুট?

বললাম, না, না। আমার কিছুই দরকার নেই দিদিমণি।

আমার বেদনা যে কোথায় তা বুঝবার ক্ষমতা ওর নেই, বুঝিয়ে বলবার সামর্থ্যও আমার নেই। কোথায় যে আমার অভাব সে কথা জানে শুধু একজন, সে হল মেনকাদিদি। তার স্নেহ থেকে বঞ্চিত না হলে আজ আমি এমন দুর্দশায় বোধহয় পড়তাম না।

ছোট খুকী বিরক্ত হল, বলল, তা হলে কি খাবি?

খিদে নেই দিদিমণি।

সত্যিই খিদে ছিল না। পেটে তখনও একটা ব্যথা আমাকে

মাঝে মাঝে অস্থির করে তুলছিল। সত্যকার খিদে থাকলেও তার অনুভূতির চেয়ে বেশি কষ্টকর হয়েছিল ঐ ব্যথাটা।

ছোট খুকী যেতে যেতে বলল, বাবা বলছিল...

কি বলছিল দিদিমণি ?

তোর কি কি কষ্ট তা জানতে বলছিল।

আমি দম নিয়ে বললাম, পেটে একটা ব্যথা মাঝে মাঝে কষ্ট দিচ্ছে।

আর কিছু নয় !

না। বলে পাশ ফিরে শুলাম।

ছোট খুকী ফিরে গেল।

সন্ধ্যাবেলায় ডাক্তার এসে দেখল। ব্যথার কারণ খুঁজে দেখে বিরসমুখে উঠে গেল।

তবুও ক'দিনের মধ্যেই সেরে উঠলাম সুচিকিৎসায়।

আমার আস্তানা ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াতেই গিন্নিমার চোখ পড়ল আমার ওপর। জিজ্ঞেস করল, কেমন আছিস নিমু ?

বললাম, ভাল।

তা হলে কাজে হাত দে, আর কদিনই বা বসে বসে তোকে সেবা করা হবে। কাজ কর।

গিন্নিমার আদেশ উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত তা জানি না, তবে সেদিন আমার কিশোর মনে ঐ আদেশ খুবই নিষ্ঠুর মনে হয়েছিল। সেদিন বাদ প্রতিবাদ করার সামর্থ্য ছিল না, বাদ-প্রতিবাদ করতেও জানতাম না। আমার প্রথম প্রতিবাদ যেভাবে পুরস্কৃত হয়েছিল তা ভুলতে পারিনি, তার চিহ্ন তখনও আমার দেহে। সেদিন মনে হয়েছে আমি ওদের দয়াতেই বেঁচে আছি। নিরুপিসী ওদের করুণার ওপর আমাকে রেখে গেছে চার বছর আগে। সুদীর্ঘ চারটে বছর ওদের তাঁবেদারী করেছি। কখনও ভাবিনি আমার মেহনতের বিনিময়েই আমাকে খেতে পড়তে দিচ্ছে। আমার

নিজস্ব কোন সত্তা ছিল বলে আমার বিশ্বাস ছিল না। আমি যেন ছিলাম তাদের কৃপার পাত্র, রাখা না-রাখা তাদের মর্জির ওপর নির্ভর করে। সামান্য যে আত্মাভিমান জন্মেছিল তাও ক'দিন আগে গুঁড়ো হয়ে গেছে অমানুষিক প্রহারে।

আদেশ শুনলাম, কিন্তু কাজে হাত দেবার শক্তি ছিল না দেহে। তাই বললাম, বড্ডই খিদে পেয়েছে মা।

খিদে! আশ্চর্য হয়ে গেল গিন্নিমা।

খিদে পাওয়াটা যে অপরাধ তা সেদিন প্রথম বুঝলাম। অনাহারে থাকাই হল আমাদের ধর্ম, আর পেট শুকিয়ে প্রভুর সেবাই হল আমাদের কর্তব্য। চাকরের খিদে পিপাসা মনিবের কাছে অবান্তর আবদার।

গিন্নিমা খিঁচিয়ে উঠে বলল, তোর জন্য থালা সাজিয়ে বুঝি বসে আছি। তোর আর কাজ করতে হবে না। অন্য কোথাও কাজ খুঁজে নে গে। এখানে পোষাবে না তোর।

বুঝতে শিখেছি কিছু কিছু।

সামান্য লেখাপড়াও শিখেছি মেনকাদিদির কাছ থেকে।

গিন্নিমার বক্তব্য আজ বেশ স্পষ্ট।

মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে রান্নাঘরে গেলাম অলকামাসীকে কাজের সাহায্য করতে।

আগে খিদে পেলে অলকামাসীকে বলতাম। সে পথও বন্ধ। অলকামাসী গালাগালি করলেও চুপি চুপি খেতে দিত। অলকা-মাসীর হাত কামড়ে দিয়েছি, সে ঘটনা সেতো ভুলতে পারেনি। তার কাছে যে আমি সমাদর পাব না তা জেনেও অলকামাসীর কাছে গিয়েছিলাম।

গিন্নিমা গজরাতে গজরাতে নিজের কাজে গেল।

আমাকে দেখে অলকামাসী চমকে উঠল। বলল, এখানে কেন রে ছোঁড়া?

গিন্নিমা কাজ করতে বলল।

আমার এখানে কাজ করতে হবে না তোকে। গিন্নিমাকে বলগে যা।

তবুও আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। অলকামাসী আমাকে দেখেও দেখল না।

মিঠু দারোয়ান যাচ্ছিল রান্নাঘরের সামনে দিয়ে, আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, কেমন আছিস নিমু? কাজে হাত দিয়েছিস?

মিঠুকে দেখেই আমার বুকের রক্ত গেল শুকিয়ে। সে রাতে সে-ই নির্যাতন করেছে বেশি। ভয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম, কোন উত্তর দিতে পারলাম না।

মিঠু আবার প্রশ্ন করল।

ভয়ে ভয়ে বললাম, গায়ে বড় ব্যথা।

মিঠু এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে টানতে টানতে বলল, আয় আমার সঙ্গে। সেদিন খুব রাগ হয়েছিল রে, তাই মেরেছিলাম। ব্যথা তো হবেই। আর বদমাইশি করিস না কখনও। চাকরি করতে এসে এসব সহ্য করতে হয়। খেয়েছিস কিছু?

না।

মিঠু অলকামাসীকে ডেকে বলল, ছোঁড়াটাকে কিছু খেতে দাও দিদি।

অলকামাসী ঝঙ্কার দিয়ে বলল, ওর জন্য পোলাও রান্না করে সিন্দুকে তুলে রেখেছি। নবাবকে খেতে দিতে হবে, আহা। দূর করে দাও ওকে।

অলকামাসীর রূঢ় প্রত্যাখ্যানে মিঠু দারোয়ানও বিরক্ত হয়েছিল। মুখে কিছু না বলে আমার হাত ধরে টানতে টানতে সদরে নিয়ে গেল।

যেতে যেতে বলল, এই রাঁধুনী দিদি হল সবচেয়ে হারামী।

মালিকরা নজর দেয় না তাই সবার কষ্ট। কর্তাবাবু সংসারের কোন খোঁজ রাখে না। বড়দিদির বিয়ের পর থেকে কেমন যেন হয়ে গেছে, আর গিন্নিমাকে খোষামোদ করে ঠিক রেখেছে রাঁধুনী। যত অন্যায়ই করুক, কেউ কিছু বলতে পাবে না। চল আমার সঙ্গে কিছু খেয়ে আসবি। কিছু কিনে খেলেই পারতিস। ওদের তোষামোদ কেন করিস।

বললাম, পয়সা পাব কোথায়?

কেন! তুই তো মাইনে পাস। মাইনের টাকা দিয়ে কি করিস।

মাইনে! টাকা! না তো!

পেটভাতা আছিস বুঝি? চাকরি করবি মাইনে দেবে না, তাকি হয়। মাইনে চাইবি, কেমন?

কেমন গোলমাল হয়ে গেল। মাইনে, টাকা, পেটভাতা—এসব শুনিনি কোনদিন। মেনকাদিদি থাকতে দু' চার পয়সা সে-ই আমাকে দিত। ভালমন্দ খাবার এলে ভাগ পেতাম, কোন জিনিস কিনে খাবার দরকার হত না কখনও। কাপড় জামার প্রয়োজনও মেটাত মেনকাদিদি। কোন অভাব ছিল না কোনদিনই। মাইনের কথা মনেও হয়নি কোন সময়। মিঠু দারোয়ান আমার মনে প্রথম অঙ্কের হিসাব আর প্রভুভৃত্যের সম্পর্ক প্রবেশ করিয়ে দিল।

আমি নীরবে এসে বসলাম মিঠুর ঘরে।

ঢাকনা খুলে দুখানা শুকনো রুটি আর গুড় দিয়ে বলল, কর্তা-বাবুর কাছে মাইনে চাইবি। খা, খেয়ে নে। বড়লোকরা গরীবদের শুধু ফাঁকি দেয়, বুঝলি। ওদের কাছ থেকে মাইনে আদায় করতে হয়। তুই তো তিন চার বছর কাজ করলি, অনেক টাকা পাওনা হয়েছে। চেয়ে নিবি। কর্তাবাবুকে বলবি।

খেতে খেতে বললাম, ভয় করে।

কিসের ভয়! সোজা কর্তাবাবুর ঘরে গিয়ে বলবি, আমার মাইনে দিন। তিন চার বছর কাজ করছি এক পয়সাও পাইনি। আমাকে হিসাব বুঝিয়ে দিন।

মৃদুস্বরে বললাম, যদি বকুনি দেয়, কান মলে দেয়।

দূর পাগল তা কখনও হয়। অলকামাসী কান মলেছে বলে বাবুরা কান মলবে না। পাওনা টাকা চাইলে বকুনি দেবে না, দিলে লোক জানাজানি হবে। এরা সব মানী লোক, নিন্দে হবে। মান খোয়াবে না কিছুতেই। তোর হিসাব বুঝিয়ে দেবে ঠিকই।

যদি তাড়িয়ে দেয়।

দেবে। তাতে তোর কি ক্ষতি। আরেক জায়গায় কাজ করবি। কলকাতা শহরে কাজের অভাব আছে কি? গায়ে গতরে যারা খেটে খায় তাদের অভাব হয় না কখনও। বাবুদেরই কাজ জোটে না। বুঝলি?

মিঠুর কথা শুনে উৎসাহ বোধ করলাম না। এই বাড়িতে সুদীর্ঘ চার বছর কাটিয়েছি, এখান থেকে তাড়িয়ে দিলে খুবই কষ্ট হবে আমার। এখানে মেনকাদিদির সঙ্গ পেয়েছি, তার স্নেহ পেয়েছি, তার কাছে লেখাপড়া শেখার সুযোগ পেয়েছি—এসব ভুলে চলে যেতে পারব না।

মিঠুকে মাইনের কথা না বলে বললাম, একটু জল দাও মিঠুদা।

মিঠু জল গড়িয়ে দিল তার লোটায়। লোটা এগিয়ে দিয়ে বলল, তোর গায়ে খুব ব্যথা, নারে?

খুব নয়, তবে ব্যথা আছে।

সেরে যাবে। ভাবিস না। তুই অলকাদিদির হাত কামড়ে দিলি কেন?

ও আমার কান মলে দিল কেন!

চাকরি করতে এসে ছোটবেলায় অমন কানমলা অনেকেই খায়। তাতে জাত যায় না।

আমার চোখে জল এসে গেল। বললাম, কেউ কোনদিন আমার গায়ে হাত দেয় নি মিঠুদা। তাই খুব রাগ হয়েছিল।

মিঠু বোধহয় আমার দুঃখ বুঝল। স্নেহপূর্ণস্বরে বলল, সেদিন খুবই মেরেছিলাম তোকে। পরে মনে কষ্ট হয়েছিল রে। রাঁধুনীটা হারামী, কারও সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে না। দেখলি না তোকে আজ খেতে দিল না। যারা খারাপ লোক তাদের খোষামোদ করতে হয়। না করলে ক্ষতি করে। তোর কোন বুদ্ধি নেই। যা এবার কাজ কর গিয়ে।

অলকামাসী কাজ করতে মানা করল।

তাতে কি। তুই গিয়ে অন্য কাজ কর। ঘরবাড়ি পরিষ্কার কর। যে কাজ সামনে পাবি সেই কাজ করবি। গিন্নিমা দেখতে পেলেই কোন না কোন কাজ তোকে দেবে। যা। খিদে কমেছে তো। মাইনের কথা ভুলিস না যেন। কর্তাবাবুকে সাহস করে বলতে পারলেই টাকা পাবি। বুঝলি ?

মিঠুর উপদেশ শুনে অন্দরমহলে এলাম ধীরে ধীরে।

গিন্নিমা তখন রাধু রজকের সঙ্গে কাপড় ধোলাইয়ের হিসাব করছিল। আমাকে দেখেই বলল, যা তো নিমু শোবার ঘর ক'খানা ঝাঁট দিয়ে দে।

মিঠুর কথাই ঠিক। এতবড় বাড়িতে কাজের অভাব কি! কাজ পেলাম সঙ্গে সঙ্গে।

আমি কাজ পেয়ে বর্তে গেলাম।

তাড়াতাড়ি ঝাঁটা এনে ঘর ঝাড়তে লাগলাম।

দুপুরবেলায় ভয়ে ভয়ে গেলাম রান্নাঘরে। অলকামাসী স্নান করে আহ্নিক করছিল। আমাকে দেখেই ইসারায় বাইরে দাঁড়াতে বলল। আহ্নিক শেষ না হলে খেতে দেবে না। অগত্যা বারান্দায় চুপ করে বসে রইলাম।

অলকামাসীর আহ্নিক শেষ হতে কম সময় কাটেনি। আমি

যখন খেয়ে উঠলাম তখন তিনটে বাজতে আর বেশি দেরী ছিল না। মুখ ধুয়ে আসতেই অলকামাসী বলল, যা ঐ সামনের খোট্টার দোকান থেকে হু খিলি মিঠে পান নিয়ে আয়। এই নে পয়সা।

মিঠুর কথা মনে পড়ল। খারাপ লোককে খোষামোদ করতে হয়। তাই অলকামাসীকে খুশী করতে ছুটে গেলাম হু খিলি পান আনতে।

পান হাতে করে এসে দেখি অলকামাসী ঝিমুচ্ছে।

ডাকলাম, মাসী, ও মাসী।

চোখ মেলে আমাকে দেখেই খিঁচিয়ে উঠল, সারাদিন খাটা-খাটুনির পর একটু গা মেলে দিয়েছি হতভাগা ছোঁড়াটার তা সহ্য হচ্ছে না। মাসী কি তোর পিণ্ডি দেবে।

আমি বোকার মত তার দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমার পান।

এত দেরী কেন রে হতভাগা। সেই কোন জন্মে গেছিস। দে। চোখটা কেবল ধরেছে। হতভাগা নচ্ছারটা তাড়াতাড়ি আসবে, তা না চোখ জড়িয়ে আসতেই মাসী ওমাসী। মর আবাগীর বেটা।

হুষ্টু লোককে খুশী করা যে কত কঠিন ব্যাপার তা সেদিন থেকে বুঝতে শিখেছিলাম। এরপর অলকামাসী পান আনতে বললে সন্ধ্যের আগে পান এনে দিতাম না। তাতে এক চোট ঝড় বয়ে গেলেও আমার গা-সহা হয়ে গিয়েছিল। কখনও কষ্ট হত না।

ক'দিন পরে মিঠু জিজ্ঞেস করলে, মাইনে পেলি রে নিমু?

বললাম, বলতে পারিনি এখনও।

ভয় করছে বুঝি। তোর বয়সে একটু ভয় করবেই। সাহস করতে হয়। সোজা ঢুকবি কর্তাবাবুর ঘরে। তোকে দেখে নিশ্চয়ই বলবে, কি চাই! তখন বলবি, আমার মাইনে। আর বেশি বলতে হবে না।

বললাম, ভয় করছে মিঠুদা। কর্তার ঘরে যেতেই সাহস পাচ্ছি না, চাওয়া তো দূরের কথা।

মিঠু আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, ভয় কিসের। পাওনা টাকা চাইবি। তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না দেখছি। আর একবার চেষ্টা করে দেখ। না হলে আমি তো আছিই। আমিই ব্যবস্থা করব।

চুপি চুপি বললাম, আমার সঙ্গে তো কোন মাইনে ঠিক হয়নি।

হয়নি, এবার হবে।

তা নয় মিঠুদা। নিরুপিসী আমাকে রেখে গিয়েছিল চাট্টি খেতে দেবার সর্তে। পাত কুড়ানো ভাত খেয়ে যাতে বাঁচতে পারি তারই জন্য রেখে গিয়েছিল।

তখন ছোট ছিলি। ভাল কাজ করতে পারতিস না। এখন বড় হয়েছিস। কাজ করছিস একটা জোয়ান মরদের। এখন মাইনে দিতেই হবে। আলবত দিতে হবে।

মিঠু দারোয়ান বেশ জোর দিয়ে কথা শেষ করল।

আমিও কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

আবার দিন কাটে।

অনেকদিন মনে করেছি কর্তাবাবুর কাছে যাব মাইনে চাইতে। কোনদিনই সাহস করে সদরে তার সামনে যেতে পারিনি। আমার এলাকা হল রান্নাঘর আর শোবার ঘর। সেখানে রাজত্ব করত অলকামাসী আর গিন্নিমা। তাদের সঙ্গে দু চারটে কথা বলা ভিন্ন আর কথা বলার কেউ ছিল না। অবসর পেলে চুপি চুপি বই নিয়ে বসতাম আমার সেই গর্তটায়। সেখানে কেউ আসত না বিরক্ত করতে। বেশ নিরিবিলি ছিলাম সেখানে।

মিঠু কিন্তু আমাকে সহজে নিষ্কৃতি দিল না।

ক'দিন পর পর আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল মাইনের কথা। আমাকে ক্রমেই ঠেলে দিতে লাগল সদরে কর্তাবাবুর দিকে।

তবুও মাস কেটে গেল।

বলতে পারলাম না আমার কথা।

দু চারদিন যে চেষ্টা না করেছি তা নয়, কিন্তু সাফল্যলাভ করতে পারিনি অহেতুক ভীতিতে।

একদিন মিঠুকে বললাম, টাকা দিয়ে কি হবে মিঠুদা ?

অনেক কিছু হবে রে, অনেক কিছু হবে। তোর যদি টাকার দরকার না থাকে আমার কাছে জমা থাকবে। যখন যা দরকার হবে চেয়ে নিস। বড় হয়ে কিছু ব্যবসার ধান্দা করতে পারবি।

আমার মাথায় ওসব কথা ভাল করে শেকড় গাড়তে পারত না। আমার মনে যে ভয় ছিল, তার সঙ্গে ছিল কর্তাবাবুর প্রতি একটা শ্রদ্ধাও। সেটা মনের গোপন কোনায় উঁকি দিত। সেজন্য সাহস করে তার কাছে পৌঁছতে পারতাম না।

আবার মাস পেরোবার উপক্রম।

মিঠুও পেছনে লেগে রয়েছে।

এমন সময় একটা ঘটনা ঘটল। এ ঘটনা না ঘটলে হয়ত লাহা-বাড়ি থেকে আমাকে কোনদিনই চলে যেতে হত না।

সিঁড়ির গর্তে আমার স্থান।

রাতের অন্ধকারে কেউ আমাতে দেখতে পেত না। আমি কিন্তু বাইরের জিনিস দেখতে পেতাম মাঝে মাঝে। কদিন থেকে শরীরটা বড়ই অস্থির করছিল। রাতের বেলায় মাথার যন্ত্রণায় এপাশ ওপাশ করছিলাম। মনে হল কে যেন সিঁড়ির পাশ দিয়ে জ্বালানী রাখবার ঘরের দিকে গেল। তাকিয়ে দেখেও চিনতে পারলাম না। যাই-হোক, এত রাতে চোর ভিন্ন আর যে কেউ নয় সেই বিশ্বাস জন্মাল আমার মনে। ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে গেল। আবার পায়ের শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকালাম। এবার স্পষ্ট দেখতে পেলাম একটা লোককে। সেও এগিয়ে যাচ্ছে জ্বালানী ঘরের দিকে। নিশ্চয়ই একদল চোর। ভয়ে কথা বলতে পারছিলাম না। গলা ছেড়ে ডাকব তাও পারছিলাম না। ভয়ে গলা দিয়ে গোঁ-গোঁ শব্দ বের হতে লাগল।

আবার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম।

শব্দটা সিঁড়িতলার গর্তের সামনে এসে থেমে গেল।

শুনতে পেলাম অলকামাসীর গলা, গোঁ-গোঁ করছিস কেন রে ছোঁড়া?

গোঙাতে গোঙাতে বললাম, চোর অলকামাসী।

কোথায় রে?

জ্বালানী ঘরের দিকে গেছে।

অলকামাসী চাপা গলায় বলল, চুপ। চোর নয়। আমি গিয়েছিলাম।

বললাম, না না। একজন জোয়ান লোককে দেখেছি।

চুপ! ভুল দেখেছিস। চুপ করে শুয়ে থাক। কাউকে বলিস নে যেন।

অলকামাসী ফিরে গেল। আমিও শুয়ে পড়লাম পাশ ফিরে।

পরের দিন সকালবেলায় মিঠু দারোয়ানকে বললাম, কাল রাতে বাড়িতে চোর এসেছিল মিঠুদা।

মিঠু বিশ্বাস করতে পারল না। এমন সুরক্ষিত গৃহে চোর আসা খুব সহজ নয়। রাত জেগে পাহারা দেওয়া তার কাজ। চোর যদি এসেই থাকে তা হলে তার কর্তব্যের ত্রুটি ঘটেছে। সেও চাপা-গলায় প্রশ্ন করল, আর কে দেখেছে?

অলকামাসী।

চুপ। কাউকে বলিস না। আজ তোর ঘরে আমি থাকব। চোর যদি আসে ঠিক পাকড়াও করব।

সবাই বলছে চুপ।

চুপ কেন!

'চোর এসেছিল' না বললে সাবধান হবে না বাড়ির লোক। আমার কেমন খটকা লাগল মনে।

চুপি চুপি ছোট খুকীকে বললাম, দিদিমণি কাল রাতে চোর এসেছিল।

আঁতকে উঠল ছোট খুকী। বলল, চোর!

হাঁ দিদিমণি। অলকামাসীও জানে।

অলকামাসী জানে!

ছোট খুকী ছুটে গেল অলকামাসীর কাছে। পরক্ষণেই ফিরে এসে বলল, মিথ্যে কথা। অলকামাসী বললে, কাল রাতে স্বপ্ন দেখে তুই গোঁ-গোঁ করছিলি। অলকামাসী বাইরে বেরিয়েছিল, তোর গলার শব্দ শুনে দেখতে গিয়েছিল তোকে। তাই তুই মনে করেছিলি চোর এসেছে।

যুক্তিটা খুব সহজ আর সরল।

আমি বোকা হয়ে রইলাম।

অলকামাসীর কথায় সবাই বিশ্বাস করল, আর অলকামাসীর কুনজরে পড়লাম আমি। ক'দিন বেশ কেটে গেল। কোন অশান্তি নেই। অলকামাসী যেন বেশী আগ্রহশীল আমার প্রতি।

হঠাৎ একদিন শুনতে পেলাম, ছোট খুকীর বালা হারিয়েছে। বালা খুলে ছোট খুকী বাথরুমে গিয়েছিল। ফিরে এসে বালা আর টেবিলে পাওয়া যায় নি।

খোঁজ খোঁজ রব উঠল।

আমি বাজারে গিয়েছিলাম সরকার মশায়ের সঙ্গে। ফিরে এসে শুনলাম ছোট খুকীর বালা পাওয়া যাচ্ছে না। সকাল দশটায় কে নেবে বালা! আশ্চর্য!

সবার সন্দেহ হল ঝি-চাকরদের ওপর।

তল্লাসী করল মিঠু দারোয়ান। সবার সব কিছু খুঁজেও বালা পাওয়া গেল না। ঘটনার সময় আমি ছিলাম না সেজন্য আমার গর্তটা খোঁজার দরকার মনে করেনি মিঠু দারোয়ান। অলকামাসী মনে করিয়ে দিল, ছোঁড়াটার ঘর দেখলে না মিঠু।

ছোঁড়া তো সকাল থেকেই ছিল না।

তা হলেও কারও সঙ্গে শট্ করে করতেও পারে।

যুক্তিটা অকাট্য।

মিঠু আমার গর্ত তল্লাসী করে আমার বিছানার তলা থেকে বালা খুঁজে পেল।

বালা পাওয়ার পর প্রশ্ন দেখা দিল নানারকম।

আমি বাড়ি ছিলাম না, তাই আমি কি করে চুরি করলাম তা স্থির করতে পারল না কেউ।

অলকামাসী বলল, ওর সঙ্গে লোক আছে।

কেউ কেউ বলল, তাও কি হতে পারে?

গিন্নিমা অলকামাসীর কথাই বিশ্বাস করল।

বিশ্বাস করেনি একজন, সে হল বাড়ির খোদ কর্তা গিরীনবাবু।

আমাকে ডেকে নিয়ে গেল সদরে তার কামরায়।

জেরার পর জেরা করে সে রাতের চোরের ঘটনা জেনে নিল।

তারপর অনেকক্ষণ চিন্তা করে বলল, তোর আত্মীয়স্বজন কেউ আছে?

জানিনা।

আজকের মত এখানে এই কামরায় থাকবি। কাল তোকে ছুটি দেব। এ বাড়িতে তোর আর থাকা চলবে না, থাকা উচিতও নয়। কাল কোন জায়গায় কাজে লাগিয়ে দেব তোকে। এদিকের ব্যবস্থা আগে করতে হবে। সেটাই করছি।

সেদিন বিকেলে অলকামাসী আর সরকার মশায়কে পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখলাম লাহাবাড়ির সদর পেরিয়ে। আর মিঠুর কাছে সংবাদ পেলাম, সে রাতে চোর আসেনি। এসেছিল অলকামাসী আর সরকার মশায়। ওরা যে পেছনের দরজা দিয়ে গোপন কুঠুরীতে ঢুকেছিল, তা স্বীকার করেছে অলকামাসী। বালা চুরি করেছিল অলকামাসীই। আমাকে বাড়িছাড়া করতে

চেয়েছিল তার কুকাজের প্রমাণ নষ্ট করতে, তাই চোর অপবাদ দিতে চেষ্টা করেছিল। চেষ্টা করেও সাফল্যলাভ করেনি। কর্তাবাবুর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সবকিছুই পরিষ্কার হয়ে গেছে।

পরেরদিন সকালবেলায় কর্তাবাবু আমাকে ডেকে বলল, ক'বছর আছিস এখানে।

বললাম, অত মনে নেই। অনেকদিন। বড়দির বিয়ের তিন বছর আগে এসেছিলাম।

কর্তাবাবু মনে মনে হিসাব করে বলল, সাড়ে চার বছর হবে, কি বলিস।

তা হতে পারে।

মাইনে পেয়েছিস ?

না।

তা হলে ছাপান্ন মাস, তিন টাকা হিসেবে একশ' আটষট্টি টাকা তোর পাওনা কেমন ?

আমার মাথা ঘুরে গেল।

একটাকার যোগ্যতা যার নেই তার পাওনা একশ' আটষট্টি টাকা। বাপরে !

কর্তাবাবু বলল, এতগুলো টাকা তোর হাতে দিলে নষ্ট হবে। তার চেয়ে দশটা টাকা নিয়ে যা আর আমার কাচারিতে বাকি টাকাটা জমা থাকবে। যখন বড় হবি কিংবা খুব দরকার পড়বে তখন আসিস, টাকাটা দিয়ে দেব। এই কাগজে হিসাব লিখে দিলাম। এটা কাছে রাখবি। বুঝলি ?

সেদিন কর্তাবাবুকে বুঝতে পারিনি। এমন সুবিবেচক স্থিরবুদ্ধির লোক সচরাচর দেখা যায় না আজকের সমাজে, বিশেষতঃ চরিত্রের বলিষ্ঠতাই তাকে শ্রদ্ধাভাজন করেছে অনেকের কাছে।

অলকামাসী আর সরকার মশায়কে গৃহত্যাগে বাধ্য করাতে অনেকেই আশ্চর্য হয়েছিল। আমিও। পরবর্তী কালে বুঝতে

পেরেছিলাম এটাই ছিল কার্য কারণের অনিবার্য পরিণতি। যদি বিলম্ব ঘটত তা হলে লাহাবাড়ির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হত, হয়ত আরও অঘটন ঘটত।

অনেকদিন পর কর্তাবাবুর কাছে গিয়েছিলাম কিছু টাকা আনতে। মিঠু দারোয়ান তখনও ছিল। তার কাছেই শুনেছিলাম কর্তাবাবু জোর করে সরকার মশায় আর অলকামাসীর বিয়ে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, সরকার মশায়কে একটা কাজও জোগাড় করে দিয়েছিল।

সেদিন কর্তাবাবুর কাছ থেকে দশটা টাকা হাত পেতে নিয়ে লাহাবাড়ির দেউড়ি পেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়ালাম। কর্তাবাবু বলেছিল, তোর কাজ ঠিক করেছি মল্লিকদের বাড়িতে। কাল আসিস, তোকে পাঠিয়ে দেব।

কাজের প্রত্যাশায় কর্তাবাবুর কাছে আর যাওয়া হয়নি।

সেই যে দেউড়ি পেরিয়ে এলাম তারপর আরও দু তিনবার যেতে হয়েছে টাকা আনতে। নইলে ঐ দেউড়ি পেরিয়ে হয়ত আর যেতে হত না, যাবার মত মনও ছিল না।

দেউড়ি পেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়াতেই মিঠুর সঙ্গে দেখা।

কোথায় যাচ্ছিস নিমু?—জিজ্ঞেস করল মিঠু।

বললাম, ছুটি পেয়েছি মিঠুদা। কর্তাবাবু জবাব দিয়েছে।

মাইনে পেয়েছিস?

পকেট থেকে দুটো পাঁচ টাকার নোট বের করে বললাম, এই পেলাম।

মাত্র দশ টাকা।

আমি আর উত্তর দিলাম না। নোট দুটো পকেটে রেখে পথ চলতে সুরু করলাম। মিঠু পেছন থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবি এখন?

নিরুপিসীর কাছে। বলতে বলতে এগিয়ে চললাম।

নিরুপিসী আমাকে লাহাবাড়িতে রেখে গিয়েছিল। তারপর সাড়ে চার বছরে বার তিনেক এসে আমার খবর নিয়ে গেছে। মেনকাদিদির বিয়ের ক'দিন আগে শেষ এসেছিল। তারপর থেকে পিসী আর আসেনি। তাও প্রায় দেড় বছর হতে চলল। সে বেঁচে আছে কিনা তাও জানিনা। ঠিকানাটা জানা ছিল। ভরসা করে তারই সন্ধানে বের হলাম।

অনেক খুঁজে নয়নতারার গলি বের করে নিরুপিসীর আস্তানা পেলাম। এই মেঠো বস্তিবাড়িতে আমিও বাস করেছি আট বছর। সে আট বছরের স্মৃতি ক্রমেই ঝাপসা হয়ে এসেছে। বাড়িটা দেখে কিছু কিছু মনে পড়ছিল পুরানো দিনের কথা। গোটা বাড়িটার চেহারা নতুন বলে মনে হলেও আমি সাহস করে ঢুকে খুঁজে বের করেছিলাম নিরুপিসীকে।

দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকলাম, নিরুপিসী।

ভেতর থেকে আওয়াজ এল, কে রে ?

বললাম, আমি নিমু, নির্মল।

ভেতরে আয়। আয়, আমি আর নড়তে পারি না রে নিমু। বাতে আমার সর্বনাশ করেছে।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখি, নিরুপিসী শুয়ে আছে ছেঁড়া ময়লা একটা বিছানায়। আমাকে ইসারায় পাশে বসতে বলল।

হঠাৎ কি মনে করে এলিরে নিমু ?

বললাম, চাকরি নেই পিসী। আজ জবাব হয়ে গেছে।

নিরুপিসী হাসল।

বলল, বদমাইশি করেছিলি নিশ্চয় !

না। আমি তো বদমাইশি করিনা পিসী। কেন ছাড়িয়ে দিল তাও জানি না। বোধহয় আমাকে দিয়ে কাজ হচ্ছিল না।

পয়সা কড়ি দিয়েছে কিছু।

দিয়েছে নগদ দশ টাকা আর বাকি টাকা জমা আছে কর্তাবাবুর

কাছে। বলল, এত টাকা হাতে পেলে নষ্ট হতে পারে। যখন যেমন দরকার হবে নিয়ে যাস।

নিরুপিসী বলল, ভালই বলেছে। খেয়েছিস কিছু!

না। প্রাণ ধরে টাকা ভাঙ্গাতে পারিনি পিসী। আরেকটা কাজের সন্ধান না পেলে নয়। কাজ পেলে টাকা ভাঙ্গাব মনে করেছি।

বেশ বুদ্ধি তো তোর। এখন তো বেশ ডাগর হয়েছিস, কাজ পাবি নিশ্চয়ই। আমি যে পঙ্গু হয়ে পড়ে আছি, নইলে এখুনি সব ব্যবস্থা করতে পারতাম। তোর মেনিমাসী যদি সাহায্য না করত তা হলে না খেয়ে গুয়ে গোবরে মরতে হত আমাকে। যা একবার মেনির সঙ্গে দেখা করে আয়। টাকাটা ভাল করে রাখিস।

মেনিমাসী কলতলায় বাসন মাজছিল।

আমাকে চিনতে পারল না।

বললাম, চিনতে পারলে না মাসী, আমি নিমু, নির্মল।

এবার চিনতে পারল মাসী। হেসে বলল, তাই বল। তুই কতবড় হয়েছিস রে নিমু। সেই রোগা প্যাট্‌কা ছেলেটা এতবড় হয়েছিস! বেঁচে থাক বাবা। কি মনে করে এলি। এতদিন পরে মাসীকে মনে পড়েছে বুঝি!

আসার সময় পাইনি মাসী। আর রাস্তাও চিনতাম না। অনেক কষ্ট করে এবার খুঁজে খুঁজে আসতে হয়েছে। তুমিও তো যাওনি আমাকে দেখতে।

মেনিমাসী হাসিমুখে আমার হাত ধরে টানতে টানতে তার ঘরে নিয়ে বসাল। বলল, তোকে দেখে খুবই আনন্দ হয়েছে আজ। কতদিন পর। তোর মা যদি থাকত তাহলে সেও খুশী হত। সে মাগীর আক্কেল খারাপ নইলে এমন সোনার চাঁদ ছেলেকে রেখে হালদারের ঘর করতে যায়। মরুকগে মাগী। নে বাবা কিছু খেয়েনে। আর খেতেই বা দেব কি। যুদ্ধ আর যুদ্ধ। এই নিয়ে পাগল সবাই।

খাবারের দামও বাড়ছে হু-হু করে। কোথায় যুদ্ধ আর এখানে মরছি আমরা। ছটা মাস ধরে শুনছি শুধু যুদ্ধ, ভাল লাগে না বাপু।

মেনিমাসীর কাছে নতুন কথা শুনলাম। লাহাবাড়ির দেউড়ি পেরিয়ে অন্দরে বা সদরে যুদ্ধের কথা পৌঁছয়নি। ছ'মাস হল যুদ্ধ চলছে অথচ সে বাড়ির কেউ সে খবর রাখে না। যারা জানে, তারা ঝি চাকরদের জানতে দেয় না কখনও। বাইরের ছুনিয়ার সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয় না ও বাড়ির ঝি-চাকরদের।

আমি বললাম, কিসের যুদ্ধ মেনিমাসী!

জার্মানযুদ্ধ। জানিস না, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন একবার জার্মান যুদ্ধ হয়েছিল। এবার আবার জার্মান যুদ্ধ।

বললাম, জার্মান বুঝি খুব যুদ্ধ করে।

জানি না বাপু। লেখাপড়া জানা লোকেরাই জানে না আমি তো মুখ্যুমানুষ। নে খেয়ে নে। চিড়ে গুড় বিনে আর কিছু নেই ঘরে। তোর মেসো কদিন আসেনি, বাজারহাটও হয়নি। আগে নিরুঠাকুরঝি বাজারটা করে দিত ঠেকায় ঠোকায়। তাকেই এখন কে দেখে ঠিক নেই। রামখেলাওন আজকাল সবদিন আসেনা, তারও অভাব। নিরুঠাকুরঝিকে টানতে হয় মাঝে মাঝে। হাঁরে নিমু, তুই কি লাহাবাড়িতেই আছিস?

কাল অবধি ছিলাম, আজ থেকে জবাব হয়ে গেছে।

চাকরি নেই শুনে মেনিমাসী মোটেই ছঃখিত হল না, চিন্তিত হল না। মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, হুঁ, কালই তোর চাকরি হবে। আমাদের কি কাজের অভাব হয় রে। গতরে খাটতে পারলেই হল। নে খেয়ে নে। নিরুঠাকুরঝিকে দেখতে যেতে হবে। তুই দেখা করেছিস?

তার ঘর থেকেই তোমার কাছে এসেছি। পিসী তো দেখছি একেবারেই বিছানা নিয়েছে।

মেনিমাসীর মুখে শোনা গেল, আহা!

আমি খাওয়া শেষ করে মেনিমাসীর সঙ্গে নিরুপিসীর ঘরে এসে বসলাম।

সাহাবাড়ির পরিবেশ আর বস্তির পরিবেশে যে কত তফাৎ তা বুঝতে সময় লাগেনি। মেনিমাসীর ঘরে মেসো আসত অনেক রাতে। তার ঘরে একদিন শুয়েই বুঝলাম সেখানে রাত কাটানো মোটেই সম্ভব নয়। অনিল মেসো মদ খেয়ে আসত। মদ খেয়ে মাতলামী করত না, তবে জবরদস্তি দু'এক চুমুক মদ খেতে বাধ্য করত মেনিমাসীকে। ওদের ফিস ফিসানিতে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। কথাগুলো কানে যাচ্ছিল, চোখ মেলে তাকাবার ভরসা ছিল না।

তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

সকালবেলায় ঘুম ভাঙ্গতে চোখ খুলেই আবার চোখ বুঁজতে হল।

মেনিমাসী আর অনিলমেসো শালীনতার কোন বন্ধন রেখে নিজেদের অপকর্মকে গোপন করবার কোন চেষ্টাই করেনি। ঘরে যে অপর একজন কিশোর রয়েছে সে খেয়ালও তাদের ছিল না। বোধহয় মদের নেশায় দুজনেই ভুলে গিয়েছিল আমার কথা। এ দৃশ্য দেখতে আমি অভ্যস্ত নই। কোন রকমে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লাম ঘর থেকে। তখনও মেনিমাসী আর অনিলমেসো অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

দরজা ভেজিয়ে ধীরে ধীরে নিরুপিসীর ঘরে এসে বসলাম।

নিরুপিসী আমাকে দেখেই বলল, একটা কাজ আছে করবি?

বললাম, কোথায় কাজ?

বড় বাজারে। রামখেলাওন বলছিল, দুনো নাফা। লড়াইয়ের বাজার। লাভ খুব। কারও চাকরি করতে হবে না। শুধু খদ্দের জোটান। তাও তোকে জোটাতে হবে না, তুই পাহারায় থাকবি। পুলিশ আসতে দেখলে খবর দিবি?

নিরুপিসীর কথা মোটেই বুঝতে পারলাম না। পুলিশ, পাহারা সবই গোলমেলে বস্তু। বললাম, কাজটা তো বলছ না?

সেটা বলবে রামখেলাওন। আজ আবার সে আসবে। তার সঙ্গে সকালবেলায় যাবি। কাজ বুঝিয়ে দেবে তোকে। তারপর কাজে হাত দিবি।

আমার ভয় করছে পিসী, আমি বললাম।

ভয় আমারও করছিল, তারপর রামখেলাওন সব বুঝিয়ে বলতেই মনে হল অতি সহজ কাজ। একবার কাজ হাতে নিলেই আর ফিরতে ইচ্ছে হবে না। হয়ত তুই-ই মালিক হবি একদিন।

কিছু না বুঝেই বললাম, তুমি যখন বলছ তখন যাব।

নিরুপিসী ও প্রসঙ্গ নিয়ে আর কোন কথা না বলে জিজ্ঞেস করল, মেনি উঠেছে?

না ঘুমুচ্ছে। ওখানে আর শুতে পারব না পিসী।

কেন রে?

বলতে পারলাম না কেন শুতে পারব না। শুধু বললাম, তোমার ঘরেই শোব পিসী।

আমার ঘরে কষ্ট হবে রে। রামখেলাওন বড় বদমেজাজী। যাক্‌, বারান্দায় শুয়ে থাকিস। গরমকালে কষ্ট হবে না।

মেনিমাসী আর নিরুপিসীর যে সমান অবস্থা তা গোপন রইল না। কেউ-ই বাইরের লোককে ঘরে স্থান দিতে চায় না, তাদের ব্যক্তিগত জীবনটাকে কেউ ব্যঙ্গ করে, এমন অবস্থা তারা সৃষ্টি হতে দিতে চায় না।

পরেরদিন রামখেলাওনের সঙ্গে বড়বাজারে গেলাম। বাঁশতলা গলিতে তার দোকান। দোকানের পেছনে ছোট্ট একটা ঘর, তার দরজা পেছন দিকে। রামখেলাওন আমাকে নিয়ে গিয়ে বসাল সেই ঘরে। মাদুর বিছানো রয়েছে সম্পূর্ণ ঘরটা জুড়ে। একপাশে দাঁড় করানো রয়েছে কয়েকটা বনস্পতির টিন।

রামখেলাওন বললে, এখানে বস। কাজের সময় ডাকব।

আমি বসেই রইলাম।

ছুপুরবেলায় রামখেলাওন একটা থলি হাতে করে এসে বলল, বাইরে শিউচরণ দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে যাবি। সে যা যা দেবে তা থলেতে করে নিয়ে আসবি। হুঁসিয়ার কেউ যেন টের না পায়।

আমি বিনাবাক্যব্যয়ে রামখেলাওনের সঙ্গে এসে শিউচরণকে দেখতে পেলাম। রোগা লম্বা লোকটা বেশভূষায় বেশ পরিচ্ছন্ন। আমাকে দেখেই শিউচরণ বলল, এই ছেলেটার কথা বলেছ?

রামখেলাওন মাথা নেড়ে বলল, হাঁ। কাজের ছেলে হবে।

শিউচরণ আমার আপাদমস্তক ভাল করে দেখে বলল, উমিদ হ্যায়। নে চল আমার সঙ্গে। দেরী করিস না। খাওয়া হয়েছে? হয়নি? আচ্ছা চল, রাস্তায় খেয়ে নিবি।

শিউচরণের সঙ্গে বের হলাম বড়বাজার থেকে।

পথে খাবারের দোকানে বসিয়ে পেটভর্তি মিষ্টি খাবার খাওয়ালো। তারপরেই উঠলাম বাসে। সোজা হাওড়া ষ্টেশন।

সেখান থেকে আবার বাসে উঠে হাওড়া শহরের শেষে নেমেই শিউচরণ বললে, জলদি।

শিউচরণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হেঁটে চলেছি।

একটা ভাঙ্গা বাড়ির সামনে এসে শিউচরণ বলল, দাঁড়া।

ভাল করে চারিদিক দেখে শিউচরণ বাড়ির ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, পুলিশ দেখলে শিস্ দিবি। বুঝলি?

বললাম, আচ্ছা।

আধঘণ্টার মধ্যেই শিউচরণ দুটো বনস্পতির টিন হাতে করে ফিরে এল। এসে বলল, থলেতে নিয়ে নে।

আমি টিন দুটো থলেতে ভর্তি করতেই শিউচরণ আবার বললে, আমার পেছনে পেছনে আসবি। আমার কাছে আসবি না। দূরে দূরে থাকবি। কেমন!

মাথা নেড়ে বললাম, আচ্ছা।

শিউচরণ অনেকটা আগে আগে চলছিল। আমি তাকে অনুসরণ করছিলাম। রাস্তার বাঁকে এসে শিউচরণ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পথের নির্দেশ দিয়ে আবার এগোতে থাকে, আমিও চলতে থাকি।

জনাকীর্ণ একটা জায়গায় এসে শিউচরণ ট্যাক্সি ডাকল।

ট্যাক্সী ড্রাইভারকে যথাযথ উপদেশ দিয়ে আমাকে তুলে দিল গাড়িতে, বলল, ভাড়া মেটাবে রামখেলাওন।

শিউচরণ আমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে বাসে উঠল।

বড়বাজারে রামখেলাওনের দোকানের সামনে আসতেই রাম-খেলাওন গাড়ি ভাড়া মিটিয়ে আমার হাত থেকে থলে দুটো নিয়ে আমার কাজের প্রশংসা করল। পকেট থেকে নগদ একটি টাকা আমার হাতে দিয়ে বলল, তোর মজুরী।

আমি ফিরে গেলাম নয়নতারার গলিতে।

মেনিমাসী আমাকে দেখে রুষ্টভাবে বলল, কোথায় গিয়েছিল নিমু?

বললাম, কাজ পেয়েছি মাসী।

কি কাজ?

রামখেলাওনের দোকানে। আজ মজুরী পেয়েছি এক টাকা।

মেনিমাসীর মুখ শুকিয়ে গেল।

আমি কোন অন্যায় করেছি মনে করে বোকার মত চেয়ে রইলাম তার দিকে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মেনিমাসী আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বলল, ও কাজ তোকে করতে হবে না। আমি কাজ ঠিক করে দেব।

বললাম, কাজে মেহনত কম।

তা হোক। ও কাজ ভাল কাজ নয়। চল এবার খেতে।

খেয়েছি মাসী।

কি খেয়েছিস।

রসগোল্লা, পানতোয়া আরও কতকি।

ও খেলে মানুষ বাঁচে না রে ছোঁড়া। ভাত খাবি চল। দু'এক দানা মুখে দিয়ে নে। চান্ তো করিসনি। চান করে নে।

চান্ করে খেতে বসতেই মেনিমাসী বলল, আর কখনও রাম-খেলাওনের কাজে যাস না। ওরা চোলাই মদের চোরা কারবার করে। পুলিশ ধরলে আর রক্ষা থাকবে না। দু'দুবার জেল হয়েছে রামখেলাওনের। খবরদার ওর সঙ্গে যাবি না। তা হলেই মরবি।

আমিও ভয় পেয়ে গেলাম।

খেতে খেতে বললাম, তুমি জানলে কি করে?

বারে, মদের মামলায় দুবার যে জেল হয়েছে রামখেলাওনের! আরও অনেক কিছু আছে। সে সব শুনে কাজ নেই। তোর মেসো তোকে কাজ ঠিক করে দেবে। কাজের অভাব কি!

খেয়ে উঠে শুয়ে পড়লাম মেনিমাসীর ঘরে। মেনিমাসী মাদুর বিছিয়ে দিয়েছিল। আমি গা এলিয়ে দিতেই মেনিমাসী পাশে এসে বসল। বলল, নিরুঠাকুরঝি ভাল মানুষ। তাই ওসব বোঝে না। রামখেলাওন যা বলে তাই শোনে। আমরা তো জানি। নিরুর মেহনতি টাকা দিয়ে রামখেলাওনের দোকান। এখন নিরুর গতরে জোর নেই, রামখেলাওনও আর আসে না। মাঝে মাঝে আসে বস্তির লোকদের তাড়নায়, নইলে পাশের বস্তির খুন্তিকে নিয়েই কাটাত। দু পক্ষকেই বহাল রেখেছে রামখেলাওন। নিরুর খরচও আজকাল দেয় না, কি করে যে নিরুর দিন চলে তা আমি জানি। অনিল আছে বলেই বেঁচে রয়েছে নিরু। তুই কখনও ওদের ধারে কাছে যাস না।

মেনিমাসীর কথা শুনে ভেতরে ভেতরে শুকিয়ে উঠেছিলাম। লাহাবাড়িতে এসব হুজ্জত ছিল না, এসব আলোচনাও কোনদিন শুনিনি। আর, এ এক নতুন জগত। এখানকার হালচাল নতুন করে শিখতে হচ্ছে। আমি অবাক হয়ে মেনিমাসীর কথা শুনছিলাম আর ভয়ে শুকিয়ে যাচ্ছিলাম।

মেনিমাসী উঠে যেতেই আমিও পাশ ফিরে শুলাম।

ঘুম যখন ভাঙল তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। শুয়ে শুয়ে নয়ন-তারার গলিতে যে তিনদিন বাস করলাম তার কথা ভাবছিলাম। ভাবতে ভাবতে মনে হল আমার বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেল এই তিনদিনে। অনেক কিছু শিখেছি সামান্য তিনটে দিনে।

রাতের বেলায় বারান্দায় শুয়েছিলাম। ঘুম হয়নি মোটেই।

খুব সকালে উঠে কলতলায় মুখ ধুয়ে এসে নিরুপিসীর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকলাম, পিসী ও পিসী!

দরজা খোলাই ছিল।

রামখেলাওন রাতে এসেছিল কিন্তু ফিরে গেছে রাতের বেলাতেই। আমার ডাক শুনে নিরুপিসী বলল, ভেতরে আয় নিমু।

আমি ভেতরে ঢুকতে নিরুপিসী বলল, রামখেলাওন বলছিল, নিমু খুব কাজের ছেলে। তাড়াতাড়ি যেতে বলেছে তোকে। এখুনি কিছু খেয়ে চলে যা।

বললাম, যেতে পারব না পিসী।

কেন রে?

ও কাজ ভাল লাগেনি। কাজ পেয়েছি অন্য জায়গায়।

নিরুপিসীর মুখ শুকিয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, রামখেলাওন তো তোকে খুব ভাল বলল।

বললাম, ও কাজ করতে পারব না পিসী। আমার ভয় করে।

ভয় কিসের। কত পয়সা। জানিস, রামখেলাওন জমি কিনেছে টালিগঞ্জে। পান বিড়ি বিক্রি করলে পেট ভরত কি! নানাভাবে উপায় করতে হয়। তুইও শিখে নে।

আমি মাথা নাড়তে নাড়তে বললাম, তা হলেও পারব না পিসী। আমি অন্য কাজ পেয়েছি। না পেলেও খুঁজে নিতে পারব।

নিরুপিসী আর চাপাচাপি করল না। আমিও চুপ করে বসে রইলাম।

দুপুরবেলায় মেনিমাসী ডেকে খেতে দিল।

জিজ্ঞেস করলাম, মেসোর কাছে কাজ হবে মাসী ?

হবে। কালকে বলবে। ব্যবসায়ের অংশীদার আছে, তাদের জিজ্ঞেস না করে বলতে পারল না।

আমি আশান্বিত হয়ে চুপ করে খেয়ে উঠে গেলাম।

মেনিমাসী আর নিরুপিসী দুজনকে ভাল করে বুঝে উঠতে পারছিলাম না। বয়স যখন বাড়ল তখন কিছুটা বুঝেছিলাম। মেনিমাসীই বলেছিল, নিরু তখন নড়তে পারতো না, রামখেলাওন তাকে খরচ দিত না। তোকে হাতে রেখে কোনরকমে জীবনের বাকি কটা দিন কাটাবে স্থির করে তোকে চোলাই ব্যবসায়ের সঙ্গে জুড়ে দিতে চেয়েছিল। সাংঘাতিক মেয়ে মানুষ ঐ নিরু। তাই তোকে সাবধান করতে হয়েছিল।

কিন্তু মেনিমাসীর কি স্বার্থ !

সেও তো সংযত ছিল না মোটেই, সংযত হবার চেষ্টাও করত না। বস্তির সাধারণ জীবনের সঙ্গে তারও বিশেষ পার্থক্য কোথাও ছিল বলে মনে করতে পারিনি কখনও, অথচ যখনই দেখেছে আমার চলার পথে বিপদ আসতে পারে তখনই সাহায্য করেছে। কেন ? এ 'কেন' কোন জবাব দেয়নি। তবে অনেক সময়ই মনে হয়েছে তার সুপ্ত মাতৃত্ব অনাস্বাদিত সন্তানস্নেহ বিতরণ করতে চেয়েছে আমার ওপর। তার শূন্যক্রোড়ে স্থান দেবার উৎকট আকাঙ্ক্ষা নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

তবুও যখনই মেনিমাসীর কথা মনে হয়েছে তখনই কেমন একটা কৃতজ্ঞতাবোধ জেগেছে। প্রায়ই মনে হয়েছে বস্তির ঐ অসুস্থ পরিবেশে বাস করেও কি করে মেনিমাসী নিজের হৃদয়বৃত্তি স্বাভাবিক স্বার্থপরতার কাছে বলি দিতে পারেনি। ওটা তার মহত্ত্ব কি দুর্বলতা তা বিচার করতে পারিনি। তবুও তার সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে আমার মনে।

অনিল মেসো কাজ দিয়েছিল তার দোকানে।

দোকান ঘর ঝাট্ দেওয়া, জল আনা, ধূপ ধুনো দেওয়া আর ফরমাইস শোনা হল আমার কাজের রুটিন। বেতন তিন টাকা। অথচ সারাদিন থাকতে হত দোকানে। সকাল আটটা থেকে রাত দশটা অবধি দোকানে থাকা যতই কষ্টকর হোক থাকতেই হত। কিন্তু তিন টাকায় পেট চলা যে কোনক্রমেই সহজ নয় তা জেনেও বেতন বৃদ্ধি করতে রাজি হয়নি অনিল মেসো। আমাকে বলেছিল খেতে পাচ্ছিস তো।

মেনিমাসী খেতে দিত।

সে খরচ অবশ্যই অনিল মেসোর।

সেজন্য আপত্তি জানাবার পথ আপনা থেকেই রুদ্ধ হয়ে গেল।

যাতায়াতের পথে নতুন মনে হত সব কিছুই।

নতুন অনেক কিছুই শিখলাম ধীরে ধীরে।

বেশি করে সজাগ হলাম নিজের সম্বন্ধে।

একদিন মেনিমাসীকে বললাম, আমি যুদ্ধে যাব মাসী।

মেনিমাসী হেসে বলল, সবে ষোল বছর বয়েস। নেবে কেন তোকে!

অতো ভাবিনি। বললাম, আমার একাজ ভাল লাগছে না মাসী। রামখেলাওন মদের চোলাই করত আর এরা চাল ডালের চোরাই কারবার করে। দুই-ই সমান।

চমকে উঠল মেনিমাসী।

আজকাল অনিল মেসো সবদিন আসে না। আসবার সময়ও পায় না। নানা জায়গায় গুদাম। তার তদ্বির করতে, টাকা পয়সার হিসাব করতে অনেক রাত হয়ে গেলে বাড়ি ফিরে যেত অনিল মেসো।

মেনিমাসী কিছু বলল না।

পরেরদিন সকলবেলায় বলল, কোথাও তোকে কাজ করতে হবে না। তুই এখানেই থাক।

খাব কি।

আমি খেলে তুইও খাবি।

বাজারে চাল নেই। শুনছ না দরজায় দরজায় ভিখিরীরা চিৎকার করছে।

শুনেছি, দেখেছি কিন্তু তোর মেসো চালের অভাব রাখেনি। চিন্তা করিস না।

সত্যিই চালের চিন্তা করতে হয়নি কোনদিন। অনিল মেসো চাল জুগিয়ে দিয়েছে আগাগোড়া। বস্তির অর্ধেক ঘরে যখন উনুন ধরেনি, তখনও মেনিমাসীর ঘরে ভাত রান্না হয়েছে।

একদিন বাইরে ঘুরে এসে বললাম, অনেক লোক না খেয়ে মরে রয়েছে ফুটপাতে।

তুই দেখেছিস?

দেখে এলাম।

মেনিমাসী চুপ করে রইল।

মোলায়েম গলায় বললাম, মাসী।

কেন রে?

একটা কাজ পেয়েছি।

কি কাজ?

রেশনের দোকানে মাল মেপে দিতে হবে। মাইনে আঠার টাকা।

বেশ। কাজ নে।

পরদিন রেশনের দোকানে কাজ পেলাম। সকাল বিকেলে খদ্দেরকে মাল মেপে দেওয়া হল আমার কাজ। ওজন দেবার সময় হত না। একটা মাপ মেপে নিয়ে চাল দিতাম। তাতে দোকানদারের লাভ হত, আমারও। পুরো একসের চাল কাউকেই দিতে হত না, অথচ হিসাব ও দাম ছিল একসেরের।

এখানে পরিচয় হোল নুরুল হোদার সঙ্গে।

নুরুল হোদা ছিল উপরিমালের খদ্দের। রেশন দোকানের মালিক দীনবন্ধুনাথের সঙ্গে ছিল তার খুবই জমাট ভাব। সন্ধ্যার পর বেচাকেনা শেষ হলেই দরজা বন্ধ করে হিসাবে বসত দীনবন্ধু। চুপি চুপি পেছন দরজা দিয়ে ঢুকত নুরুল।

আজ কতটা?—ঢুকেই প্রশ্ন করত নুরুল।

এখনও হিসেব হয়নি।—বলত দীনবন্ধু।

হিসাব শেষ করতে খুব বেশি দেরী হত না। কোনদিন দশসের কোনদিন পনের সের চাল। কিছু আটা, কিছু চিনি মুটের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে নুরুল চেপে বসত দোকানে। দীনবন্ধু আমাকে ছুটি দিয়ে বলত, যাও নির্মল বাড়ি যাও। জলখাবারী এই দু'আনা নাও।

এটা আমার উপরি পাওনা।

হাত সাফাই দেখতে দেখতে একদিন আমিও হাত সাফাই করে পাঁচ সের চাল পাচার করে দিলাম মেনিমাসীর ঘরে।

রাতের বেলায় ফিরে আসতেই মেনিমাসী জানতে চাইল এত চাল কোথা থেকে এল। সব কিছু ভেঙ্গে বলতেই মেনিমাসী গম্ভীর-ভাবে বলল, ভাল কাজ করিসনি নিমু।

অনিল মেসো তো এই করেই চাল পাঠায়।

তার কথা বাদ দে। তুই ছেলেমানুষ। তোর জীবন পড়ে আছে, বিপদ হলে কে রক্ষা করবে বল! অনিলের টাকার অভাব নেই। উকিল মোক্তার আছে। তোর কে আছে?

আমি কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে মাথা গুঁজে বসে রইলাম।

কাল ভিখিরীদের এই চাল বিলিয়ে দিস। আর কখনও আনিস না যেন।

আচ্ছা। কিন্তু!

কিন্তু আবার কি?

দীনবন্ধু মুদি তো বেশ পয়সা করে নিয়েছে। শুনলাম গোয়াবাগানে জমি কিনছে।

টিকবে না। অধর্মের পয়সা টেকে না। আজ খুব জমজমাট দেখবি, কাল দেখবি ফকির। অধর্মের পয়সা আসেও অনেক, যায়ও না জানিয়ে।

মেনিমাসী কথা থামিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, খেতে চল।

খেয়ে শুয়ে পড়া বড় কাজ।

আজ শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম মেনিমাসীর এত ধর্মজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বস্তিতে একজনের রক্ষিতা হিসেবে সে কেন বাস করছে। মেনি-মাসীকে জানবার প্রবল বাসনা জাগল মনে।

একদিন মেনিমাসীকে বললাম, তোমার দেশ কোথায় ছিল মেনিমাসী?

আমার প্রশ্নে মেনিমাসী গম্ভীর হয়ে গেল।

প্রশ্ন করে নিজেও সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম। ভাবলাম, না জিজ্ঞেস করলেই হত।

সেদিন মেনিমাসী আর কোন কথাই বলল না।

আমার জানার স্পৃহাও স্তিমিত হয়ে গেল।

হিসাব করে দেখলাম আমার বয়স যথেষ্ট হয়েছে। এবার কঠিন কাজের উপযুক্ত হয়েছি। একদিন সকালে মেনিমাসীকে না জানিয়ে সোজা গেলাম গোখেল রোডে।

বেশ ভীড় ছিল সেখানে।

বড় বড় অক্ষরে লেখা তিনটি জিনিস:

ভাল খাবার, ভাল বেতন, ভাল পরিচ্ছদ।

তার সঙ্গে রয়েছে উজ্জ্বল ভবিষ্যত।

লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

দৈহিক অবস্থার পরীক্ষা নিতে পাঠিয়ে দিল ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার দেখেশুনে লিখে দিল ফিট্। সামরিক কাজের আমি উপযুক্ত।

এবার চুক্তিপত্র সই করলেই আমার চাকরি।

ক্যাপটেন জিজ্ঞেস করল, কাউকে জানিয়ে আসতে চাও ?

ইতস্তত করে বললাম, চাই।

তা হলে কাল এস। তোমার কাগজপত্র প্রস্তুত থাকবে। সই করেই রওনা হতে পারবে ট্রেনিং সেণ্টারে। কালকে এই সময় এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে, কেমন ?

বললাম, আচ্ছা।

সোজা বাড়ি এসে মেনিমাসীকে বললাম, চাকরি পেয়েছি মাসী।

কোথায় ?

মিলিটারীতে।

যুদ্ধের চাকরি ! যাসনে নিমু !—আঁতকে উঠল মেনিমাসী।

এটা তো খারাপ কাজ নয়।

তা জানি, মরণ মাথায় নিয়ে কেন যাবি ! দেশেই কাজ পাবি, খেতে পাবি।

মরণ। বলে হাসলাম।

হাসছিস কেন ?

আমার কে আছে মাসী। বাবা নেই, মা নেই। আত্মীয়-স্বজনের পরিচয় নেই। বাড়ি নেই। যাদের কেউ নেই, কিছু নেই তারাই তো যাবে যুদ্ধে। মরণে কাঁদবার লোক নেই, বাঁচলে আশ্রয় দেবার বন্ধু নেই। আমার কিসের দুঃখ বলত মাসী।

মেনিমাসী চুপ করে থেকে ভাবছিল।

আমি আরও কিছু বলতে চেষ্টা করতেই ইসারায় থামতে বলল।

তোর মত আমিও একদিন চিন্তা করেছি, এক সময় ভেবেছি মরণই আমার শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। মরতে পারিনি রে নিমু। এমন সুন্দর পৃথিবীকে ছাড়তে পারিনি। কেমন যেন মায়া। শূন্যতার ওপর

যে মমতা জন্মায় তা কখনও জানতাম না। 'নাই' নিয়ে আছের দিকে এগিয়ে যেতে চেয়েছি।

অবাক হয়ে গেলাম মেনিমাসীর কথা শুনে। নিরক্ষর বস্তির মেয়ে মনে হল না তাকে।

মেনিমাসী বলতে লাগল, ভদ্রঘরের মেয়েদের সরম বড় বেশি। সরমের দায়েই তোর মা অসীম হালদারের হাত ধরে ঘর ছেড়েছে। সরমের দায়েই আমি অনিলের হাত ধরে কলকাতায় এসেছিলাম। আমারই টাকায় অনিলের ব্যবসা। মালিকানা তার সঙ্গে আমারও রয়েছে। অনিলকে ভালবাসতাম। বাবা-মা সহ্য করতে পারেনি অসবর্ণ এই প্রেমকে। পালিয়ে এসেছিলাম সরম ঢাকতে। সরম যখন প্রকট হল তখন মৃত্যু চেয়েছিলাম। মৃত্যুও আসেনি, বেঁচে অমৃতলাভও করতে পারিনি। শুধু আশা নিয়ে এতটা কাল কাটিয়ে আসছি। অনিল আমাকে ঠকায়নি, আমিও অনিলকে বঞ্চনা করিনি, এইটুকুই আত্মপ্রসাদ।

থেমে গেল মেনিমাসী।

সামান্য কথার মাঝ দিয়ে জীবন ইতিহাসের পরপর কয়েকটি অধ্যায় উদ্ঘাটিত করে মেনিমাসী থেমে গেলেও আমি ভেবেছি শুধু মেনিমাসীর কথা। অতি সাধারণ মেয়েদের মত তার কথা নয়। শব্দ সম্ভার অশিক্ষিত নারী মুখের নয়। কেমন বিভ্রান্ত করে দিল মেনিমাসী। তার অতীতকে জানবার যে আগ্রহ ছিল তা আর রইল না আমার মনে।

সেদিন আর আলোচনা করিনি।

পরের দিন সকালবেলায় মেনিমাসী এসে বলল, তুই কি ঠিক করলি নিমু?

সবই তোমার ওপর নির্ভর করছে মাসী।

আমি বলছি নাই বা গেলি যুদ্ধের চাকরিতে। অবশ্য আমার খুব অমতও নেই।

গেলে কি অসুবিধা ?

কিছুই নয়। যাওয়া আর আসা হল পৃথিবীর ধর্ম। সেজন্য চিন্তার কিছু নেই। তুই যেতে পারিস।

তোমার আশীর্বাদ।

বাজারে গিয়ে কিছু ভালমন্দ নিয়ে আয়। এরপর কবে তোকে রেঁধে খাওয়াতে পারব তাতো জানিনা। আজ তোকে মনের মত করে রেঁধে খাওয়াব।

দুপুর বেলায় রওনা হবার আগে মেনিমাসীকে বললাম, আমার নিকট আত্মীয় কে ?

মানে ?

নিকট আত্মীয়—নেক্স্ট্ কিনের নাম দিতে হয়। তোমার নাম দেব।

আমার পরিচয় দিয়ে কি হবে। তার চেয়ে, তার চেয়ে তোর সেই বড়দিদির নাম দিস।

বড়দিদি ! মানে মেনকাদিদি। তার ঠিকানা জানি না।

লাহাবাড়িতে গিয়ে জেনে নিস।

তখুনি গেলাম লাহাবাড়িতে।

কর্তাবাবু চলতে ফিরতে ভাল পারে না। বৈঠকখানায় বসে কাগজপত্র দেখে আজকাল। সম্পত্তির দায়িত্ব নিয়েছে বড় খোকা। আমি কর্তাবাবুর সামনে গিয়ে প্রণাম করতেই জিজ্ঞেস করল, কে ?

আমি নিমু, নির্মল।

কি খবর। টাকা পয়সার দরকার বুঝি।

আজ্ঞে না। বড়দিদির ঠিকানা জানতে এসেছি।

মেনির ঠিকানা। সে তো নোয়াখালিতে আছে। এখন অপূর্ব সবজজ হয়েছে। তোর কি খবর ?

চাকরি পেয়েছি।

কোথায় ?

মিলিটারীতে।

মিলিটারীতে। কেন! কেন! দেশে কি চাকরি নেই আর?

থাকলেও পাচ্ছি না। বিদ্যাবুদ্ধি তো নেই। এর চেয়ে সুবিধা কোথায় পাব!

তা পাবিনা ঠিক কিন্তু মৃত্যু যে নিশ্চিত।

বললাম, মরতে তো হবেই একদিন।

তবুও মানুষ বাঁচতে চায় রে, তবুও মানুষ বাঁচতে চায়। ভালভাবে বাঁচতে চায়।

আমি আর কোন উত্তর না দিয়ে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

সবাই বলছে মরতে হবে।

মরতে তো হবেই।

জীবনের সর্বপ্রথম যে প্রয়োজন আহার্য, তার সমস্যা সমাধানের এই তো পথ। পেটের খিদে মেটাতে পারিনি নিশ্চিন্তে কোনদিন। আজ সুযোগ পেয়েছি বিনা ক্লেশে দুমুঠো খাবার। এ সুযোগ ছাড়তে পারব না। মৃত্যুর দিন নিজের কাছে জবাবদিহী করতে পারব, মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন মেটাতেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছি।

বিকেলবেলায় মেনিমাসীর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

কয়েকটি ধান আর দুর্বা সংগ্রহ করে রেখেছিল মেনিমাসী। আমার মাথায় ধান দুর্বা দিয়ে বলল, তোকে ফিরে পেতে চাই নিমু।

হেসে বললাম, যুদ্ধে সবাই তো মরে না মাসী। সবাই মরলে যুদ্ধ করবে কে। আমি আবার ফিরে আসব, আবার তোমার হাতের রান্না খেয়ে নিজেকে ধন্য করব। তোমার কোলে মাথা দিয়ে ঘুমোব।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছল মেনিমাসী।

আমিও রুমাল দিয়ে চোখ মুছে ধীরে ধীরে নয়নতারার গলি পেরিয়ে রাস্তা ধরলাম।

সারাটা পথ ভাবতে ভাবতে এসেছি। মেনিমাসীকে এতদিন পরে ঠিক যেন বুঝতে পারলাম। বুভুক্ষু জননীর ছবি তার সর্বাঙ্গে। তার স্নেহকণা বর্ষণ করেছে আমার ওপর তার অতৃপ্ত মাতৃত্ববোধ শান্ত করতে। ভাবতে ভাবতে কখন যে গোখেল রোডে পৌঁছে গেছি তা টেরও পাইনি। নয়নতারার গলিতে রয়ে গেল একটি সন্তানকামী মা, আর হাওড়ার পথ ধরল মাতৃস্নেহবঞ্চিত একটি সন্তান।

দুই

স্থলবাহিনীতে নাম লিখিয়ে রেলের ওয়ারেন্ট নিয়ে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলাম সন্ধ্যার আগেই।

সঙ্গীর অভাব নেই। আমার মত আরও সতেরজন ওয়ারেন্ট পকেটে করে বোম্বে মেলের প্রতীক্ষা করছিল জব্বলপুর যেতে। সবাই বাঙ্গলার ছেলে।

বাঙ্গলার ছেলে হলেও হাওড়া ষ্টেশনে ওদের সবাইকে তত অন্তরঙ্গ ভাবতে পারিনি যতটা ভাবতে শিখলাম বাঙ্গলার সীমানা পেরিয়ে।

সামরিক বাহিনীর জন্য বিশেষ চিহ্নিত গাড়িতে উঠে বসলাম সবাই।

বিদায় জানাতে অনেকের আত্মীয়স্বজন এসেছে। শুধু তিনজনের কেউ আসেনি। তার মধ্যে আমি একজন। গাড়ি ছাড়তেই পরিচয় ঘনিষ্ঠ করে তোলার চেষ্টা করছিলাম সবাই।

আপনার বাড়ি কোথায় মশায় ?

বললাম, জানি না। কলকাতায় বড় হয়েছি, কলকাতায় বাড়ি বলেই জানি। আপনার বাড়ি ?

বরিশাল।

আপনাকে বিদায় জানাতে কেউ তো এল না দেখলাম।

আছে কি কেউ ! বিধবা মা আছে দেশে। ছোট ছোট দুটো ভাই না খেতে পেয়ে মরেই বুঝি গেছে। কে আসবে দেখা করতে। একটা মাস যদি ওরা বাঁচে তা হলে মাইনে পেয়ে টাকা পাঠাব। বেঁচে যাবে ওরা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জগন্নাথ সরকার।

আর্মি সার্ভিস কোরে যোগ দেবার ট্রেনিং নিতে চলেছে জগন্নাথ। অনাহারের হাত থেকে মুক্তি পেতে মিলিটারীতে চাকরি নিতে বাধ্য হয়েছে।

বললাম, দেশে কি আর কোন চাকরি ছিল না?

থাকতে পারে। পাইনি তো একটাও। বিদ্যাবুদ্ধি তো পাঠশালা অবধি। কে কাজ দেবে বলুন! হতাশভাবে কথা শেষ করে জগন্নাথ বলল, আমরা যুদ্ধ করব! কপাল। জার্মান মেরে ইংরেজকে জিতিয়ে দেব। হায়রে! এর চেয়ে একপাল ভেড়াকে যুদ্ধে পাঠালে বেশি কাজ হত।

জগন্নাথের বলার ভঙ্গী শুনে হেসে ফেললাম।

বাংকে শুয়েছিল জলদবরণ নিয়োগী।

ম্যাট্রিক পাশ করেছে। সোজা হাবিলদার ক্লার্ক তার য়্যাপয়েন্টমেণ্ট। বাংক থেকেই বলল, কলম পিষে জার্মান-জাপানকে তাড়াব আমরা। আপনি কিসে?

বললাম, আর্টিলারি।

বাপরে। সব যে বন্দুক কামানের কথা। ওসব সহ্য হবে না। আমাকে ভি-সি-ও দিতে চেয়েছিল। বলল, য়্যাকৃটিভ সার্ভিসে যেতে হবে। বললাম, সাহেব, ভেতো বাঙ্গালীর বন্দুক কামান সহ্য হবে না, তার চেয়ে কলম তুলে দাও হাতে। দেখবে মসীযুদ্ধে জাপানকে কাত করে দেব লহমায়।

জলদবরণের কথায় গাড়িশুদ্ধ সবাই হো-হো করে হেসে উঠল।

পূর্ণ দাস ইলেকৃট্রিক্যাল আর মেকানিক্যাল বিভাগের রংরুট। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, হেসে নাও বাচ্চু। এরপর আর হাসার সময় পাবে না। শুধু ফটাস্-ফুটুস। জান হাতে নিয়ে ছুটতে হবে। তারপর কোথাও শকুনে খাবে, কোথাও শেয়াল কুকুরে। হেসে নাও।

জগন্নাথ বলল, ফুটুস-ফাটুস শুনেই কাত। ছুটতে আর হবে না। শুনেছেন, শকুনের জন্য টেণ্ডার চেয়েছে সরকার! বর্মার যুদ্ধে এত

বেশি মরেছে যে মরা ফেলার লোকেরই অভাব ঘটেছে। তাই শকুন ইনডেণ্ট করছে।

মিলিটারীতে না এসে শকুনের কনট্রাক্ট্ নিলেই ভাল করতাম, বলেই পূর্ণ দাস দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আবার হাসির রোল উঠল।

আমি চুপ করে শুনছিলাম।

ওদের কথা শেষ হতেই বললাম, আর্টিলারির আর কজন আছেন?

কেউ নেই! আপনি একা! আপনার এ দুর্মতি কেন হল? সামনাসামনি লড়াই করার বুঝি খুব শখ। এবার শক্ খেয়ে ঘুরে মরুন।

আমি হেসে বললাম, মরার হাত থেকে বাঁচতেই তো সবাই এসেছি।

মানে?

মানে দেশে খাবার নেই। পরিবার পরিজন মৃত্যুর দ্বারে। তাদের বাঁচাতে চাকরি নিতে হয়েছে। দেশপ্রেম দেখাতে কেউ আসেনি। পেটভরে খেতে পাব এই ভরসায় মরণ জেনেও মিলিটারীতে নাম লিখিয়েছি।

পেটের দায়! ঠিকই বলেছেন, ইয়ে আপনার নামটাই জানতে পারিনি।

আমার নাম নির্মল রায়।

ঠিকই বলেছেন নির্মল বাবু। শালা ইংরেজ জিতলেই বা কি আর মরলেই বা কি। আমরা চাই দানাপানি। সেইটে পেলেই মরতে রাজি। বন্দুক থেকে একটাও গুলী বের হবে কিনা তাও জানি না। হয়ত হাত তুলেই দাঁড়াব সাদা রুমাল দেখিয়ে। নয় কি!

এই গুরুতর কথায় কেউ সায় দিল না। শুধু মাথা নাড়ল দুজন।

জগন্নাথ বলল, যুদ্ধবিদ্যা শেখার আগে অনেক কিছুই শিখে নিলাম। এবার বলুন কোথায় গিয়ে আজ রাতের দানাপানি সংগ্রহ করবেন।

পূর্ণ দাস বলল, আসানসোলে।

পেট ভর্তি হতেই মেজাজ গেল বদলে। এতক্ষণ পরিচয় পর্ব ছিল ভদ্রতার মুখোস চাপা, এবার মুখোস গেল খুলে, পরস্পরের অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করছিল সবাই, আমিও।

আমিও হঠাৎ প্রমোশন পেয়েছি। এতদিন ছিলাম গৃহভৃত্য নিমু, ছোকরা চাকর নিমে। হঠাৎ আমিও হয়েছি নির্মলবাবু! কিন্তু বাল্যাবধিই চাকরের কাজ করতে করতে এমনই হীনমন্যতা জন্মেছে যে, 'বাবু' পদবী পেয়েও নিজেকে সহজ সরল করতে পারছিলাম না। যাবা হৈ হুল্লোড় করে আত্মজনের মত নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছে তাদের অতীত ছিল, বর্তমান আছে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তারা নিঃসন্দেহ। আমার অতীত যেমন তমসাবৃত, বর্তমান তেমনি ম্রিয়মাণ, ভবিষ্যৎ কুজ্ঝটিকার আবরণে। ওরা মায়ের বুকের দুধ খেয়েছে, মায়ের কোলে বড় হয়েছে, মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে জীবন্ত প্রত্যাবর্তনের আশা মনে পোষণ করে শুধুমাত্র অন্নের সংস্থান করতে এসেছে। সবাই বাল্যে কৈশোরে গেছে বিদ্যালয়ে, সমবয়সী-দের সঙ্গে খেলা করেছে, শিশু-কিশোর মনের আদানপ্রদান ঘটিয়েছে সমপাঠীদের সঙ্গে। জাগ্রত যৌবনে ওদের চিন্তা করতে হয়নি আহার্যের, ওরা চিন্তা করেছে পরিবারের কষ্ট লাঘব করার পন্থা। কিন্তু আমার কি আছে! মায়ের স্নেহ যে কি বস্তু তা জানি না, পাতানো মাসীর আশীর্বাদ আমার সঞ্চয়, জীবন্ত প্রত্যাবর্তনের চিন্তা বা আশা আমার ক্ষেত্রে অবান্তর। অন্ন ও মৃত্যু দুটিই আমার জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিদ্যালয় দেখার সৌভাগ্য ঘটেনি, সমবয়সীরা ছিল আমার প্রভু, সমপাঠীদের সঙ্গে মনোভাব আদানপ্রদান অকল্পনীয়। জাগ্রত যৌবনে আমার সম্বল ছিল প্রবল ক্ষুধা আর বাঁচার জন্য অকুণ্ঠ পরিশ্রম।

ওদের কলকোলাহলে আমি স্তিমিতপ্রায়। সাগ্রহে যোগ দিতে পারছিলাম না সে অন্তরঙ্গতায়। নীরবে শুনছিলাম ওদের কথা।

আসানসোল থেকে গাড়ি ছাড়তেই 'আপনি' শব্দটি ধীরে ধীরে তুমি'তে পরিণত হল। এতক্ষণ যে জড়তা ছিল ভদ্রতার আবরণে তা নিমেষেই কেটে গেল। সবাই ধীরে ধীরে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল।

সবচেয়ে মুখর হল জলদবরণ। হঠাৎ বলে উঠল, প্রেম মানে যুদ্ধ।

পূর্ণ দাস বাধা দিয়ে বলল, বুঝলাম না বন্ধু।

যদি প্রেম না থাকত তা হলে যুদ্ধে আসা হত না।

তুমি ব্যর্থ প্রেমিক, বলল জগন্নাথ।

বারীন বসু ড্রাইভার। সার্ভিস কোরে যোগ দিয়েছে। চেহারাটা কাটখোট্টা। শ্রীহট্টের মানুষ, কলকাতায় কেটেছে এতকাল। গলার শব্দ শুনে বাসস্থান স্থির করল পূর্ণ দাস। জলদবরণের কথা শুনে মুচকি হেসে বলল, ভাষ্য চাই!

ভাষ্য! সে আবার কি! প্রশ্ন করল জগন্নাথ।

প্রেম! যুদ্ধ! কেন? কোথায়? কবে? কার সঙ্গে?—বলল বারীন।

নিশ্চয় নিশ্চয়, বলে উঠল অনেকেই।

ভাষ্য চাই! বাবা জলদবরণ, জলদান কর আমাদের পিপাসু মনে। জানবার আগ্রহে আমাদের গলা শুকিয়ে গেছে। বলেই পূর্ণ দাস উঠে দাঁড়াল।

জলদবরণ খুশী মনে বলল, ভাষ্য অবশ্যই দেব। শোন, ছোট্ট খুকী। বড় হল। নাম মিলনকুমারী।

বাধা দিল জগন্নাথ, বলল, বড় সেকেলে নাম। মিলন হয়েছে কি? হয়নি! তা হলে মিলনকুমারী নাম অচল, অনাবশ্যক। নাম বদলাও, শীগ্‌গীর বদলাও।

নাম বদল অত সহজ কি। গায়ে গেঁথে আছে নাম।

তা থাকুক। প্রেম হল ছুঁয়ো দ্রব্য তাই গাঁথুনি থেকে নাম খসিয়ে নতুন নেমপ্লেট বসাও।

জলদ হেসে বলল, বেশ তাই হবে। কি নাম দেব তোমরাই বল।

সবিতা।

উঁহুঁ।

শ্যামলী।

উঁহুঁ।

তা হলে, বেশ নামের দরকার নেই, নাম হল সেই মেয়েটা।

বেশ বলেছিস। নামের দরকার নেই। সেই মেয়েটা বললে বেশ রোমান্স রোমান্স ভাব থাকবে। এবার বল তোর গল্প।

গল্প আরম্ভ হয়েছিল, শেষও হয়েছিল নিশ্চয়। আমার কানে পৌঁছায়নি। মেঝেতে চাদর পেতে শুয়ে পড়েছিলাম, কখন ঘুমিয়ে গেছি জানি না। ঘুম ভাঙ্গল খুব ভোরে। তখন আর সবাইও ঘুমিয়ে। আমি বসলাম জানালার ধারে।

রেলগাড়ি চড়া এই প্রথম।

তাও এই দূরপাল্লার গাড়িতে। গাড়ি ছুটছে তুরন্ত বেগে। খুবই মনোরম মনে হচ্ছিল। শোন নদী পেরিয়ে গাড়ি এসে দাঁড়াল ডেহরি অন শোন্ ষ্টেশনে।

বারীন মুখ উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, কোন ষ্টেশন?

বললাম, ডেহরি অন শোন্।

অনেক দূর এসে গেছি। তবে আরও বার চোদ্দ ঘণ্টা। চা-টা আছেরে? এই ওঠ তোরা। চা খাবি না? শীগ্গীর ওঠ।

অনেকে উঠল, অনেকে গা মোড়া দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে রইল।

আমারই বয়েসী একটি উঠতি বয়সের জোয়ান ছেলে আমার পাশে এসে বসল। মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল, কি দেখছেন নির্মলবাবু?

বললাম, কি যে দেখছি তা তো জানি না। দেখতে হয় দেখছি। সময় কাটছে।

চুপ করে রইল সে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার বাড়ি কোথায় ?

যশোরে। পালিয়ে এসেছি বাড়ি থেকে।

কেন ?

পড়তে ভাল লাগে না। বাবা-মা শুনবে না। জোর করে পড়াবে। কোন উপায় ছিল না। পালিয়ে এলাম। এলেই তো হল না। হাতের পয়সা ফুরিয়ে গেল। ফুটপাতে ঘুরে বেড়ালে তো পেট ভরে না। তাই শেষ অবধি মিলিটারীতে যোগ দিলাম।

হেসে বললাম, যাদের অন্ন-বস্ত্রের অভাব, তারাই তো এসেছে মিলিটারীতে।

সত্যিই তাই। কারও পেছনে কিছু রোমান্স রয়েছে, হয়ত দুঃখ বেদনাও আছে কিন্তু সবাই মরতে এসেছে বাঁচার আশায়। সত্যিকার যুদ্ধ করতে কে এসেছে বলুন! কে আমাদের শত্রু! ইংরেজ হল বড় শত্রু। তাদের হয়েই লড়াই করতে চলেছি। কেন ? অন্নের অভাব।

বললাম, সত্যি বলেছেন। আমাদের মরতে যাবার পেছনে কোন উদ্দেশ্যই নেই। আছে শুধু পেটভরে দুটো খেতে পাওয়ার চেষ্টা।

আপনিও তাই বলছেন ?

সবাই তাই বলবে। যুদ্ধ কোথায় হচ্ছে জানি না। কামানের গোলার সামনে ঘাসের মত টুকরো টুকরো হতে হবে। আইন শৃঙ্খলা মানতে হবে। পেছন ফেরা নিষেধ।

এখন ভাবছি নাম না লেখালেই ভাল হত।

বললাম, ভালমন্দ বিচার করে লাভ নেই। ভাগ্যকে মেনে নিয়েছি। তারই আদেশ মেনে চলছি।

আরও কিছু আলোচনা হয়ত করতাম। কিন্তু ইতিমধ্যে সবাই উঠে বসেছে আবার। আবার আরম্ভ হয়েছে কোলাহল। আবার কাল রাতের মত গুরুতর আলোচনা, তর্কবিতর্ক। আমাদের কথা

চাপা পড়ে গেল ওদের আলোচনায়। আমরাও উৎসুক হলাম ওদের কথা শুনতে। আমি ওদের আলোচনায় যোগ দিতে পারিনি। সে যোগ্যতাও আমার ছিল না বোধ হয়।

চিরকাল হুকুম শোনার অভ্যাস। আজ্ঞে হুজুর বলা স্বভাব। আজ হঠাৎ বাবু সেজে কেমন বিব্রতবোধ করছিলাম। ওদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে মিশতে পারছিলাম না।

আমার পাশে যশোরের সেই জোয়ান ছেলেটা বসেছিল। সেও বিশেষ আগ্রহ দেখাল না ওদের আলোচনায়। আমি ফিস্ ফিস্ করে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, কিছু খেয়েছেন ?

চা আর বিস্কুট।

আপনি খেয়েছেন ?

না। ক্ষিধে পায়নি।

কাল থেকে এক সঙ্গে বাস করছি। পরিচয়ও কম হল না কিন্তু আপনার নাম জানিনা। কি বলে ডাকব আপনাকে ?

আমার নাম নিমাইচরণ ব্রহ্ম। কি বলে ডাকবেন তা আপনিই ঠিক করবেন। দেখুন দেখুন, কেমন এক ঝাঁক বক উড়ছে। আজ আবার আকাশ মেঘলা। বৃষ্টি হবে বোধ হয়।

কথার খেই হারিয়ে ফেলল নিমাইচরণ। উদাসভাবে চেয়ে রইল আকাশের দিকে। তার উদাসীনতার কারণ যে কত গভীর তা জানতে পেরেছিলাম বর্মায় গিয়ে।

জব্বলপুর ট্রেনিং সেন্টারে গিয়ে সতেরজন একত্র থাকবার সুযোগ আর পাইনি। কোথাও দুজন, কোথাও পাঁচজন, কোথাও একজন এইভাবে বিচ্ছিন্ন হলাম।

নিমাইচরণ সিগন্যাল কোরের লোক। তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি ভারতের মাটিতে। শেষ দেখা হয়েছিল বর্মায়। বলতে গেলে ভুলেই গিয়েছিলাম তাকে।

জব্বলপুর থাকার সময় আমাদের ট্রেনিং বলতে এমন কিছু হয়নি।

সকালবেলায় নিয়মিত ব্যায়াম করে শরীরকে সবল করতে হত। তারপরই বিশ্রাম। ভোজনটা মোটামুটি পেটভর্তি পেতাম। বিকেল-বেলায় ঘুরে বেড়ানো। সপ্তাহে একদিন অস্ত্র চালনা শিক্ষা, আর প্রত্যহই ছিল ড্রিল। মাঝে মাঝে মক্ ফাইটিং-ও ছিল।

আমি গোলন্দাজ।

গোলা চালনা শিক্ষার চেয়ে বেশি শিখতে হত ডিসিপ্লিন।

ছজন নানাভাবে দাঁড়িয়ে কিভাবে গোলা সরবরাহ করতে হয়। কিভাবে গোলা কামানে ভর্তি করতে হয়। কত ডিগ্রি মেপে গোলা ছুঁড়লে শত্রুর শিবির বা অবস্থান ধ্বংস করতে পারে, তাও শেখান হত। রাইফেল চালনা, মেসিনগান চালনা শেষ করে তবেই কামানে হাত দিতে পেলাম। তবে গুলী ব্যবহার করা হত খুব কম ক্ষেত্রেই।

জব্বলপুরে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করতে না করতেই পাঠিয়ে দিল কোয়েটাতে।

কোয়েটা এসে কাজ ছিল না মোটেই।

বসে বসে গল্প করে আর গুলতানী করে দিন কাটত। অবশ্যই মাঝে মাঝে পারমিট নিয়ে শহরে যেতে পেতাম। সবাই দল বেঁধে বের হত। তার মধ্যে বেশির ভাগই ছিল অবাঙ্গালী। বাঙ্গালীর সংখ্যা নগণ্য। কে যে বাঙ্গালী আর কে যে অবাঙ্গালী তা চিনে ওঠাও দায়। সবাই কথা বলতাম হিন্দিতে, সেও অসুদ্ধ হিন্দি। বলতে গেলে সেটা কোন ভাষাই নয়। ঐভাবে কাজ চালিয়ে নিতে হত।

সোলেমান পাঞ্জাবী মুসলমান। রোহটক জেলার লোক। তার আগিলা মুরুব্বীরা ইংরেজের ফৌজে কাজ করেছে, ইনাম পেয়েছে। সোলেমান তাদের ঐতিহ্য রক্ষা করতে এসেছে মিলিটারীতে। বেশ শক্ত সমর্থ জোয়ান।

একদিন হাসতে হাসতে বলল, রোহটকে আর টাঙ্গা পাওয়া যায় না নির্মল।

বললাম, কেন ?

সব টাঙ্গাওলা ফৌজে এসে গেছে। এবার ঘোড়াগুলো আসবে। আর কাঠের টাঙ্গাগুলো দিয়ে ফৌজী ছাউনি হবে।

তামাসা বুঝতে দেরী হল না। বললাম, কেন, তোমার দেশে আর জোয়ান ছেলে নেই কি?

নেই বললেই হয়। তবে তোমাদের দেশে যেমন লোকে না খেয়ে মরতে পারে আমরা তা পারি না। আমাদের মতলব হল, ভর্তি পেটে মরতে হবে। ইনশাল্লা! লড়াই যদি ফতে করতে পারি তা হলে নয়া টাঙ্গার পয়সা আদায় করে তবেই বাড়ি ফিরব।

হাসতে লাগল সোলেমান।

বললাম, তোমার কি ঘরে কেউ নেই?

সব আছে। নাই শুধু বিবি।

সোলেমানও গোলন্দাজ। আমার গ্রুপের। তার কথায় থাকত হাল্‌কা তামাসা, কিন্তু মনটা ছিল বেশ পরিষ্কার। দিল ছিল খোলা। কথা শেষ করেই হাসতে পারত খুব জোরে।

গ্রুপের অপর সঙ্গী হল গুরনাম সিং। বল্মিক সম্প্রদায়ের শিখ। আমাদের ভাষায় ওরা হল শিখদের মধ্যে হরিজন। মিলিটারীতে এসে জাতে উঠেছে। যারা তার জাতের পরিচয় জানত তারা ওর সঙ্গে বসে খেতে অস্বীকার করত। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে।

গুরনামকে দেখলেই সোলেমান বলত, সরে যাও নির্মল। ওর মাথায় সোলেমান।

ওর মাথায় তুমি কেন চড়বে?

সোলেমান বুঝলে না, সোলেমান মানে পর্বত। গোটা পাহাড়টা মাথায় করে আসছে। শালা দুশমনের গোলায় মরবে না। ওর মাথা থেকে পাহাড়ের চূড়াটা উড়ে যাবে। বহাল তবিয়তে ফিরবে বিবির কাছে।

গুরনাম কাছে আসলেই সোলেমান হাত জোড় করে বলত, স্বশ্রিকাশ্রী সর্দারজি।

দাড়ি গোঁফের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গুরনামের সাদা দাঁতগুলো দেখা যেত। হেসে বলত, বাদশাহ আলমগীরের সংবাদ শুভ তো?

আগে ছিল না, তোমাকে দেখে অবধি অশুভ ঘাড় থেকে নেমে গেছে। জান নির্মল, আমাদের এই গুরনাম সিং একবার কলকাতা গিয়েছিল।—সোলেমান বলত বেশ গম্ভীরভাবে।

গুরনাম বেশ জোরের সঙ্গে বলত, নেহি নেহি, কব্ভি নেহি।

আচ্ছা। গোপন করছ কেন সরদার। তোমার বিবির কাছে শুনেছি, তুমি বাড়িভাড়া করে তিনমাস সেখানে ছিলে।

বিলকুল ঝুট্।

বেশ। চল তোমার বিবির কাছে।

বিবি!

ও তুমি বুঝবে না নির্মল। আজ পারমিট চাই। চল কাপ্তান সাহেবের কাছে। আজই গুরনামের বিবির কাছে নিয়ে যাব তোমাকে।

গুরনাম খুশী মনে বলল, পারমিট কি পাবে ভাইয়া?

কেমন করে বলব। কাপ্তান সাহেবের দয়া। চেষ্টা করব।

সত্যিই কেমন উত্তেজনা বোধ করছিলাম গুরনামের বিবি দেখতে। কোয়েটা শহরে এতগুলো অবিবাহিত লোকের মাঝে একজনের যদি বিবি থাকে সে কি কম সৌভাগ্যের কথা! আমি উৎসাহিত হলাম, বললাম, পারমিট নেবার দায়িত্ব আমার। তিন-জনের তো?

না, চারজনের। সাংলেকে নিতে হবে, বলল সোলেমান।

গুরনাম বলল, ঐ মারাঠী হারমাদকে নিতে হবে না। ও বেরসিক।

সোলেমান বলল, ও তোমার ভাগীদার বুঝি!

না-হে, না। ও অশান্তি সৃষ্টি করে। অন্য কাউকে নিতে পার।

বহু লোক জানাজানি করা ভাল নয় সরদার। আবার বেশি লোক না গেলে তোমার শাশুড়ির চোট সামলাতে পারব না, শালারাও সহজে নিষ্কৃতি দেবে না।

কেমন যেন রহস্য রয়ে গেছে ওদের কথায়। ভাবলাম দেখাই যাক না, ওরা কোথায় যায়!

তদ্বির করে পারমিট পেলাম রাত নটা অবধি বাইরে থাকার।

বিকেল হতেই চারজন বের হলাম।

গুরনাম চোস্ত করে দাড়ি আঁচড়েছে, চোখে দিয়েছে সুর্মা, হাতে মেহেদি। যেন বরের সাজ। সোলেমান ফিস ফিস করে বলল, দেখছ সরদারের সাজ। দাঁড়াও ওকে চটিয়ে দিচ্ছি।

মুখ ফিরিয়ে সোলেমান বলল, সাধে কি তোমার বিবি বলেছে সরদার একটা বেওকুফ।

সরদার চটে গিয়ে বলল, মানে?

মানে। তুমি কলকাতায় বাসাভাড়া করেও রান্নাঘর পাওনি।

বিলকুল ঝুট।

সরদার, আমাকে চটিও না বলছি, তা হলে হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেব। এতদিন কাউকে বলিনি যে তুমি পায়খানাকে রসুইখানা মনে করে সেখানেই রসুই করতে বলেছিলে তোমার বিবিকে।

গুরনাম ক্রুদ্ধভাবে বলে, সব মিথ্যা।

বেশ। আজই মোকাবিলা হবে।

চলতে লাগলাম চারজন। ক্যাম্প পেরিয়ে শহরের রাস্তা ধরলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন নেমে এসেছে। শহর কোয়েটা তখন জমজমাট।

পাহাড়ের কোলে সুন্দর এই শহরটি সাজিয়ে রাখতে কোন ত্রুটি করেনি ইংরাজ সরকার। রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন, দোকানপাট ইউরোপীয় কায়দায় সজ্জিত। ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই পাঞ্জাবী হিন্দু আর শিখ, সাধারণ অধিবাসীর সবাই বেলুচ মুসলমান। উভয়েই দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে সমান।

সুন্দর শহরের আনাচে-কানাচে পাতালের অন্ধকারও রয়েছে। সেখানেই বেশি আনাগোনা উর্দীপড়া মিলিটারীদের। প্রথম যৌবনের নারীসঙ্গ লিপ্সা তাদের টেনে নিয়ে যায় ঐসব অন্ধকার পল্লীতে। কথাটা আগেই শুনেছিলাম অনেকের মুখে। কিন্তু কোন-দিন সাহস করে ও পথে পা দিতে পারিনি।

আজ গুরনাম সিং-এর সঙ্গে সেই রকম এক অন্ধকার পল্লীতে এসে মনে মনে শঙ্কিত হলাম।

বললাম, কোথায় তোমার বিবির ঘর ?

এদের মধ্যে যে কোন একটা। হেসে উত্তর দিল গুরুনাম।

সোলেমান আমায় পিঠ চাপড়ে বলল, ডর্‌তা কেঁউ।

বললাম, খুব ভাল জায়গা মনে হচ্ছে না সোলেমান ভাই।

দাঁড়িয়ে আমার হাত চেপে ধরল সোলেমান। হেসে বলল, কিস্‌ লিয়ে মিলিটারীমে আয়া তুম ? এক্‌ গোলিকা জান, জিন্দগী বরবাদ হোনে নেহি দেনা।

পেট দেখিয়ে বললাম, ভুখ্‌।

সোলেমান হো-হো করে হেসে বলল, খেতে পেলে বেঁচে যাবে। নয় কি ? আমি তো মনে করি বাঁচলেই প্রয়োজন বাড়ে। প্রয়োজন শুধু পেটের নয়, আরও অনেক কিছুর।

বাড়ালে বাড়ে।

তুমি বেওকুফ। দেহ থাকলেই যেমন আপনা থেকে খিদের তাড়না সহ্য কর, তেমনিই তাড়না সহ্য করতে হয় না-কি নারীসঙ্গ পাবারও। মেয়েরাও চায় পুরুষের সঙ্গ পেতে। বুঝলে ? এগুলো দেহের প্রয়োজন। এরপর আছে মনের প্রয়োজনও।

বোকার মত আমি তার মুখের দিকে চেয়ে আছি দেখে হাত ধরে টানাত টানতে বলল, চল। এসব নীতিকথা তোমার হজম হবেনা। দেখ ইয়ার, মরতে হবে। কবে তা তুমিও জাননা, আমিও জানিনা। পৃথিবীতে মরণ সম্বন্ধে স্থির বিশ্বাস থাকে ফাঁসীর আসামীর। আমরা

ফাঁসির আসামী নই। দুশমনের গুলীতে মরতে পারি, আবার গাড়ি চাপা পড়েও মরতে পারি। যে কদিন বাঁচব সে কদিন নিশ্চয়ই মরদের মত বাঁচব। কেমন! তাই নয় কি!

উৎসাহিত ভাবে বললাম, নিশ্চয়। মরদের মতই বাঁচতে হবে।

তা হলে এখানে এসে ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন ইয়ার। এই সরদার, দাঁড়াও। পাশের গলি ধর। হাঁ ঐখানে রহিমার ঘরে।

সোলেমানের হাত ধরেই গলির অন্ধকার পথে এগিয়ে চললাম।

মাংলে আর গুরনাম এগিয়ে গিয়েছে অনেকটা। তাদের দেখতে পাচ্ছিলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, ওরা কি অনেক দূর এগিয়ে গেছে?

সোলেমান মাথা নেড়ে বলল, উহুঁ। ওরা স্টেশনে পৌঁছে গেছে।

আমরা যখন পৌঁছলাম তখন গুরনাম আর মাংলে বেশ জমিয়ে বসেছে।

দেহপণ্যের পসারী একজন নয়, তিনজন।

একই ঘরের বাসিন্দা।

ভাল করে দেখছিলাম তাদের। কোথাও কোন রুচি নেই। ছোটবেলায় দেখেছি লাহাবাড়ির শালীনতাপূর্ণ পরিবেশ। কিছুকাল আগে ছিলাম বস্তিতে। সেখানে মাঝে মাঝেই শুনতে পেতাম, কে কার সঙ্গে পালাল, কার ঘরে কবে থেকে নতুন মানুষ এল। কিন্তু তাদের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় ঘটেনি কখনও, আর তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা করার মত ভরসাও পাইনি।

আজ এদের নগ্নরূপ চাক্ষুষ দেখে বিব্রত হয়ে পড়লাম।

সোলেমান হাত ধরে বলল, বস বন্ধু। এরাই আমাদের কষ্টকর জীবনের একমাত্র সুখের ঠিকাদার। এরাই আমাদের সবচেয়ে স্নেহের ও লোভের বস্তু। মরুভূমির ওয়েসিস।

কথা শুনে তিনজন মেয়েই ফিক্ ফিক্ করে হাসল।

একজন জিজ্ঞেস করল, এতদিন আসনি কেন চাঁদ?

পারমিট চাই, নইলে কোর্টমার্শাল।

কুছ্ পিয়োগে ?

না।

মাংলে বলল, কাহে নেহি। লে আও বিবিজান।

দশ টাকার একটা নোট ছুড়ে দিল মাংলে।

গুরনামের চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল। নিজেকে সংযত করার ভঙ্গিতায় বলল, বুঝে সুঝে খেও বাছাধন। মাতলামি দেখলে পনর দিন জেলখানায় কাটাতে হবে।

তুমি বুঝি খাবে না ?

সামান্য। না খেলে জোস্ নষ্ট হবে। বুঝতেই পারছ।

আমি নীরবে বসেছিলাম। নীরবে সবার অলক্ষ্যে উঠেও পড়-লাম। ধীরে ধীরে গলি ধরে সদর রাস্তার দিকে এগোতে থাকি। ওরা তখন সাকী ও সুরা নিয়ে ব্যস্ত। নজর দেবার সময় ছিল না।

শোন !—কে যেন ডাকল।

মুখ ফিরিয়ে দেখলাম।

প্রশ্ন করলাম, আমাকে ডাকছ ?

হাঁ। তুমি চলে এলে কেন ?

রাস্তার ক্ষীণ আলোতে দেখতে পেলাম তার মুখ। বয়সে আমার চেয়ে পনর বিশ বছর বেশি। সালোয়ার কামিজে বেশ সেজেছে। রং বুলিয়েছে মুখে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাব-ছিলাম, এদের বুঝি ঘর নেই, ঘর বোধহয় ওরা চায়ও না।

কি ভাবছ। এস আমার সঙ্গে। ওদের পছন্দ হবে না আমি জানি। আর ব্যারামের ডিপো ওরা সব। ওদের কাছে যেতে নেই। চল আমার সঙ্গে।

অসহায় ভাবে বললাম, কোথায় ?

আমার ঘরে।

কি হবে গিয়ে ? আমি ক্যাম্পে ফিরে যাব এখুনি !

বারে। এসেছ রাণ্ডীখানায় আর ভাবছ চাকরির কথা। খুব মরদ তো তুমি। এস।

না।

কেন ?

পয়সা নেই।

বিশ্বাস করল না মেয়েটা। এগিয়ে এসে পকেটে হাত বুলিয়ে বলল, নোট আছে ?

তাও নেই। মাত্র চার আনা আছে।

চার আনা! চার আনা নিয়ে বেশ্যাপল্লীতে এসেছ বুঝি বিনা পয়সায় মেয়েমানুষ দেখতে! তোমার মত হতভাগাদের আমি টিট্ করতে জানি। চল আমার সঙ্গে।

না। বললাম পয়সা নেই। বেশ্যাপল্লীতে আসব জেনে আসিনি। ওদের সঙ্গে এসেছিলাম, তখন জানতাম না কোথায় যাব। বিনা পয়সায় মেয়েমানুষ দেখতে হলে কোয়েটাতে আসব কেন। কলকাতা শহরে হাজার হাজার মেয়ে দেখেছি রোজ।

থামল সেই মেয়েটা।

অবাক হয়ে আমার মুখের দিখে তাকিয়ে বলল, সাচ্! কিন্তু ওরা তো তোমার মত বলতে পারে না ? ওরা আসে কেন ?

ওরা মনে করে মেয়েরা হল নর্দমা। নর্দমায় ক্লেদ জমে, সেই ক্লেদ পরীক্ষা করতে আসে ওরা।

সাচ্! অবাক হয়ে গেল সে। পাশে এসে হাত ধরে বলল, এস আমার সঙ্গে।

বেশ্যাপল্লীর গলিতে মেয়েটির আমন্ত্রণ আমি মোটেই ভালভাবে গ্রহণ করতে পারলাম না। ভয় হল, উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সৎ নয়। পরিণাম ভয়ঙ্কর হতেও পারে।

বললাম, মাপ কর বাঈ, আমার পয়সা নেই বলেছি। জরুরী কাজে আমাকে ক্যাম্পে ফিরতেই হবে এখুনি।

পয়সা তোমাকে দিতে হবে না। এস।

না, বলে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, কাল দেখা করব।

কাল! শুনে মেয়েটা হাসল। 'কাল' শব্দটির সঙ্গে বোধহয় তার অতীত জড়িত, তাই তার হাসিতে ঝিলিক ছিল না, প্রদীপের ধূমায়িত আলোর রেখার মত লাগল।

ফিরে আর তাকালাম না।

সদর রাস্তায় এসে সোজা ঢুকে পড়লাম চায়ের দোকানে।

দোকানের ঘড়িতে দেখলাম নটা বাজতে বিশ মিনিট বাকী। তখনও সোলেমান, মাংলে আর গুরনাম ফেরেনি। তাদের পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। নটার মধ্যে কাম্পে ফিরতেই হবে। শৃঙ্খলা রক্ষা হল সামরিক জীবনের বড় ধর্ম। চিন্তিত হলাম ওদের জন্যে। শেষে ভাবলাম, দরকার কি! আমি-ই ফিরে যাই।

চায়ের দোকান থেকে উঠে সবে মাত্র রাস্তায় পা দিয়েছি।

টাঙ্গায় তিনমূর্তি।

আমাকে দেখে টাঙ্গা থামিয়ে সোলেমান ডাকল। টেনে তুলল টাঙ্গায়।

সোলেমান প্রথমে কথা বলল, কোথায় পালিয়ে ছিলে ইয়ার। জনানা দেখলেই ভয় লাগে! খুব মরদ তুমি!

বললাম, মেয়েতো মাত্র তিনটে, আমরা হলাম চারজন। তাই চৌথী জনানা খুঁজতে ছিয়েছিলাম।

পাক্কি বাত! ঠিক বলেছ, বলে তারিফ করল গুরনাম।

আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, চারজনের একজনকে চৌথী জনানা খুঁজতেই হত। নইলে উপোস করে ফিরতে হত, তার চেয়ে তুমি ভাল কাজ করেছ। সাধে কি লোকে বলে বাঙ্গালীর দেমাক খুব সাফ্।

অনুমোদন করল সবাই।

আমি চুপ করে ছিলাম ব্যারাকে ফেরা অবধি।

পরের দুপুরে সোলেমান জিজ্ঞেস করল, কাল কি হয়েছিল নির্মল! তুমি ঠিক কথা বলনি নিশ্চয় ?

বললাম, সবটা ঠিক নয়। তবে তোমাদের ঐ দৃশ্য সহ্য করতে পারছিলাম না। অতগুলো মেয়েমানুষ অতোগুলো পুরুষের সামনে ঐভাবে যে থাকতে পারে, তা বিশ্বাস করিনি কখনও। সাক্ষাত দেখে মাথা ঘুরে গেল, তাই পালিয়েছিলাম।

চায়ের দোকানে বসেছিলে।

তাও ঠিক। তার আগে আরেকটা মেয়ের পাল্লায় পড়েছিলাম। অনেক অনুনয়-বিনয় করে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি।

সোলেমান আমার দিকে চেয়ে থেকে বলল, ভালই করেছ।

ভাল যে করেছি তার প্রমাণ সোলেমান স্বয়ং।

বলল একদিন, প্রাইভেট ডাক্তারের কাছে যেতে হবে নির্মল।

কেন ?

খারাপ ব্যারামের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এই দেখ, বলে হাতটা বাড়িয়ে দিল। তার দেহে চাকা চাকা দাগ দেখে বললাম, এটা কি ?

পয়সা দিয়ে রোগ কিনে এনেছি। এটা হল গর্মির লক্ষণ।

কে বলল ?

কাল হাসপাতালে যেতেই কমপাউণ্ডার বলল, এখানে চিকিৎসা করলে তোমাকে কয়েদ করবে। এ রোগ বাইরে থেকে এনেছ, ফৌজী ক্যাম্পে ছড়িয়ে পড়বে। চাকরিও না থাকতে পারে।

বিস্মিতভাবে কমপাউণ্ডারকে বললাম, কোহি রাস্তা বাত-লাইয়ে।

কমপাউণ্ডার বলল, দশ বিশ দেকে বেমার খরিদ কিয়া, কুছ তো ফিকোঁ হিঁয়া।

সোলেমান দুঃখিতভাবে বলল, পাঁচ টাকা দিলাম কপাউণ্ডারকে। সে-ই বলে দিল প্রাইভেট ডাক্তার দেখাতে। চল ভাই নির্মল কোন ডাক্তারের কাছে যাই।

আমি ক্ষুণ্ণভাবে বললাম, চল যাচ্ছি, কিন্তু জীবনকে ভোগ করবার তোমাদের ও পদ্ধতিটা আমার সেদিন ভাল লাগেনি।

সোলেমানের সঙ্গে গোপন ব্যাধির চিকিৎসক ডাক্তার বাজোরার চেম্বারে যেতে হল।

ব্যয় সাপেক্ষ চিকিৎসা।

সোলেমানের অর্থ নেই, বলল, কুছ কর্জা তো দেও ইয়ার। ওয়াপস্ দেঙ্গে তংখা মিলনেকা সাথ সাথ।

গুরনামও রোগ গোপন করতে পারেনি।

মিলিটারী হাসপাতালে সে আশ্রয় পেয়েছে।

হাসপাতাল থেকে ফেরবার আগেই আমাদের বদলীর আদেশ এল, তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারিনি। গুরনামের জায়গায় এল পদ্মনাভন।

ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দু আর ইংরেজি মিশিয়ে পদ্মনাভন আলাপ করত। আমাদের মুভমেণ্ট অর্ডার এল আসামে। পদ্মনাভন জিজ্ঞেস করল, আসাম দেশটা কোথায় বন্ধু ?

মাংলে হাত-পা নেড়ে বুঝিযে দিল, হিমালয় পেরিয়ে চীনা মুলুকের কিনারায় সমুদ্রের ধারে।

পদ্মনাভন অবাক হয়ে কিছুক্ষণ মাংলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, ট্রু।

ঠাট্টা করছি ! আমি দুবার আসাম ঘুরে এসেছি। তবে চমৎকার জায়গা। পাহাড়গুলো কোয়েটার পাহাড়ের মত নয়। কত বড় বড় নদী, কত বড় বড় শহর, কত বড় বড় কেল্লা। উঃ! তুমি সেসব চিন্তাও করতে পারবে না ! আর খাসা মেয়েমানুষ পাবে সেখানে।

পদ্মনাভন বোবার মত তার তেলেগুভাষায় কি সব বলল তার বিন্দুবিসর্গও আমার বোধগম্য হল না। তার মুখ দেখে বুঝলাম আসামের বর্ণনা তার মনঃপূত হয়েছে, অথচ বিশ্বাস করতে পারছে না।

আমাকে রাতের বেলায় ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেস করল, তুমি তো বাঙ্গালী, শুনেছি বাংলা পেরিয়ে আসাম। নিশ্চয় তুমি আসামের বিষয় জান।

হেসে বললাম, আমার জীবনে কখনও কলকাতার বাইরে যাইনি। আসাম তো অনেক দূরের কথা। অত ভেবে কি হবে ভাই। মিলিটারীর চাকরি। যেখানে যেতে বলবে সেখানেই যেতে হবে। প্রস্তুত হও। কাল সন্ধ্যায় স্পেশ্যাল গাড়িতে চাপতে হবে। চল, কাল সকালে কোন ভাল হোটেলে খেয়ে রসনার স্বাদ মিটিয়ে সুখ করে আসব।

পদ্মনাভন তবুও আশ্বস্ত হতে পারল না।

আমিও পাশ ফিরে শুলাম।

পদ্মনাভন বোধহয় জেগেই ছিল।

মাঝরাতে পদ্মনাভনের গলা শুনে উঠে বসলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কি হল, পদ্মনাভন ?

না, কিছু নয়। বুঝলে নির্মল, এভাবে বেড়ালের বাচ্চার মত ঘুরতে ঘুরতে দেশ ছেড়ে যেতে হবে তা ভাবতেও পারিনি। তা জানলে আসতাম না নিশ্চয়ই।

তা হলে কি মনে করে এসেছ ?

আড়কাঠি নিয়ে এসেছিল। তিন বাতেঁ—আচ্ছা খানা, আচ্ছা পিনহা, আচ্ছা তংখা। দেশে জমিজমা নেই। পরের জমিতে মজুর খাটতাম। লোভ সামলাতে পারলাম না। বউ মানা করেছিল।

বউ মানা করল তাও এলে !

বউটা বড্ড কষ্ট পাচ্ছে দেখেই তো এলাম ! দুবেলা পেট ভর্তি খেতে পাবে আশা করেই তো এসেছি ! মাসকাবারে বিশ টাকা তো পাঠাতে পারছি। ছোট্ট একটা মেয়ে নিয়ে দুঃখে কষ্টে চালিয়ে নেবে। কিন্তু পদ্মিনিকে রেখে এসে মন ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে ওদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছি।

মিথ্যে নয়। কিন্তু আর তো সংশোধন করবার উপায় নেই। এখন ভবিতব্য মেনে চলতেই হবে। দুঃখ করনা পদ্মনাভন। আমিও তো চলেছি তোমার মতই ভাগ্যের নির্দেশে।

পদ্মনাভন উঠে বসল।

কোথায় যাচ্ছ ?

না যাচ্ছি না। তোমার কথাই ভাবছি নির্মল। ভাগ্যকে স্বীকার করেই এতদূর এসেছি। প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারব কিনা জানি না !

বলতে বলতে পদ্মনাভনের গাল বেয়ে চোখের জল নামল।

আমি বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখছিলাম তাকে।

রুমালে চোখ মুছে পদ্মনাভন আবার শুয়ে পড়ল।

পরদিন বিকেলে আমরা ছ'জন ব্যারাক থেকে বেরিয়ে আসতেই গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিল অন্যান্য সহকর্মীরা। লরীতে উঠে বসলাম।

গলায় মালা পরিয়ে দেবার অর্থ ফিল্ড সার্ভিস্। পদ্মনাভন তা জানে। এবার সে ঘাবড়ে গেল। তা হলে মৃত্যুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে যেতে হচ্ছে !

পদ্মনাভন কোন কথা না বলে চুপ করে বসে রইল।

আমাদের সঙ্গে জমাদার সুবেদার ও হাবিলদার চলল কয়েকজন !

কোয়েটা ষ্টেশনে এসে দেখি মিলিটারীর মেলা বসেছে। স্পেশ্যাল ট্রেণের কামরা ভর্তি। বিভিন্ন বিভাগের ফৌজী মানুষ চলেছে ফিল্ডসার্ভিসে। আসাম তখন যুদ্ধক্ষেত্র !

খাবার ব্যবস্থা ছিল গাড়িতে।

পট্ বোঝাই খাবার হাতে করে নিজেদের জায়গায় বসতে না বসতে গাড়ি ছেড়ে দিল।

সেদিন ছিল চাঁদনী রাত।

পাহাড়ের গা বেয়ে সর্পিল ভঙ্গীতে রেলপথ নেমে গেছে

পাহাড়ের পর পাহাড় পার হয়ে। কোথাও উঁচুতে উঠেছে, কোথাও নীচুতে নেমেছে রেলপথ। গাড়ি চলেছে তো চলেইছে। থামবার নাম নেই। বড় বড় ষ্টেশনগুলোতে সাধারণ গাড়িগুলো ভীড় করে দাঁড়িয়েছে আমাদের গাড়িকে পথ করে দিতে।

দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন গাড়ি শিকারপুরে। ইনজিন জল নিচ্ছে।

পদ্মনাভন তখনও ঘুমোচ্ছে।

সোলেমান প্লাটফরমে নেমে এক লোটা জল নিয়ে এল। লোটার জলে হাতমুখ ধুয়ে নমাজ পড়তে বসল। আমি তার কার্যাবলী দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ক'দিন আগে এই সোলেমানকে দেখেছি বেশ্যালয়ে জীবনকে ভোগ করবার উদ্দীপনায় উন্মত্ত, আর আজ সেই সোলেমান ঈশ্বরের দ্বারে আবেদন জানাচ্ছে, বোধহয় মৃত্যুর সঙ্গে মোকাবিলা করার আশঙ্কায় দুর্বলতা জেগেছে মনে। তারই দুর্বল চিন্তার প্রকাশ তার আন্তরিক ঈশ্বর-প্রার্থনাতে।

মাংলে আর শেরসিংহ দাঁতন করছিল ট্রেণে বসেই। অপর সঙ্গী নাথুরাম চায়ের আশায় জানালায় উঁকি দিচ্ছিল। নাথুরামকে বললাম, চা আমার জন্যও এক পেয়ালা নিও ভাই।

নাথুরাম মুখ ফিরিয়ে বলল, আসছে না এদিকে। ধরে নিয়ে আসতে হবে।

গাড়ি কতক্ষণ দাঁড়াবে তার ঠিক নেই। নেম না।

নাথুরাম দরজায় দাঁড়িয়ে তখনও চিৎকার করছে, এই চা-ওলা, এই চা-ওলা।

গাড়ি ছাড়বার ওয়ার্নিং পড়ল।

পদ্মনাভনের ঘুম ভাঙ্গল।

কোন ষ্টেশন?

শিকারপুর।

আসাম আর কতদূর ভাই ?

জানি না। সুবেদার সাব জানে। আসাম এলেই ডেকে নামাবে। আবার ঘুমোও পদ্মনাভন।

পদ্মনাভন ভাল হয়ে বসল।

পরের ষ্টেশনে এসে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল।

সকালের জলখাবার দেওয়া হবে। প্রস্তুত হও, হুকুমজারী করল সুবেদার বলবন্তরাম।

নিজেদের পট্ হাতে করে সবাই ছুটলাম কিচেন গাড়ির দিকে।

সকাল তখন সাতটা।

খাওয়া শেষ হতে না হতেই আবার ছুটল গাড়ি।

কদিন পরে গাড়ি এসে দাঁড়াল লখ্নৌ ষ্টেশনে। স্নান হয়নি পুরো তিনটে দিন। শরীর উত্তপ্ত, ঘামের গন্ধে জামাকাপড় ভেপসে উঠেছে। লখ্নৌতে গাড়ী বদল করে ছোট গাড়িতে উঠতে হবে। অনেক সময় ছিল হাতে। তাড়াতাড়ি ষ্টেশনের কলে গেলাম সদলে স্নান করতে।

স্নান করে এসেই মনে পড়ল মেনিমাসীর কথা।

অবেলায় কাজ থেকে ফিরে এসে খেতে চাইলে বলত, চান করে আয় নিমু।

আমার তখন আলস্যে দেহটা ভেঙ্গে আসত। বলতাম, খেতে দাও মাসী। স্নানের জন্য অপেক্ষা করতে পারছি না। পেটের নাড়ী অবধি হজম হবার উপক্রম। আগে খেতে দাও তারপর স্নান।

অসুখ করবে রে বোকা ছেলে। নেয়ে ধুয়ে খেতে হয়। কেই বা শেখাবে। যা চান করে আয়।

মেনিমাসীর তাগাদায় স্নান করতেই হত।

আজ স্নান করবার জন্য আমিই ব্যস্ত। আশ্চর্য !

সামনেই দেখি রেলের ডাক অফিস।

তাড়াতাড়ি দুখানা পোষ্ট কার্ড কিনে আনলাম। মাংলের কাছ থেকে কলম নিয়ে মেনিমাসীকে পত্র দিলাম। আমি যে বেঁচে আছি সেটুকুই তাকে জানিয়ে ক্ষান্ত হলাম। লিখলাম, পরের চিঠিতে সব লিখব। তখুনি ডাকে ফেলে দিলাম পোষ্টকার্ড খানা।

মাংলে আমাকে ডেকে বলল, চিঠি সেন্সার না করিয়ে ডাকে দিলি, যদি কোনদিন ধরা পড়িস তা হলে শাস্তি পাবি।

আমারই ভুল হয়েছে। চিঠিখানা সেন্সর মারফত পাঠানো উচিত ছিল। পরের চিঠিখানা লেখার ইচ্ছা ছিল মেনকাদিদিকে। তখন আর লেখা হল না।

মাংলে বলল, পয়সা দিয়ে পোষ্টকার্ড কেন কিনছিস? সরকারী কাগজে লিখবি। বিনা পয়সায় চিঠি পৌঁছে যাবে। বুঝলি?

ঠিক বলেছিস। ট্রেণে কে দেবে চিঠির কাগজ?

কেন, সিকিউরিটি স্টাফ রয়েছে, তাদের কাছেই পাবি। একশ' বাহাত্তর নম্বর গাড়িতে আছে লেফট্‌ন্যান্ট বাজপেয়ী। তার কাছে যা। আমি তো কাল নিয়ে এসেছি।

মাংলেকে বললাম, তুমিও চল।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার সঙ্গে চলল মাংলে।

সরকারী কাগজে চিঠি লিখলাম মেনকাদিদিকে।

লিখলাম: রাস্তা চলতে চলতে আপনাকে চিঠি লিখছি। পাঁচ সাত বছর আপনার সঙ্গে দেখা নেই। হয়ত ভুলেই গেছেন। আমি যুদ্ধের চাকরি পেয়েছি। কোথায় যাচ্ছি তা জানি না। তবে বিশ্বাস আছে একদিন দেশে ফিরব, সেদিন আপনার সঙ্গে দেখা করব। যদি কোনদিন কোন দুর্ঘটনা ঘটে তা হলে আপনিই জানবেন সবার আগে।

চিঠিখানা ভাঁজ করে সিকিউরিটি অফিসে জমা দিয়ে এলাম।

ছোট লাইনের গাড়ি ছাড়ল শেষ রাতে।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে নিজেদের জায়গায় বিছানা করে শুয়ে পড়েছিলাম। কখন যে গাড়ি ছাড়ল তা টেরও পাইনি।

সকালে ঘুম ভাঙ্গল যখন, তখন অনেক বেলা। গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ছোট স্টেশনে। সকালের জলখাবার দেওয়া শুরু হয়েছে। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম রসুইগাড়িতে।

পদ্মনাভন চুপ করেছিল কয়েকদিন। আজ আবার জিজ্ঞেস করল, ডিমাপুর আর কতদূর ?

অনেকদূর। বলছিল সুবেদার সাব, আরও দুতিন দিন পরে পৌঁছব।

শরীর যে অচল হয়ে যাচ্ছে এই গাড়ির ঝাঁকুনিতে। একটা দিন বিশ্রাম না নিলে অসুখ হবে যে !

আমরা যে নিয়মের দাস ! শরীর আর মন এই দুটো বস্তুর সঙ্গে পরিচয় করবার অবসর কোথায় সাথী। চলতে হবে তাই চলছি। যখন বলবে 'হল্ট', তখন থামব।

পদ্মনাভন নিজের মনেই বলল, আসাম এখনও অনেক দূর ! অনেক দূর ! আশ্চর্য। আমাব গোদাবরী জেলা বুঝি আরও অনেক দূর !

পদ্মনাভনকে আর প্রবোধবাক্য শোনাবার ইচ্ছা হল না। চুপ করে বসে রইলাম।

যেদিন গাড়ি এসে দাঁড়াল ব্রহ্মপুত্রের কিনারায় সেদিন সোলেমান পদ্মনাভনকে ডেকে বলল, তোমাকে বলেছিলাম আসামে বড় বড় নদী। এই দেখ কত বড় নদী। এবার পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে ওঠ জাহাজে। এরপরই চীনদেশ। এরপর সমুদ্র কিনারায় গিয়ে থামতে হবে আবার। পথ তো কম নয় ! আরও তিন চারদিন।

পদ্মনাভন অনেকটা ধাতস্থ হয়েছে কয়েকটা দিনে। সে আর বাদ প্রতিবাদ না করে হাসল। সেদিনটা কাটাতে হল গাছের ঝোপের আড়ালে, তাঁবুতে। রাতের বেলায় ডেকে নিয়ে গেল জাহাজে। চারিদিক তখন অন্ধকার। জাহাজেও আলো নেই।

স্টেশনের আলো নেভানো। নদীর ওপারে স্টেশন যে কতদূর তা এপার থেকে রাতের অন্ধকারে অনুমান করা সম্ভব নয়। জাহাজ বোঝাই হতে অন্ধকারেই যাত্রা শুরু হল। আমরা চুপটি করে বসে রইলাম। সিগারেট বিড়িতে আগুন দেওয়াও নিষেধ।

সেই রাতেই নদী পার হয়ে ট্রেনে উঠতে হল আবার।

সকাল হবার আগে ট্রেন থামল ডিমাপুর রোডে।

আমাদের যাত্রার বিরতি ঘটল।

স্টেশনে নেমেই শুনলাম, জাপানী দুশমনরা পেছু হঠছে। আমাদের কাজ হল শত্রুকে তাড়িয়ে নিয়ে চলা। আমরা প্রস্তুত হলাম মুখোমুখি শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে।

দুদিকে গভীর অরণ্য। মাঝ দিয়ে উবরো খুবরো পথ ক্রমেই পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেছে। সামরিক লরী আর জিপে অগ্রসর হবার আদেশ পেলাম সবাই। দিনের বেলায় পাহাড়ী পথের চেহারা দেখেছি, রাতের বেলায় সেই দুর্গম রাস্তায় চলা স্বুরু হল। সকাল হতে না হতেই পৌছলাম ইমফলে।

শত্রু ইমফল ছেড়ে চলে গেছে।

পরিত্যক্ত শহর ইমফল। আমাদের উপস্থিতিতে ক্রমেই জন-সমাগম হতে থাকে। আমরা বিশ্রাম নেবার আদেশ পেলাম।

বিশ্রাম বলতে যা বুঝায় সে বিশ্রাম নেবার ও দেবার অবসর ছিল না। আমরা কামান উঁচিয়ে শুয়ে বসে সময় কাটাবার অবসর পেলাম।

সুবেদার বলবন্তরাম পরিদর্শনে আসত। ব্যারাকে থাকতে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সুবেদার সাবকে যেভাবে দৌড়াদৌড়ি করতে দেখতাম এখানে সে রকমটা দেখলাম না। বরং আমাদের চলাফেরার ওপর বিধি নিষেধ ক্রমেই শিথিল হয়ে আসছিল যতই আমরা এগিয়ে চলেছিলাম। সুবেদার সাবের মুখেও তখন কালো ছায়া। আমরা ক্রমেই এগিয়ে চলেছি শত্রু এলাকার দিকে।

যুদ্ধের চেহারা বদলে গেছে।

দেশের চেহারাও বদলেছে।

শহর জনশূন্য, উপকণ্ঠের গ্রামাঞ্চলও ফাঁকা। বহুদূরে পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে সাধারণ মানুষ। বড় বড় বাড়িগুলো খা-খা করছে। মিলিটারীর আনাগোনা, সাদাকালোর ভীড়, পাহাড় ঘেরা সুন্দর শহরটা কফিনের শবের মত ফ্যাকাশে।

পিঠে রাইফেল বেঁধে চলাফেরা করতে হয় সব সময়। রাতের বেলায় আলো জ্বলে না কোথাও। শোবার কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই। কখনও ট্রেনচে, কখনও তাঁবুতে।

হুকুম এল, মার্চ অন্।

বর্মার দিকে এগিয়ে চলেছি।

সামনে গোলন্দাজ। গোলন্দাজের সঙ্গে রয়েছে সিগন্যাল কোর।

মাথার ওপর পাহারায় আছে বিমান বহর।

পেছনে আসছে সার্ভিস কোর। তার সঙ্গে রয়েছে যন্ত্র মেরামতের বাহিনী। আর তারও পেছনে ডাক্তার আর রসদ।

আমার দল সবার সামনে।

দল একটা নয়, অনেকগুলো।

সবার ওপরে রয়েছে মেজর সাহেব।

মেজর ফ্লেমিং সব সময় তদারক করছে তার বাহিনী, সঙ্গে রয়েছে ক্যাপটেন বাবনাম। আর ক্যাপটেন ফেন্স। চারজন সেকেণ্ড লেফট্‌ন্যাণ্ট আর সাতজন লেফট্‌ন্যাণ্ট তাদের সঙ্গী।

আমি গোলন্দাজ ফার্স্ট র‍্যাংক।

ডিগ্রি মেপে কামান দাগা আমার কাজ।

রাতের বেলায় সেগুন বনে আশ্রয় নিয়েছি।

শত্রুর সাক্ষাত মেলেনি আজও।

সুবেদার বলবন্তরাম বলে গেছে, দুশমন বিশ মিল্‌সে হ্যায়, য়্যাসা উমেদ হোতা হ্যায়।

বিশ মাইল দূরে শত্রু।

এক ঘণ্টায় শত্রুর সম্মুখীন হতে পারি নিশ্চয়ই, কিন্তু আমাদের গতি অতি ধীরে।

রাত অনেকটা হয়েছে।

সেনট্রি সজাগ। কেউ ঘুমিয়ে কেউ জেগে।

কট্ কট্ শব্দ শোনা গেল। মনে হল অতি নিকট থেকে মেসিনগান দাগছে শত্রু। মাঝে মাঝে বোমার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

সবাই প্রস্তুত।

সামনে যে শত্রু সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গর্জে উঠল আমার কামান, শব্দ লক্ষ্য করে ছুটল মেসিনগান। আগুনের হল্কা ছুটল নল দিয়ে। আমাদের লক্ষ্য বস্তু বলে কিছু নেই, লক্ষ্যভেদ তো দূরের কথা!

কিছুক্ষণ মাত্র।

অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। ক্যাপটেন্ বারনাম ছোটাছুটি করছে। তার লক্ষ্য শত্রুর দিকে। এগিয়ে যাবার আদেশ দিতে পারছে না। বনের অন্ধকার ভয়ঙ্কর। সামনে দশগজ দূরেও চোখ চলছে না। যুদ্ধ চলছে অনুমানে। এগিয়ে গেলে গোটা কোম্পানী নিশ্চিহ্ন হবার আশঙ্কা রয়েছে।

আবার নেমে এল নিস্তব্ধতা।

ঘুম নেই কারও চোখে। সকাল হতে তখনও দেরী।

সোলেমান আর মাংলে কামানের পাশে শুয়ে। তাদের হাতে গোলা। আমি টেবিল ঘোরাচ্ছি। সিগন্যালকোরের সন্‌মুখম্ অফিসারদের আদেশ শোনাচ্ছে। সিকটিফাইভ ডিগ্রি লেফট্, সেভেনটি ডিগ্রি রাইট্। আমি টেবিল ঘোরাচ্ছি, কামানের মুখ ঘুরছে। আমার পাশে দাঁড়িয়ে পদ্মনাভন। একটা গোলা দাগার পর খোলগুলো জড়ো করে তাজা গোলা জোগান দেওয়া তার কাজ। রীতিমত যুদ্ধ করছি আমরা। অথচ কোথায় শত্রু তা জানি না।

[illegible] বলল, শত্রু হটে গেছে। হুঁসিয়ার।

আমরা হুঁসিয়ার। শত্রু অনেকদূর।

বনের মাথায় সকালের আলো দেখা দিতে সবাই হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে থাকে শত্রুর সন্ধানে। আমারা টেনে নিয়ে যাই কামান। বনে পথ নেই, তবুও এগিয়ে যেতে হচ্ছে। ছয়জনই ক্লান্ত হয়ে উঠেছি কামান টানতে টানতে। আগে যারা গেছে তারা খবর পাঠাচ্ছে। তারা জানাচ্ছে শত্রু নেই কোথাও।

ক্যাপটেন বারনাম বলল, আশ্চর্য! কাল রাতে দুশো গজের মধ্যে শত্রু ছিল অথচ আজ তার চিহ্নমাত্র নেই।

চলতে চলতে থামল ক্যাপটেন বারনাম।

দুটো গাছের মাথায় আড়াআড়ি করে টাঙ্গান আছে একটা দড়ি। দড়িতে ঝুলছে কতকগুলো গরুমোষের শুকনো হাড়। হাড়গুলো বাতাসে নড়ছে আর কট্ কট্ শব্দ হচ্ছে বার বার।

ক্যাপটেন বারনাম গাছে উঠতে বলল একজন সেপাইকে।

সেপাই উঠে দড়িতে ঝাঁকুনি দিতেই কাল রাতের মত কট্ কট্ শব্দ শোনা গেল। মনে হল মেসিনগান দাগছে কেউ।

নিঃশ্বাস ফেলে ক্যাপটেন বারনাম বলল, তাই বল! আমাদের ধোকা দিয়েছে মাত্র একজন দুশমন। গাছের তলায় পড়ে আতস-বাজির পোড়া কাগজ।

সবার কাছে স্পষ্ট হল রাতের ঘটনা।

কিন্তু সেই লোকটিই বা গেল কোথায়!

এই দুর্গম বনপথে হায়েনার মত সে নিশ্চয় ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে! রাস্তা তাদের পরিচিত। পরিচিত পথে সে এসেছে, পরিচিত পথেই পালিয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রের এত বড় তামাসা উপভোগ করলাম সকলে, আর সবাই নিজেদের বোকা না ভেবে পারলাম না। আমাদের অত গোলাগুলি সবই নিরর্থক হল। গাছের গায়ে রয়েছে তার বিফল চিহ্ন।

বন পেরিয়ে পাহাড়ী ময়দানে এসে থামতে হল।

কদিন শুকনো রুটি, জমানো দুধ আর আলু সেদ্ধ খেয়ে কেটেছে। এবার কদিন বিশ্রাম। খবর এসেছে শত্রু অনেক দূরে। তাই আরও অগ্রগমনের আগে বিশ্রাম করার আদেশ দিল মেজর সাহেব।

তাঁবুর নগর তৈরী হল ছোট পাহাড়ের খাঁজে।

অফিসাররা আনন্দে মেতে উঠল।

বয়ে চলল সুরার স্রোত।

সেপাইরা বঞ্চিত হল না, তারাও মাপ মত সুরা পেয়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠল। রক্তে উঠল শিহরণ, আমরা আর সে মানুষ নই। ভুলে গেলাম আমাদের অতীত, ভুলে গেলাম ভবিষ্যত। আমরা শুধু বর্তমানকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

যতই এগোতে থাকি ততই গ্রাম উপনগরী চোখে পড়ে। আমরা সতর্কভাবে লোকালয় এড়িয়ে চলছি। দিনের বেলায় গভীর বনে আস্তানা, রাতের বেলায় মাইলের পর মাইল রুটমার্চ। গাইড ছিল দেশীয়। তারাই রাস্তা ঘাট চিনিয়ে নিয়ে চলেছে।

থিনজোলা গ্রামের পাশে আমাদের শিবির।

বিকেলবেলায় ট্রেনচ থেকে বেরিয়ে এগিয়ে চলেছি গ্রামের দিকে। গ্রামগুলো প্রায় জনশূন্য, বিশেষ করে সৈন্য চলাচলের পথের ধারে লোক সাহস করে বাস করতে পারছিল না। আজ রাতে কোন মুভমেণ্ট নেই। সবাই হাত পা ছড়িয়ে বসে।

বেড়াতে বেরিয়ে পেলাম কয়েক টুকরো চিঠির কাগজ। কোন লোক হয়ত তার গোপন পত্র ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। উৎসুক হলাম কাগজের টুকরোগুলো দেখতে। কুড়িয়ে নিলাম কয়েকটি টুকরো। কাগজগুলো জোড়া দেবার বৃথা চেষ্টা করলাম।

যেটুকু পেলাম সেটুকুতেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

এই দুর্গম দেশে বাংলায় লেখা চিঠি।

পড়লাম সামান্য কটা শব্দ। মনে হল কোন হতভাগ্য বাঙ্গালী তার ঘরে ফেরার আশা নিয়ে এই পথে গেছে কিছুকাল আগে। আশ্চর্য নয়, জাপান বর্মা দখল করার পর যে সব বাঙ্গালী পরিবার আশ্রয়ের আশায় এই সব পাহাড় পর্বত ডিঙ্গিয়ে ভারতে ফিরেছে, তাদেরই কোন বাঙ্গালী পরিবার হয়ত এই চিঠি লিখেছিল, ডাকে দেওয়া হয়নি।

একটা জিনিষ স্পষ্ট হল আমার কাছে। জাপানীরা এপথে আসেনি, এসেছিল ভারতীয় সেনারা। আর তার নেতৃত্ব করছিল কোন মহান ব্যক্তি, ভারতের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য।

মনে খটকা লাগল।

আমার কোম্পানীতে বাঙ্গালী বলতে আমি একা, আর আছে দুজন ক্যাপটেন ডাক্তার। হয়ত মেডিক্যাল কোরে আরও দু একজন বাঙ্গালী আছে। তাদের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ পাইনি কখনও। তারাও হয়ত জানে না গোলন্দাজ বাহিনীতে আছে কোন বাঙ্গালীর ছেলে।

শুনেছি সার্ভিস কোরে কিছু বাঙ্গালীব ছেলে আছে, তারা রয়েছে পেছনে। আমরা ইন্‌ফ্যান্‌ট্রিকে কভার করে নিয়ে চলেছি। তাই পেছনে কে আছে দেখবার অথবা জানবার ফুরসত আমাদের ছিল না।

আজ বিশ্রাম।

যদি চেষ্টা করি তা হলে স্বদেশীয় দু এক জনকে আবিষ্কার করতে হয়ত পারব এই আশা নিয়ে সার্ভিস কোরেব দিকে এগিয়ে চললাম।

হল্ট্!

থামতে হল।

পরিচয় পত্র!

দেখালাম পরিচয় পত্র।

ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি পেলাম।

এগিয়ে চলেছিলাম অন্যমনস্কভাবে। হঠাৎ আমার নাম ধরে কেউ ডাকতেই ফিরে তাকালাম, আরে জগন্নাথ যে!

তুইও ফ্রন্ট লাইনে?

জগন্নাথ হেসে বলল, আরও অনেকে আছে। তোর সঙ্গে দেখা হয়নি বুঝি।

কেমন করে হবে। আমি আছি আর্টিলারীতে অর্থাৎ ফ্রন্ট লাইনে আর তুই আছিস রসদ জোগাতে ব্যাক লাইনে। দেখা সাক্ষাত করবার ফুরসত কোথায়। তার ওপর বন্দুক উচিয়ে সমানে ছুটছি, পেছনে তাকিয়ে দেখবার অবসর নেই, সুযোগও নেই।

জগন্নাথ বলল, কটা জাপানী মারলি!

হেসে বললাম, আমরা বাতাসে গোলা ছুড়ছি তাই জাপানী নিধনের হিসাবটা করতে পারি নি। ওটা জানে ইংরেজ কর্তারা।

জগন্নাথও হেসে বলল, সে রাত্তিরে কটা গোলা ছুড়েছিলি সেগুন গাছের বনে।

তা বিশ রাউণ্ড তো হবেই।

কার সঙ্গে যুদ্ধ করছিস তা কি জানিস?

জানার দরকার হয়নি ভাই। আমরা হুকুম শুনতে এসেছি। হুকুম শুনছি। যদি বলে ঐ সেগুন গাছগুলো আমাদের শত্রু তা হলে ওগুলোকেই নির্বংশ করতে হবে, এর বেশি দরকার নেই।

জগন্নাথ চুপি চুপি বলল, আমাদের শত্রু আমরাই।

মানে?

মানে আমরা যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি তারাও ভারতীয়। তারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আনতে চায়। তাদেরও আমাদেরই মত সৈন্য বাহিনী আছে। তারাও দখল করেছিল মনিপুর, কোহিমা।

জগন্নাথের কথা বিশ্বাস করতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, তুই জানলি কি করে?

আমি এখন সিগন্যাল কোরের লোক। বেতারে খবর ধরা পড়ছে। তা থেকেই জেনেছি।

আর কে জানে?

সিগন্যাল কোরের সবাই জানে। মাঝে মাঝেই ওদের বেতারের খবর ধরা পড়ে। ওরা এগিয়ে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু এখন খাবারের অভাবে আর অস্ত্রের অভাবে ফিরতে বাধ্য হচ্ছে।

জগন্নাথের ক্যাম্প থেকে চা খেয়ে ফিরে এসে ভাবছিলাম জগন্নাথের দেওয়া খবর সত্যি কিনা। মনে পড়ল সেই ছেড়া কাগজ গুলোর কথা। এতক্ষণে কিছুটা বিশ্বাস জন্মাল। এই কাগজগুলো আসবে কোথা থেকে, নিশ্চয় ওদের দলে আমাদেরই মত কিছু বাঙ্গালীর ছেলে রয়েছে! তখনও জানতামনা এই মুক্তিকামী সৈনিকদের নেতৃত্ব করছেন একজন বাঙ্গালী।

পরদিন হুকুম পেলাম মার্চ অন্।

এবার এসে ইরাবতী নদীর কিনারায় বনে আশ্রয় নিলাম সবাই। রাতের বেলায় ট্রেনচ্ কেটে কামান পাতা হল। নদীর ওপারে শত্রু।

বেশ রোদ উঠেছে আজ।

কদিন বৃষ্টি হচ্ছিল অবিশ্রান্ত ধারায়।

আমরা কামান নিয়ে প্রস্তুত।

খবর পেলাম, একটা কনভয় যাচ্ছিল আমাদের। ওপার থেকে গোলা মেরে কনভয়ের খুব ক্ষতি করেছে। অবিলম্বে প্রত্যুত্তর দেবার আদেশ পেলাম। দূরবীন লাগানো হল কামানে। কাঁধে দূরবীন ঝুলিয়ে ঘুরছে ক্যাপটেন বারনাম। আবার সেই পুরানো আদেশ দিতে লাগল সন্‌মুখম। ষাট ডিগ্রি আপ্ রাইট, চল্লিশ ডিগ্রি ডাউন লেফ্‌ট। সঙ্গে সঙ্গে কামানের মুখ ঘুরছে, ট্রিগারে চাপ পড়ছে। দমাদ্দম আওয়াজ করে গোলা ছুটছে। একমাইল প্রশস্ত নদীর ওপারে গিয়ে ফাটছে গোলা। তার ফলাফল এপার থেকে দেখা

যাচ্ছে না। আদেশের পর আদেশ, গোলার পর গোলা। কানফাটা আওয়াজ। আবার নীরবতা। অজ্ঞাত শত্রু, তার চলাচলও অজ্ঞাত। আন্দাজেই গোলা ছুটছে।

সোলেমান হাসতে হাসতে বলল, বেশ খেলা চলছে ইয়ার। এ আবার কি যুদ্ধ!

পদ্মনাভন গোলা এগিয়ে দিতে দিতে বলল, এর ভয়েই তো মরছিলাম।

কথা শেষ না হতেই মাথার ওপর দিয়ে শন্ শন্ শব্দ করে শত্রুর একটা গোলা ছুটে এসে প্রায় দুশ' গজ পেছনে বিকট আওয়াজ করে ফেটে পড়ল। মড়মড় করে ভেঙ্গে পড়ল গাছের ডাল। স্প্লীনটার-গুলো ছুটে গিয়ে লাগল গাছের গায়ে।

আওয়াজের ধাক্কা সামলে পেছনে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করছিলাম। ক্যাপটেন বারনাম চিৎকার করে আদেশ জানাল, ট্রেনচে যাও। গান্ গো অন্!

আমাদের কামান মিনিটে ছটা করে গোলা উদগীরণ করতে লাগল। সন্মুখম জানাতে লাগল কোন দিকে গোলা মারতে হবে। ক্যাপ্টেন বারনাম তখন ট্রেনচে! খোলা ময়দানে দাঁড়িয়ে তিনটে গোলন্দাজ বাহিনী। পাঁচশ' গজ দূরে এক একটা পোষ্ট। অপর দুটো পোষ্টে রয়েছে গোরা সৈন্য। আমরা মাত্র একটি ব্যাচ্।

ক্রমাগতই শত্রুর গোলা আসছে ছুটে।

তবে সংখ্যায় খুব কম।

মাঝে মাঝে আমাদের আশে পাশে ফেটে পড়ছে সে গোলা।

আমার পাশে দাঁড়িয়ে পদ্মনাভন কাঁপছে।

সোলেমান তাড়াতাড়ি বোতল বের করে এক গ্লাস রম্ ঢেলে দিল পদ্মনাভনকে।

অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া। রম্ খেয়েই চাঙ্গা হয়ে উঠল পদ্মনাভন। বেশ বীরত্বের সঙ্গে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, গো অন, ফায়ার।

বেলা পড়ে এল গোলা চালাতে চালাতে।

আমাদের সরবরাহ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল। পকেট থেকে রুটি আর দুধ বের করে খেয়ে নিয়ে বোতলের জল খেলাম ঢক্ ঢক্ করে।

সন্ধ্যা লাগতেই আমাদের ব্যাটারির চার্জ নিল সেকেণ্ড পার্টি। আমরা ফিরে গেলাম ট্রেনচে। তখনও গোলা ছুটছে অনবরত। মনে হল ওপারে যে সব জায়গায় গিয়ে গোলা পড়ছে সেখানে মানুষ তো দূরের কথা মানুষের কোন বসতি থাকলে তাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এতক্ষণে। এখন শশ্মানেই গোলা ছুড়ছি আমরা।

কিন্তু শত্রুর কোন শক্ত ঘাঁটিও রয়েছে ওপারে, নইলে এত গোলাগুলী ছুড়বার পরও ওরা মাঝে মাঝে গোলা ছুড়ে আমাদের ব্যস্ত রাখতে পারত না নিশ্চয়ই।

বিশ্রামের হুকুম এল একটু পরেই।

লরীতে করে পনর মাইল পেছনের গ্রামের শিবিরে আশ্রয় নিলাম।

জগন্নাথকে পেলাম সেখানে।

হেসে জগন্নাথ বলল, খুব যুদ্ধ করে এলে বুঝি?

আমি বললাম, হ্যাঁ, কিন্তু কে মরল, কে বাঁচল তার খবর নেই কোন। যুদ্ধ হল কিন্তু শত্রুকে দেখলাম না, গায়ের শক্তি পরীক্ষাও হল না, অথচ যুদ্ধ হল!

আমাদের ক্ষতি কম হয় নি। ওরা আমাদের ব্যাটারি পোষ্ট আক্রমণ করেনি নির্মল। ওরা আপার বর্মার পথ বন্ধ করতে কনভয় ধ্বংস করছিল। সাফল্যলাভও করেছে। আমাদের সেই পূর্ণদাশের কথা মনে আছে। পূর্ণদাশ ছিল কনভয়ে। সে মারা গেছে।

আহা!

সব সংবাদ আমরাই বেসে পাঠাই, তাই খবর গুলোও পাই। চারটে কনভয়ের একটা ছিল মেডিক্যাল ইউনিট। সেটা তো

সম্পূর্ণই তছনছ হয়ে গেছে। ডাক্তার, নার্স, আরদালীদের একজনও জীবিত নেই। ডাক্তারদের দু জন ছিল বাঙ্গালী।

শুনতে কষ্ট হচ্ছিল। বললাম, থাক ওসব কথা। আমরাও কম ক্ষতি করিনি।

তা ঠিক, তবে সেটা হয়েছে অনর্থক। কতকগুলো অসামরিক ব্যক্তি হয়ত মারা গেছে। বর্মীরা আমাদের শত্রু নয়, অথচ তারাই আমাদের গোলায় প্রাণ হারিয়েছে, ঘর হারিয়েছে, তাদের কৃষিক্ষেত্র গুলো নষ্ট হয়েছে। এ যুদ্ধ কার যুদ্ধ!

উত্তর দিতে পারলাম না।

ইংরেজ তার জমিদারী রক্ষা করতে চায়। জমিদারীর ভাড়াটে পেয়াদা দিয়ে আরেক দল ভাড়াটে পেয়াদা পেটাবার সেই মান্ধাতা আমলের পথ বেছে নিয়েছে ইংরেজ।

জগন্নাথ আমার চেয়ে অনেক বেশি বাস্তববাদী। তার বক্তব্যের মাঝ দিয়ে ফুটে উঠছিল আমাদের সত্যকার পরিচয়। সেদিন তার মত অত বেশি সজাগ ছিলাম না, তাই বুঝতামও না দেশের কতটুকু অংশ আমরা অধিকার করে আছি বা কতটা ত্যাগের প্রয়োজন দেশকে সেবা করতে।

জগন্নাথ বলা শেষ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি কোন জবাব খুঁজে পেলাম না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ আমার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল কান্‌টিনের দিকে। যেতে যেতে বলল, নিমাই ব্রহ্মকে মনে আছে তোর?

আছে। সে কোথায়?

জাহান্নমে। বেটার ঘোড়া রোগ ধরেছিল নইলে আজ জেল-খানায় বাস করতে হত না!

জেলখানায়! কেন? পালিয়েছিল বুঝি?

না পালায়নি। তবে পালাতে বাধ্য হত। একটা ছিন্‌ মেয়েকে

নিয়ে লেপটে পড়েছিল। একা নয়, সঙ্গে ছিল হাসমত খাঁ আর ভুবন চন্দ্রোর। তিনজনেই এখন জেলে। আট বছর করে কয়েদ হয়েছে।

হতভাগা!

কিন্তু কিছুটা আইনগত শিথিলতা থাকা উচিত।

কেন?

কেন নয়। আমরা এই বিদেশে বিভূঁইয়ে মৃত্যুকে সামনে নিয়ে বসে আছি। উত্তেজনা রয়েছে প্রবল, অথচ অপরাধ হল নারীসঙ্গ লাভ। এটা অবিচার। মানুষের যেমন খাবারের প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন যৌন জীবনের। নইলে মানুষ কেন, কোন প্রাণীই বাঁচতে পারে না। সরকারী নিয়ম যদি তাই হয়, তা হলে ব্রহ্মচারী আর সন্ন্যাসীদের ডেকেই যুদ্ধে পাঠান উচিত ছিল। সবই সহ্য করতে পারি, পারিনা শুধু অবিচারকে। আজ রাতে এখানেই থেকে যা, তোকে দেখাব অন্যায়টা উপরওলারা কি ভাবে করে।

রাতে থাকতে দেবে কেন?

তুই পারমিট নিয়ে আয়।

চেষ্টা করব।

চেষ্টা করেই পারমিট নিয়ে জগন্নাথের অতিথি হলাম।

রাত আটটা অবধি তাস খেলে কাটল, তারপরই খাওয়া। খেয়ে দেয়ে জগন্নাথ ডাকল গুলিন্দার আর হোসিয়ার সিংকে, সঙ্গে নিল আমাকেও। বলল, তোকে একটা মজা দেখাব কিন্তু সাবধান, কোন রকমে কেউ যেন টের না পায়। বেড়ালের মত নিঃশব্দে যেতে হবে, ফিরতেও হবে বেড়ালের মত নিঃশব্দে।

জগন্নাথের উপদেশ অনুযায়ী বুকে হেঁটে এগোতে এগোতে কাঁটা তার ঘেরা অফিসারদের ছাউনীতে পৌঁছে গেলাম।

জগন্নাথ মাথা উঁচিয়ে বলল, হুঁসিয়ার। এবার আমাকে ফলো কর তোমরা।

কাঁটা তারের ছোট ফাঁক গলে গড়িয়ে ভেতরে ঢুকল জগন্নাথ, তার দেখাদেখি আমরাও কাঁটা তারের বেড়া পার হলাম শুয়ে শুয়ে।

অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এগোচ্ছি।

রুদ্ধ নিশ্বাসে জগন্নাথ বলল, সামনে চোখ রেখে শুয়ে থাক।

ছোট্ট খোলা মাঠ একটা।

কয়েকজন বসে কি যেন খাচ্ছিল।

পানীয়ের গন্ধ এসে প্রবেশ করছিল নাকে। ফিস্ ফিস্ করে বললাম, কারা যেন মদ খাচ্ছে!

আমাদের অফিসাররা। আরও বাকি আছে। গাছের আড়াল দিয়ে দেখতে থাক।

পরের দৃশ্য অবর্ণনীয়।

কোথা থেকে যে নারী সমাগম ঘটল অকস্মাৎ সেই নির্জন মাঠে তা ভগবানই জানেন, কিন্তু তাদের কাউকেই প্রকৃতিস্থ মনে হল না। অঙ্গের বসনভূষণও বুঝি লজ্জায় আত্মগোপন করেছিল। দেখতে লজ্জা হচ্ছিল, মানসিক উত্তেজনাও অনুভব করছিলাম। জগন্নাথকে বললাম, এবার ফিরে চল। ধরা পড়ে যাবি।

ধরা পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। ওরা সবাই এখন মদের নেশায় বাহ্যিক জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েছে, তার সঙ্গে রয়েছে নারীর সঙ্গ। ওরা কোন কিছুরই খবর রাখে না এখন।

ফিরে আসতে আসতে জগন্নাথ বলল, সামরিক শিবিরে নারীর প্রবেশ নিষেধ। দেখলিতো, অফিসাররা সে আইন ভঙ্গ করছে নিজেরাই, অথচ দোষ হল নিমাই আর তার সহচরদের। অবিচার। ঘোর অবিচার। এর প্রতিবিধান করতেই হবে।

বললাম, আমরা কত নিরুপায় তাতো জানিস।

গা কামড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে। অন্যায়কে অন্যায় বলার অধিকার পর্যন্ত আমাদের নেই।

সামরিক জীবনে যেমন আছে বুকের রক্ত দেবার সর্ত, তেমনি থাকা উচিত ছিল জীবনকে ভোগ করার অবাধ অধিকার। পেটের দানা চাই, নারীর পুরুষ চাই, পুরুষের নারী চাই। এসব ভুলে গেছে আইনপ্রণেতারা। তারা বিশেষ শ্রেণীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করে রেখেছে আর অপরের জন্য বরাদ্দ রেখেছে শাস্তির উদ্যত খড়্গ।

বলতে বলতে থেমে গেলাম। আমার মুখ থেকে এমন সাংঘাতিক কথা কখনও বের হতে পারে তা মনেও করতে পারিনি। নিজেকে এমনভাবে লোকের সামনে খুলে ধরতে পারিনি কোনদিন, খুলে ধরবার সাহসও ছিল না। বাল্যাবধি যে হীনমন্যতা আমার মধ্যে সক্রিয় তার প্রভাবে মানসিক উৎকর্ষতা সব সময় বাধা পেত। আমার চিন্তার ধারা ছিল ছক বাঁধা, কাজের পদ্ধতি ছিল নিয়মানুগ, আর ভীতি ছিল তার নিত্য-সহচর।

জগন্নাথও কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল।

হোসিয়ার সিং আমার হাত চেপে ধরে বলল, আজ ক্যাম্পে যাব না ভাই।

কেন?

ঐ ছুকরীদের একটাকে ধরতে হবে। আমাদেরও চাই ওদের।

গুলিন্দার হেসে বলল, কেমন করে ধরবি। ওদের পয়সার লোভ দেখিয়ে ডেকে এনেছে, আবার ফিরে পৌছে দেবার ব্যবস্থাও করেছে। কোন পথে যাবে তার কি ঠিক আছে!

বাইরে তো আসবে। গ্রামের পথেই যাবে তো?

ওরা গ্রামের মেয়ে নয়। শহরের মেয়ে, এখন গ্রামে বাস করছে। ওদের স্বভাব তৈরী হয়েছে শহরেই, গ্রামে নয়।

আমি বললাম, ওরা নারসিং সার্ভিসের মেয়েও হতে পারে। চালচলনে তাই মনে হল।

আমার কথায় ওদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ল।

জগন্নাথ বলল, তা হতে পারে। অফিসাররা হাজার হাজার টাকা পায়, ওরা তাদের সঙ্গেই তো থাকে। আমারা পুঁটি মাছ, ওদের গাউনের আর ড্রিংকের দাম দেব কোথা থেকে। ভাই, আঙ্গুর ফল টক্, বুঝলে। তবে রাতের বেলায় আজ যা দেখলে তা সামরিক আইনের আওতায় আসে না।

বললাম, ফিলডে সবাই বেপরোয়া।

তাই বুঝি!

নিশ্চয়। আমরাও যদি ফ্রন্ট লাইনে বন্দুক ঘুরিয়ে দাঁড়াই তা হলেই ওদের স্বার্থহানির সম্ভাবনা, তাই ফ্রন্ট লাইনে কেউ কিছু করলে মোটেই বাধা দেবে না।

তাহলে নিমাইকে কেন কয়েদ করল?

তার পেছনে নিশ্চয় অন্য কোন ঘটনা আছে।

তা জানি না, তবে সে মেয়েটা অত্যাচারের ফলে মারা গেছে।

গুলিন্দার বিরক্তির সঙ্গে বলল, হিন্দী-মে বাত কর বাঙ্গালী বাবু।

জগন্নাথ বলল, আমরা দেশের কথা বলছি। নির্মলের বিবি মারা গেছে সেই খবর পেয়েছি, তাই বললাম ওকে।

গুলিন্দার বলল, আপ্‌শোষ কি বাত্। আমরা অবিবাহিত, আমাদের কোন ভবিষ্যত নেই। তাই পেটের দায়ে এসেছি লড়াইতে। তুমি কেন এলে নির্মল। তোমার বিবি নিশ্চয় খুব দুঃখ পেয়ে মরেছে। আপ্‌শোষ!

জগন্নাথের তামাসা বুঝতে পেরে বললাম, খুব ভালবাসত আমাকে।

জরুর। ঘরের বউ ভালবাসাবে বই কি। একি রাণ্ডীখানার মেয়ে। পয়সা নিয়ে দায়িত্ব শেষ। তুমি ছুটি নাও নির্মল।

ছুটি মিলবে না গুলিন্দার। এই ভাল আছি। আমারও সময় হয়ে এসেছে। একদিন দুশমনের গোলায় টুকরো টুকরো হয়ে যাব। তারপর দুজনে মিলব স্বর্গে। সেই ভাল।

গুলিন্দার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, বড়ি বাত। য়্যাসা হোনা চাহি।

জগন্নাথ বলল, দেখলি তো খোট্টার বুদ্ধি।

কোন জবাব দিলাম না। কাল্পনিক মৃত্যু সংবাদে গুলিন্দার ব্যথিত, তাও তার নিজের স্ত্রীর জন্য নয়, অপরের। সেই স্ত্রীও আবার অবাস্তব কল্পনা। যদি গুলিন্দারের স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ আসত তাহলে কি হত বলা যায় না।

জিজ্ঞেস করলাম, তুমি সাদী করনি কেন গুলিন্দার।

অন্ধকারে গুলিন্দারের হাসি দেখতে পাইনি। মনে হল সে হেসেছিল। মুখ ফিরিয়ে বলল, আমার বাবা সাদী দিতে চেয়েছিল। সাদীর ভয়েই ফৌজে এসে গেছি।

বুঝলাম না তোমার কথা।

বাবা বিয়ে ঠিক করল পিরগাঁয়ের মুনিয়া চৌধুরীর মেয়ের সঙ্গে। মুনিয়া খুব পয়সাওলা সরেস লোক। তবে তার বেটি গিরটিয়ার বয়স দশ বছর। আমার বয়স বাইশ আর গিরটিয়ার বয়স দশ। এমন বউ দিয়ে কি করব বলত। মুনিয়া চৌধুরী তিন বিঘা জমি দিতে রাজি ছিল। আমার পছন্দ হল না। নালায়েক মেয়েকে বিয়ে করব না বলে পালিয়ে এসেছি।

বউ তো লায়েক হবে কোন দিন।

ততদিন বাঁচব কি! ওসব কথা ছাড়ো বন্ধু। গিরটিয়ার জন্য ওরা অনেক পাত্র পাবে। আমি বরং একটু ছুটে বেড়াই। কিসের দুঃখে বিয়ে করব বল?

মানুষ কি দুঃখে পড়ে বিয়ে করে?

ঘরে মেয়েমানুষ রাখলেই বিপদ। তার চেয়ে পকেটে পয়সা থাকবে, নতুন নতুন মেয়েমানুষ পাব।

জগন্নাথ বলল, তুমি মরলে এইসব নতুন নতুন মেয়েমানুষ কাঁদবে কি! তাদের ছেলেরা তোমাকে বাবা বলে ডাকবে কি!

ঠিক কথা। তবে মরার পর কাঁদার জন্যে কাউকে বিয়ে করা খুবই বোকামী। আর ছেলে! দরকার কি!

গুলিন্দার বুঝতে চায় না কিছুতেই।

আমি বললাম, আমার বিবি মরেছে বলে তুমি দুঃখ করছিলে কেন?

মানুষ মরলে দুঃখ হবে না! আমরা কি পশু। দুশমন মরলেও দুঃখ হয় সাথী।

বললাম, সে আমাকে ভালবাসত খুব। তুমি নিশ্চয়ই ভালবাসা চাও না।

এবার গুলিন্দারের মুখোস খুলে গেল।

বলল, বউকে ভালবাসলে বউয়ের ভালবাসা পাওয়া যায়। তুমি বউকে ভালবাস তাই বউও তোমাকে ভালবাসত। আমি কিন্তু ভাই বউকে ভালবাসতে পারব না।

অর্থাৎ তুমি অন্য কাউকে ভালবাস?

গম্ভীরভাবে গুলিন্দার বলল, জরুর। কিন্তু তাকে বিয়ে করতে পারছি না। বিয়ে করলে সমাজে আটক হয়ে যাব। সে আমার ফুফার বেটি আর বিধবা।

সর্বনাশ! তোমার নিজের বোন বলতে পার।

তাই তো! গুলিন্দার মাথা চুলকে চুপ করে গেল।

সে রাতে ক্যাম্পে ফিরে জগন্নাথের পাশে শুয়ে গল্পে মেতে উঠলাম। গল্পের গতি মোড় ঘুরতেই জগন্নাথ বলল, চল বাইরে বসে গল্প করি। ওদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে আর আমাদের আলোচনাও ওদের পক্ষে রুচিকর হবে না।

সে রাতে জগন্নাথ মনপ্রাণখুলে সারা বিশ্বের আলোচনা করে বোধ হয় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। আমিও অনেক কথাই বলেছিলাম। যে সব আদর্শ আর নীতি নিয়ে সেদিন আলোচনা হয়েছিল সে সব ভুলে যেতে পারিনি কিন্তু যে আদর্শ আর নীতিকে

আঁকড়ে ধরার শপথ করেছিলাম তা মোটেই পালন করতে পারিনি।

জগন্নাথ দেশে ফিরে যাবার ভরসা দিয়েছিল। বলেছিল, আমাদের এই ট্রেনিং-ই দরকার হবে দেশ গড়তে। যুদ্ধ শেষ হবে একদিন, সেদিন আমাদের বন্দুক উল্টে ধরতে হবে।

ইংরেজ দেশ ছাড়বে কি ?

ছাড়তে বাধ্য হবে। ইংরেজ নয়, অনেক জমিদারকেই জমিদারী ছাড়তে হবে। আর আমাদের দেশে আমাদেরই নিতে হবে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব। তারজন্যই প্রস্তুতি চালাতে হবে।

আমি তার কথা স্বীকার করতে পারলাম না নীতিগতভাবে। মোটেই বিশ্বাস রাখতে পারলাম না তার কথায়। এক ইঞ্চি জমির জন্য আমরা আদালতে হাজির হই মাথা ফাটিয়ে, আর ভারতবর্ষের মত এতবড় দেশ ছেড়ে ইংরেজ কোনদিন চলে যাবে, তা বিশ্বাস করতে পারিনি। জগন্নাথকে বললাম, তোর মাথা খারাপ হয়েছে।

আজ তাই মনে হবে কিন্তু ঘটনার গতি লক্ষ্য করলে তোরও বিশ্বাস জন্মাবে।

অত ক্ষমতা আমার নেই। সে শিক্ষাও আমি পাইনি। জানিস ভাই, আমার বাল্যজীবন কেটেছে গৃহভৃত্যের ভূমিকায়। যে বাড়িতে কাজ করতাম সেখানে আমার এক দিদি ছিলেন, তিনিই কিছুটা লেখাপড়া শিখিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সামান্য বিদ্যাবুদ্ধিকে আশ্রয় করে পৃথিবীর ঘটনা লক্ষ্য করে মতামত দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব কি !

তোর মন ছোট, তোর মত হীনমন্য লোক কখনও দেখিনি। মানুষ অবস্থার দাস। কে কবে চাকরের কাজ করেছিল তা নিয়ে মাথা ঘামায় বেকুবে। এই মানুষ বনে গেলে বনমানুষ হয়। আবার এই মানুষই মহামানব হয়। আচ্ছা তোকে ক'খানা বই দেব, পড়ে দেখিস। পড়লেই বুঝতে পারবি।

সেই রাতেই জগন্নাথ ক'খানা চটি বই আমার হাতে দিয়ে বলল, পড়ে ফেরত দিস ভাই। আর কোথাও পাব কিনা জানি না। হাতছাড়া করতে তাই বড় ভয়।

সকালবেলায় চা খেয়ে ফিরে এলাম নিজের আস্তানায়।

সেদিন কোন কাজ ছিল না। সারাদিন ক্যাম্পে বসে বইগুলো পড়ে শেষ করলাম।

একবার নয়। বহুবার পড়লাম।

জগন্নাথ অবশ্যই পরিবর্তন এনে দিয়েছিল আমার জীবনে।

মান্দালয় থেকে দু'জনে আলাদা হয়ে গিয়েছিলাম। জগন্নাথ ফিরে গিয়েছিল দেশে। আমাদের যেতে হয়েছিল সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পুনঃ অধিকৃত এলাকায়। তারপরে তার সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল আলিপুর জেলে, তাও প্রায় পাঁচ বছর পর। তখন জগন্নাথ আর আমি হয়ে পড়েছি ভিন্ন মতাবলম্বী। সে যেমন তার আদর্শ হারিয়েছে, তেমন আমিও মত বদলেছি।

জাপান আত্মসমর্পণ করল।

আজাদ হিন্দ বাহিনী পর্যুদস্ত।

আমরা এগিয়ে গিয়ে ঘাঁটি করলাম সিঙ্গাপুরে।

বিজয় উৎসবে মেতে উঠল ইংরেজ, মার্কিন সৈন্যরা।

উৎসবের সে নারকীয় ঘটনার ইতিহাস কেউ লিখে রাখেনি। লিখলে জানা যেত সিঙ্গাপুরের ভারতীয় পল্লীর মেয়েরা সেদিন কিভাবে লাঞ্ছিত, অবমানিত ও ধর্ষিত হয়েছিল। সেদিন পশুশক্তির জয়ের নিশান কলঙ্কের ডালিমাথায় নিয়ে অসামরিক জনতার ওপর যে পীড়ন করেছিল তা সভ্যজগতে খুব কমই ঘটে। বলতে গেলে পাশ্চাত্য সভ্যতার সেই বীভৎস ও নগ্নরূপ সেদিন জনসাধারণের অশেষ ঘৃণার বস্তুতে পরিণত হয়েছিল।

উৎসবের দুটো দিন ছিলাম সিঙ্গাপুরে। তৃতীয় দিনে, জাহাজ

বোঝাই করে আমাদের গোটা কোম্পানীকে পাঠান হল সায়-গনে।

ইন্দোচীনের মানুষ সাদরে গ্রহণ করেছিল আমাদের কোম্পানীকে। পরাজিত জাপানী সৈন্যদের খুঁজে বের করার দায়িত্ব ছিল আমাদের। আমাদের সাহায্য করত ইন্দোচীনের মানুষ।

আমাদের তারা সম্মান করত, 'চন্দ্রবোসের দেশের মানুষ' এই সুবাদে। নেতাজীর ব্যক্তিত্ব ও আদর্শকে ভালবাসত ইন্দোচীনের জনসাধারণ। ভারতীয় সৈন্যদের তারা তাদের ভাই-এর মতই মনে করে নিয়েছিল।

আমাদের কাজ ছিল মেকংনদীর বদ্বীপ থেকে জাপানীদের খুঁজে বের করা। আমরা সেই কাজেই ব্যস্ত ছিলাম। রাজনীতির ছায়াও কখনও স্পর্শ করত না আমাদের জীবন। তাই, স্থানীয় ইন্দোচীনের মানুষদের অকুণ্ঠ সাহায্য পেতাম আমরা।

ইন্দোচীন ছিল ফরাসীদের উপনিবেশ।

ফরাসী শাসন চায় না দেশের লোক, পরাধীনতার গ্লানি সহ্য করতে পারছিল না তাবা। ফরাসীদের তাড়িয়ে জাপান দখল করে নিয়েছিল গোটা দক্ষিণপূর্ব এশিয়া। ইন্দোচীনের অধিবাসীরা আশা করেছিল, দেশটা জাপানীরা দখল করলেও তার শাসনব্যবস্থা তুলে দেবে দেশীয় লোকেরই হাতে। কিছুকালের মধ্যেই তাদের সে ভুল ভাঙ্গল। তারা দেখল, ফরাসীদের চেয়েও উগ্র সাম্রাজ্যবাদী হল জাপানীরা। শোষণে শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল তারা। তারপর একদিন দেশের লোক গোপনে অস্ত্র ধারণ করল জাপানের বিরুদ্ধে। জাপান বিব্রত হল দুদিক থেকে। একদিকে আভ্যন্তরীক যুদ্ধ, অপরদিকে ইংরেজ মার্কিন আক্রমণ।

ইন্দোচীনের জনসাধারণ জাপান বিদ্বেষী হয়ে পড়েছিল। আর তাই আমাদের কাজে আন্তরিকভাবেই সাহায্য করত তারা।

গিয়াংহুপ আমাদের গাইড।

গিয়াং মাঝে মাঝেই বলত নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কথা।

বলত, ওরকম তেজস্বী মানুষ কখনও আমরা দেখিনি। তোমাদের দেশ স্বাধীনতা লাভ করতে পারল না কেবলমাত্র জাপানীদের জন্য। ওরা চন্দ্রবোসকে ধোঁকা দিয়েছে।

বলতাম, জাপানীরা তো আরও ভয়ঙ্কর সাম্রাজ্যবাদী।

ঠিক বলেছ। তোমরা এসেছ জাপানীদের খুঁজে বের করতে। কাজ সমাপ্ত হলেই তোমরা আবার ফিরে যাবে তোমাদের দেশে। আর তাই আমাদের মহাসমিতি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, ভারতীয়রা এদেশের মানুষের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে এসেছে, সেজন্য তাদের সাহায্য করা উচিত।

চমকে উঠলাম গিয়াংহুপের কথা শুনে।

বললাম, সে সব তো আমাদের জানা নেই।

গিয়াং বলত, এসব উপর মহলের কথা। এর সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধই নেই। তবুও আমরা খুশী হয়েছি। চন্দ্রবোসের দেশের লোক তোমরা। পরাধীনতার বেদনা তোমরা ভালই জান। নইলে তোমরাই বা কেন আসবে আমাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে।

আমি যেন ধাঁধায় পড়ে গেলাম। গিয়াংকে মোটেই বুঝিয়ে বলতে পারলাম না আমাদের প্রকৃত অবস্থা। বলতে গেলে শুনতেও চাইত না। জানিনা, আমাদের আজাদ হিন্দ বাহিনীর লোক মনে করত কিনা!

একদিন গিয়াং আর এল না।

আমরাও বেতার সঙ্কেত পেলাম সাবধানে থাকবার।

পরদিনও গিয়াং এল না।

কারণ, তখনও জানিনা।

কিন্তু জানতে দেরী হয়নি। কারণ, পরাজিত ফরাসী সাম্রাজ্য-বাদীরা যুদ্ধ শেষে ইংরেজ আর মার্কিনের সহায়তায় আবার তাদের উপনিবেশগুলো দখল করতে এগিয়ে এসেছে।

ইংরেজ ভারতীয় সৈন্যদের ইন্দোচীনে পাঠিয়েছিল ফরাসী সৈন্যদের অভ্যর্থনা জানাতে। আর ফরাসীরা যাতে নির্বিঘ্নে রাজত্ব করতে পারে তারজন্য পথের কাঁটা তুলতে।

ইন্দোচীনের জনসাধারণ ইংরেজের এই ভণ্ডামি ধরে ফেলেছিল। যেদিন ফরাসী সৈন্য ফিরে এসে আবার ইন্দোচীনের দখল নিল, সেদিন থেকেই ইন্দোচীনের মানুষ অবিশ্বাস করতে শিখল ভারতীয়দেরও। এ ভণ্ডামীর যোগ্য প্রত্যুত্তর দিল তারা বন্দুকের মুখে।

য়্যামবুশ।

হঠাৎ ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী এসে তছনছ করে দিল কনভয়। অবাক হয়ে গেলাম আমরা। দুদিন আগেও যারা বন্ধু ছিল এখন তারাই শত্রু। রাজনীতির আবর্তে আমরা দাবার ঘুঁটি মাত্র। যে যেমন চালে সে ঘুঁটি চালায় আমরাও সেইভাবে চলি।

নিয়ন্ত্রিত হল আমাদের গতায়াত।

ইন্দোচীনাদের হাতে প্রচুর অস্ত্র দিয়ে গেছে জাপান। তারই সদ্ব্যবহারে নেমে পড়ল ইন্দোচীনের যুবসমাজ। এবার তাদের শত্রু ভারতীয়, ইংরেজ আর ফরাসী। ইংরেজ বেনের জাত। লাভের কোন সম্ভাবনা নেই জেনে তারা ধীরে ধীরে ফিরিয়ে নিতে লাগল ইংরেজ ও ভারতীয় বাহিনী।

আমাদেরও মুভমেণ্ট অর্ডার এল অচিরে।

ইন্দোচীন থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল, সেই আসা যে কত বেদনার তা বলা কঠিন। ভারতীয় বাহিনী যে ইংরেজের দাস, তাদের যে নিজস্ব কোন সত্ত্বা নেই, তা সেদিন তাদের বুঝিয়ে বলে আসতে পারিনি। ইন্দোচীনের সাধারণ মানুষের মনে দাগ কাটল, ভারতীয়রা বিশ্বাসঘাতক! ভারতীয়রাই ফরাসীদের ফিরে আসার পথ করে দিয়েছে। জাপান চলে যাবার পর ইন্দোচীন স্বাধীনসত্ত্বা নিয়ে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াতে পারত, পারল না শুধু ভারতীয়দের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য।

জাহাজঘাটায় মাল উঠালো না ইন্দোচীনের কুলিরা।

ভারতীয়দের মাল বহন করতে ঘৃণাবোধ করেছিল সেদিনের ইন্দোচীনের কুলিরাও।

দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল, অথচ বলতে পারছিলাম না কিছুই। তাদেরও বুঝিয়ে বলতে পারলাম না আমাদের নিষ্পাপ ভূমিকার কথা।

জাহাজের ব্রীজে শুয়ে শুয়ে ভেবেছি। পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে ইন্দোচীন যা পারছে তা আমবা পারছি না কেন!

কেন মুক্তি পাচ্ছি না আমরা!

অথচ ক'মাস আগে গিয়াংতুপের বাড়িতে গিয়েছিলাম সোলেমানের সঙ্গে নেমন্তন্ন খেতে। আত্মীয়তা আর আন্তরিকতার মোটেই অভাব ছিল না সেদিন।

মিসেস গিয়াং তার হারপ্ বাজিয়ে শোনাল আমাদের।

আমাদের পরিতুষ্ট করতে স্বামীর মারফত কথা বলতে ত্রুটি করল না।

মিসেস গিয়াং বলেছিল, ভারত আর ইন্দোচীনের মৈত্রী চিরস্থায়ী হোক।

যেদিন য়্যামবুশ আরম্ভ হল, সেদিন চমকে উঠিনি। ব্যর্থতা ও হতাশার গ্লানিতে ক্ষিপ্ত হয়েছিল ইন্দোচীনের মানুষ। তারা বিচার করেনি সত্যই ভারতীয়রা অপরাধী কিনা। সৈন্যরা, বিশেষ করে পরাধীন দেশের ভাড়াটিয়া সৈন্যরা যে কোন বিশেষ দেশের মানুষ নয়, প্রভুর হুকুম তালিমের যন্ত্রমাত্র, একথা বোঝা উচিত ছিল তাদের।

গিয়াং তুপের সঙ্গে আর একবার দেখা করবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু আমাদের ক্যাম্প ছেড়ে বের হবার কোন অধিকার ছিল না। আমরা বাস্তবত বন্দীদশায় কাটিয়েছি শেষের কটা দিন। জাহাজে না ওঠা অবধি আমাদের পাশ ফেরাও ছিল নিষেধের গণ্ডীতে বাধা।

মিসেস গিয়াং হুপকে ভুলতে পারছিলাম না।

তার হাসি মাখা মুখখানা আমার বুকে একটা মধুর ছবি এঁকে রেখেছিল। তুটি ভিন্ন দেশের মিলনে বন্ধন দেবার তার সেই আগ্রহ ও আন্তরিকতা আজও আমার কানে বাজছে।

জাহাজের ব্রীজে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করছিলাম।

তুবছরের চাকরি জীবনে কত দেখলাম, কত শিখলাম। লাহা বাড়ির সেই নিমু চাকর যে নির্মলবাবুতেই শুধু পরিণত হয়েছিল তা নয়, নির্মল শিখেও ছিল অনেক। মানুষের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষাও জেগেছিল তার মনে। আর এই উচ্চাশাই বোধহয় সৈনিক জীবনে সবচেয়ে বড় সঞ্চয়।

সিঙ্গাপুর এসেই জাহাজ থামল।

আমরাও নামবার আদেশ পেলাম।

বাড়ি ফেরার পথে সিঙ্গাপুরে আমরা পেলাম অবাধ স্বাধীনতা। রাশছাড়া ঘোড়ার মত চঞ্চল ও বেপরোয়া হলাম আমরা। বেগবতী নদীর বাঁধ ভেঙ্গে গেলে যেমন তু'কূল প্লাবিত হয়ে যায় তেমনি শৃঙ্খলিত সামরিক জীবনের সে বন্ধনটি সাময়িক খুলে দেওয়ায় শালীনতা আর সভ্যতার মুখোস খুলে গেল। সবাই জানে, এবার দেশে ফিরলেই কর্ম থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। কেউ তিন বছর, কেউ বা চার বছর পর ঘর দেখবে। যারা এসেছিল ভাঙ্গা ঘর দেখে, ফিরে গিয়ে তারা দেখবে কত না পরিবর্তন। যারা রেখে এসেছে প্রিয়জন তাদের ঘর হয়ত শূন্য। এসব চিন্তা করবার মত মানসিক গঠনও হয়ত সবার নেই, তবুও তারা জেনেছে তাদের সামরিক জীবনের পরিসমাপ্তি আসছে। আবার তাদের ফিরে যেতে হবে চিরাচরিত সেই পিতৃপুরুষদের জীবনে। যেখানে প্রত্যহই চিন্তা করতে হবে আহার্যের, পরস্পরে সংঘাত ঘটবে সাধারণ স্বার্থ নিয়ে। আজ যে সাময়িক শিথিলতা স্বীকার করেছে উঁচু মহলের কর্তারা তাদেরও

কোন না কোন দিন ফিরে যেতে হবে অসামরিক জীবনে, চিন্তা করতে হবে প্রাত্যহিক রসদের।

ভারতীয় অঞ্চলকে দেখে গিয়েছিলাম সেবারও। দেখে গিয়েছিলাম উৎসবমুখর নগরীতে ভারতীয়দের দৈন্য ও দুর্দ্দশার চিত্র। সেদিনও যেমন আমার করার কিছু ছিল না, আজও তেমনি করার কিছু নেই। তবুও তাদের দেখতেই আবার ভারতীয় এলাকায় এগিয়ে গেলাম সাদা পোষাকে। ভাষার বিভিন্নতা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। তাই সেখানকার তেলেগু ও তামিল-ভাষীদের সঙ্গে সহজে মেশবার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। একটা চায়ের দোকানে বসলাম। পরিচ্ছন্ন ক'জন তামিলিও এসে বসল। তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করার চেষ্টা কবলাম। কিন্তু আমার ভাষাজ্ঞান সীমাবদ্ধ। ইংরেজিও জানিনা। দুচারটে ফৌজী বাত ভিন্ন অন্য কোন সম্বল খুব কম। হিন্দী বা উর্দুতেও তথৈবচ। তাদের সঙ্গে কথা বলে মোটেই সুবিধা করতে পারলাম না। ঘুরতে ঘুরতে চীনা পল্লীতে এলাম। ভারতীয় পল্লীর মতই অগোছাল এবং নোংরা চীনাদের বস্তীগুলিও। পার্থক্য খুব কিছু নেই। বসলাম একটা চীনা দোকানে। ভোজ্য ও পেয় বলতে যা কিছু ছিল ইঙ্গিতে পরিবেশন করতে বললাম।

আমাকে আশ্চর্য করে পরিষ্কার হিন্দীতে জিজ্ঞেস করল একজন চীনা মহিলা, কোথায় থাক তুমি। নতুন এসেছ কি এদেশে?

বললাম, সিঙ্গাপুরেই এসেছি, শীগ্‌গীরই দেশে যাব।

কোথায় তোমার দেশ?

কলকাতায়।

তাই বল, বলেই পরিষ্কার বাংলায় বলল, আমি কলকাতায় ছিলাম বিশ বছর। যুদ্ধের আগে এসেছি এদেশে, যুদ্ধ বাধতেই থেকে গেছি। কি করি, একটা খাবারের দোকান সাজিয়ে বসেছি। তোমাদের বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে এস এখানে। সব কিছুরই ব্যবস্থা আছে।

মহিলাকে ঠিক বুঝতে পারলাম না।

খাবারের দাম মিটিয়ে উঠছিলাম, ও বলল, তুমি নিশ্চয়ই ফৌজে চাকরি কর?

কেন?

তোমাকে দেখে তাই মনে হয়েছে।

হ্যাঁ, তোমার অনুমান ঠিক।

শুনলাম তোমাদের এখন ছুটি।

কে বলল?

কত ফৌজী যুবক রোজ আসে এখানে, তাদের কাছেই শুনেছি। আরেক কাপ চা দেব।

তা দিতে পার।

মহিলা চা তৈরী কবতে কবতে বলল, তারা জানে অবসর সময় কাটাবার জন্য ম্যাদাম কুং-এর এই ভোজনাগারটি হল সিঙ্গাপুর শহবেব মধ্যে খ্যাতনামা। কাউকেই নিরাশ হয়ে ফিবতে হয় না এখান থেকে। আমাদেব এখানে কেবল ভারতীয়দেব অভ্যর্থনার ব্যবস্থাই রয়েছে, অন্য কাউকে আমরা বিশেষ আপ্যায়ন করি না।

চা এনে আমার সামনে রেখে বলল, আজ সন্ধ্যায় গান বাজনার ব্যবস্থা করেছি। তুমিও আসতে পার, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আনতে ভুলো না।

চা খেতে খেতে বললাম, আচ্ছা।

চা খাওয়া শেষ করে উঠতেই আবার বলল, মনে থাকবে তো?

নিশ্চয়। কত দাম তোমার চায়ের?

আমার চায়ের কোন দাম ঠিক নেই, যে যা দেয়।

আমি বোকার মত তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। মহিলা বলল, অবাক হচ্ছ কেন! এটা সিঙ্গাপুর। ফ্রি সিটি। এখানে সবই ফ্রি মনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে।

পকেট থেকে পঞ্চাশ সেন্টের একটা চাকতি বের করে তার হাতে দিলাম। খুচরো ফিরিয়ে দেবার কোন চেষ্টাই সে করল না। আমিও ফিরতি পথ ধরলাম।

শহর সিঙ্গাপুরের ধ্বংসস্তূপ অপসারণ আরম্ভ হয়েছে। বাঁশ দিয়ে ঘর তৈরী করে বাস করছে শহরবাসিরা। ভাঙ্গা দেওয়ালের সঙ্গে বাঁশের ছাউনি অনেক জায়গায়। ঘুরতে ঘুরতে ব্যারাকে ফিরে এলাম।

বিকেলবেলায় শরীরটা ভাল লাগছিল না।

সোলেমানকে ডেকে বললাম, বেড়াতে যাবি সোলেমান!

কোথায়?

শরীর ভাল নেই, সমুদ্রের ধারে যাব। সেখান থেকে কোথাও চা খেয়ে ফিরে আসব।

চল। মাংলেকে ডেকে নাও।

তা নিতে পারিস। সমুদ্রের ধারে রাহাজানি হয় শুনেছি। দলবল নিয়ে যাওয়াই ভাল। শেরসিং বোধহয় তাবুতে আছে, তাকেও ডেকে নে।

তড়িঘড়ি প্রস্তুত হলাম চার জনেই।

শহর পেরিয়ে চীনা পল্লী দিয়ে যেতে যেতে সেই চীনা মহিলাটির দোকানের কাছে আসতেই সোলেমানকে বললাম সকালের ঘটনা। শুনেই সোলেমান বলল, এই কথা। চল, ওর মাইফেলটাই দেখে আসি আগে। পয়সা আছে তো পকেটে? ঠিক আছে, যা আছে ওতেই হবে।

সোজা গিয়ে ঢুকলাম চায়ের দোকানে।

ম্যাদাম কুং আমাকে চিনতে পেরেছিল। হাসি মুখে এগিয়ে এসে বলল, তোমরা কি আসরে যাবে?

নিশ্চয়, বলে সোলেমান উৎসাহিত ভাবে উঠে দাঁড়াল!

তাই চল। ওখানেই তোমাদের চা পাঠিয়ে দেব।

মহিলার পেছন পেছন চায়ের দোকানের পেছনে একটা গলিতে এসেই মনে হল একটা গোলক ধাঁধায় এসে পড়েছি। একা একা হয়ত আবার ফিরতেও পারব না এই পথে। গলির মোড় ঘুরে একটা ভাঙ্গা তেতালা বাড়ির দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই অবাক। সারি সারি বাঁশের ঘর আর ঘরের দরজায় বসে একটি করে মেয়ে। তাদের বেশভূষায় মনে হল, তাদের কেউ ভারতীয়, কেউ বর্মী, কেউ বা মালয়ী।

সোলেমান বলল, কোয়েটায় পালিয়েছিলি, এবার পালান মুস্কিল।

আমি বললাম, তারপর তিনটে বছর কেটে গেছে।

মাংলে বলল, চল, দেখাই যাক। হাতিয়ার আছে সঙ্গে।

মহিলাটি এগিয়ে চলেছে। শেষ ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকল, বাঈ, তোমার জলসার ব্যবস্থা হয়েছে কি ?

হাঁ।

এইসব ভদ্রলোক এসেছে তোমার গান শুনতে। বসতে দাও। চল তোমরা। কোন কষ্ট হবে না। তোমরা খুশী হলে তবেই তো আমার দোকান চলবে। তোমাদের খুশী কবতেই এতগুলো ঘর ভাড়া করে রেখেছি।

আমাদের ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে মহিলা ফিরে গেল।

বেশ প্রশস্ত ঘর। মেঝেতে শতরঞ্জ পাতা। শতরঞ্জের ওপর রয়েছে একটা ছোট হারমোনিয়াম। দেওয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে বাঈ।

আসন গ্রহণ করুন, বস্থন, বলে আপ্যায়ন করতেই আমরা বসে পড়লাম।

স্রেফ গানা ? জিজ্ঞেস করল বাঈ।

পহেলা···

কুছ খানাপিনাকা বন্দোবস্ত হোগা কি নেহি ?

জরুর।

কিছুক্ষণের মধ্যেই খাবার এল, গরম চাও এল। সঙ্গে এল বিল। বিলের টাকা দিয়ে সোলেমান বলল, গান আরম্ভ কর।

আমার সঙ্গীরা আসছে, একটু অপেক্ষা করুন।

সোলেমান অধৈর্য হয়ে উঠছিল। বাঈ তাকে ডেকে নিয়ে গেল পাশের ঘরে। সেখানে তাকে বসিয়ে দিয়ে ফিরে এসে বলল, সবাই আসবে এখুনি। ওরা নাচবে, আমি গান গাইব। নাচের পোষাক পরছে সবাই।

আমরা ধৈর্য ধরে বসে রইলাম।

নর্তকীর দল এল। দলে তিনজন।

নাচ স্নুরু হবার আগেই জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের সাথী সোলেমান কোথায়?

থোরা পিতা হ্যায়।

সোলেমান মদের বোতল নিয়ে বসেছে। সর্বনাশ! তা হলে আর ওকে সহজে ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

সোলেমানকে ডাকা হল নাচের আসরে।

আপলোক পিওগে? প্রশ্ন করল বাঈ।

মাংলে সঙ্গে সঙ্গে বলল, নিশ্চয়। ব্যবস্থা কর বাঈ।

চক্ষু লজ্জার বালাই কেটে গেল।

নাচের কথা আর মনে রইল না।

বোতল নিয়ে গোল হয়ে বসলাম সবাই।

চারজনের পাশে চারজন মেয়ে, গেলাস তুলে দিচ্ছে হাতে!

তারপরের ঘটনা জনসমাজে বলার মত নয়। সে রাতের জলসায় কেউ আর নাচেনি, কেউ গানও করেনি। যা নাচুনি তা ছিল আমাদের! আর কারও নয়।

রাতের বেলায় যখন ফিরলাম তখন পকেটে কারও একটিও পয়সা ছিল না। টলতে টলতে ব্যারাকে ফিরেছিলাম সবাই।

সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই সোলেমান বলল, তোফা কেটেছে কালকের রাত।

আমি এতদিন সবাইকে নীতিকথা শুনিয়ে এসেছি অথচ সেদ্দিন নিজেকে কেন যে সংযত করতে পারলাম না, তা ভেবে পাচ্ছিলাম না। উচ্ছৃঙ্খলতার চরম সাক্ষ্য রেখে এলাম সেই সাজানো বেশ্যাপল্লীতে। আশ্চর্য!

সারাদিন ঘর থেকে বেরুতে পারলাম না। আত্মগ্লানিতে নিজেই পুড়ে মরছিলাম! যদি ও পথে না যেতাম, যদি সোলেমানকে না বলতাম, যদি গান বাজনার নামে না মেতে উঠতাম! সবই 'যদি'। অথচ ওই যদি এড়িয়ে সব কুকার্যই করে এসেছি আমরা! এর চেয়ে লজ্জার কিছু আছে কি!

মাংলে কিন্তু সজাগ ছিল আগাগোড়াই। সেই বলেছিল সে দিনের ঘটনা, বিস্মৃত দৃশ্যগুলো সেই আমাকে সবিস্তারে বর্ণনা করে শুনিয়েছিল পরে। মেয়েরা যে খুবই হুঁসিয়ার তাও বলেছিল। নটা না বাজতেই তারা আমাদের রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে আরেক দলকে সেখানে ডেকে নিয়েছিল। সব কিছু শুনে কেমন হতবাক্ হয়ে গেলাম।

আমার পতনের ওটা প্রথম পদক্ষেপ!

সতর্ক হতে চেয়েছি সেদিন থেকেই কিন্তু আর সতর্ক থাকতে পারিনি। নারী মাংসের ওপর বোধহয় নেশা জন্মেছিল মনের অবচেতন কোনে।

সিঙ্গাপুরের জীবনও শেষ হয়ে এল একদিন।

জাহাজের ভোঁ বাজল আবার।

ভোঁ বাজার আগেই শুনলাম, নররক্তে ভাসছে সেদিনের কলকাতা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত হয়েছে শহরটা। মানুষের জীবনে এসেছে অনিশ্চিতি।

জগন্নাথকে মনে মনে খুঁজছিলাম।

সেই বলেছিল, ভারতবর্ষের উন্নতি তখনই সম্ভব যখন হিন্দু-মুসলমান একমত হয়ে কাজ করবে। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন উন্নতির কোন আশা নেই।

আমি বলেছিলাম, মুসলমানদের বিশ্বাস নেই কোন।

না। তার কারণ তারা মুসলমান বলেই নয়। ধর্মীয় ও কৃষ্টিগত পার্থক্য মুছে ফেলার চেষ্টা হিন্দুও করেনি, মুসলমানও করেনি। তাই পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারছিনা আমরা।

কি করে তা হবে?

সম্ভব ছিল, কিন্তু হওয়া খুব কঠিন। হিন্দু মেয়েদের বিয়ে করেছে মুসলমানরা কিন্তু কোন মুসলমান্ মেয়ে বিয়ে করতে চায়নি কোন হিন্দু। সামাজিক বন্ধন যদি সৃষ্টি হত, তা হলে এই দাঙ্গা হাঙ্গামা কখনও হত না।

হেসে বললাম, পাগলের মত কথা বলছ জগন্নাথ। মুসলমান মেয়েদের বিয়ে করলে হাঙ্গামা আরও বাড়বে। ধর্ম্মান্ধ হিন্দু-মুসলমান আরও বেশি গোলমাল করবে।

জগন্নাথ ক্ষুণ্ণভাবে বলেছিল, আমার বিশ্বাস ও তোমার বিশ্বাস আলাদা।

জগন্নাথ হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের কথা চিন্তা করেছে, কিন্তু ঐক্যের পথে যে সব অন্তরায় তা চিন্তা করেনি। আজ যখন শুনলাম কলকাতায় দাঙ্গা তখন জগন্নাথকেই মনে মনে খুঁজেছি। ঐক্যবোধের প্রাচীরে যে বিরাট ফাটল তা রোধ করার মত পরামর্শ ও যুক্তি তার পক্ষেই দেওয়া সম্ভব ছিল।

ভোঁ বাজল জাহাজের।

তল্পীতল্পা নিয়ে উঠে বসলাম জাহাজে। সবাইয়ের খুশী খুশী মন। কত বছর পর দেশে ফিরছে! কিন্তু সবাই কি ফিরেছিল সেদিন!

কতজনাই তো রয়ে গেছে পেছনে। কতজনের ছিন্নভিন্ন দেহ কুকুর শেয়ালে খেয়েছে। কতজন অজ্ঞাত রয়ে গেছে সামরিক

বাহিনীর খাতায়। যারা ফিরতে পারেনি তাদের জন্য পথ তাকিয়ে থাকবে তাদের প্রিয়জন। তাদের বেদনা জানাবার ভাষা, তাদের বেদনায় সহানুভূতি জানাবার মানুষ কজন আছে তাও জানিনা!

ডেকে শতরঞ্জ পেতে সটান শুয়ে পড়লাম।

জাহাজ পৌঁছতে আরও আট দশদিন। এ কদিন জাহাজের খোলে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম!

রাতের বেলায় ঘুম আসত না চোখে। জাহাজের ব্রীজে গিয়ে বসতাম। জাহাজের গতি অতি ধীর। তখনও সমুদ্রপথ বিপদমুক্ত নয়। তাই সতর্কভাবে চলছে জাহাজ। আমরাও মনে আতঙ্ক নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি জমাচ্ছি।

আজ মনে পড়ছে মেনিমাসীর কথা। জাহাজ থেকে নেমে ব্যারাক, ব্যারাক থেকে ছুটির মঞ্জুরী নিয়ে যাব মেনিমাসীর কাছে। কে জানে মেনিমাসী বেঁচে আছে কিনা! হিসাব করে দেখলাম চার বছর পেরিয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।

মেনিমাসী চিনতে পারবে কি! নিশ্চয় চিনতে পারবে।

আমার সামনে এসে বসত একজন ক্যাপটেন। মদ খেয়ে টলতে টলতে আসত। প্রথম দিন আমাকে দেখে বলেছিল, এই সেপাই এখানে কি করছ?

আমি উঠে সেলাম দিয়ে বলেছিলাম, সেপাই নই, আমি নায়েক।

ও আচ্ছা। এখানে কি করছ?

বললাম, সমুদ্র দেখছি।

হোয়াট্। হোয়াট্। সমুদ্র দেখছ। তোমার সখ আছে দেখছি। রেনিকে দেখেছ।

না সাব্।

ডেভিল। রাতে আমার সঙ্গে নাচে। নাচের পর তাকে আর খুঁজে পাই না। খুঁজে বের করতো মাগীটাকে। তিন হাজার টাকা নিয়েছে আমার।

ক্যাপটেন অপ্রকৃতিস্থ।

বললাম, এখুনি খুঁজে আনছি সাব।

কোনরকমে তার চোখের সামনে থেকে পালিয়ে বাঁচলাম।

পরের দিন ক্যাপটেন আবার এসেছিল। আজ তাকে মাতাল মনে হল না। আজও জিজ্ঞেস করল, কি দেখছ?

বললাম, সমুদ্র।

সত্যিই এই চাঁদিনী রাতে সমুদ্র দেখার মতই বস্তু। আর কখনও এভাবে সমুদ্র পাড়ি দিতে পারব কিনা জানিনা, কিন্তু এবার যা দেখলাম তা আর ভুলবার নয়।

ক্যাপটেন চুপ করে গেল।

আমিও আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ পর ক্যাপটেন আবার বলল, জানতো, তোমাদের বরখাস্ত করবে ভারতে পৌঁছেই।

জানি সাব্।

কাজ কিছু করতে চাও নিশ্চয়ই। তখন আমার সঙ্গে দেখা করবে। আমার নামটা মনে রেখ, কুমারজি হিম্মতসিংহজী। সোজা চলে যাবে রাজকোটে। সেখানে হিম্মতসিংহজী মনিলালজির ফার্মে এস। কেমন!

জি সাব্।

ক্যাপটেন চুপ করে কি যেন ভাবছিল।

বললাম, সাহেব তো পাকা চাকরি করেন।

না, না। আমিও এমারজেন্সী কমিশনের লোক। বুঝলে। আমার চাকরিও নট্।

নিজে নিজেই হেসে উঠল কুমারজি।

আমি মুখ নীচু করে বসে রইলাম।

জাহাজ চলছে। আমি আকাশের দিকে চেয়ে বসে রয়েছি। কখন যে ক্যাপটেন কুমারজি উঠে গেছে টেরও পাই নি।

মেনকাদিদির কথা মনে হচ্ছে বার বার। তার কাছে যাবার প্রবল বাসনা। কোথায় আছে তাও জানিনা। হঠাৎ গিয়ে হাজির হলে চমকে উঠবে নিশ্চয়ই। গিয়ে বলব, দিদি আপনার দয়াতেই বেঁচে আছি।

বেঁচে আছি কি ?

নিজের কাছে বার বার সেই প্রশ্নই করেছি, সঠিক উত্তর খুঁজে পাইনি।

জাহাজ চলছে।

কোথাও থামছে না। দিনের পর দিন চলতে চলতে সাগর দ্বীপের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল।

নদীতে জল কম। জোয়ার আসলে ঢুকবে বন্দরে।

পরদিন সকালে জাহাজ ভিড়ল কিং জর্জেস ডকে।

তিন

ব্যারাক থেকে ফৌজী উর্দী পড়ে বের হয়েছিলাম।

লাহাবাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়াতে হল। পথঘাট জনশূন্য, কলকাতা শহর তখনও অশান্ত। ভীতির রাজ্য। পথ জনশূন্য হওয়ার কারণ বুঝতে পারলাম। সামনের পার্কেও ভীড় নেই, বলতে গেলে কোন লোকই নেই। এই নির্জনতায় আমার মনটাও ছমছম করে উঠল।

লাহাবাড়ির সদর দরজায় তালা ঝুলছে।

মিঠু দারোয়ানকে তার সেই পুরানো জায়গায় দেখা গেল না।

অদ্ভুত মনে হল এই অবস্থাকে। যে লাহাবাড়ির সদর সর্বদা থাকত কর্ম চঞ্চল। জন সমাগমে গমগম করত বৈঠকখানা। সেখানে একটি লোকও নেই। অতবড় বাড়িটা একদম জনহীন!

গেল কোথায় সব লোকজন।

গিরীনবাবু, বড়খোকা, ছোটখোকা, ছোটখুকী, গিন্নিমা কারও কোন হদিস নেই। চিন্তিতভাবে এগিয়ে গেলাম মোড়ের পানের দোকানে। আগের সেই পানওলা নেই। একজন বৃদ্ধ বসে আছে পানওলার জায়গায়। চার বছরে যে সব পরিবর্তন ঘটেছে তা আমার পক্ষে ছিল অকল্পনীয়।

পান সাজতে বলে পানওলাকে জিজ্ঞেস করলাম, লাহাবাড়ির বাবুরা কোথায় গেছে জান তুমি?

আমার প্রশ্নে অবাক হয়ে পানওলা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কিছুই জাননা?

না। আমি এদেশে ছিলাম না। নতুন এসেছি চার বছর পরে।

ওরা চলে গেছে। লাহাবাড়ির পেছনে মুসলমান বস্তী। বস্তীর

মুসলমানরা আক্রমণ করেছিল লাহাবাড়ি। সবাই বাগবাজারে বাসা ভাড়া করে আছে। বাড়ি বন্ধ।

পেছনের বস্তীতে লাহাবাবুরাই প্রজা বসিয়েছিল। সরকার মশায় খাজনা আর ভাড়া আদায় করত। এই বস্তির আয়ে লাহা-বাড়ির সারা বছরের খরচ উঠে আসত। ছোটবেলায় বস্তীর অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়িয়েছি। তখন ছিল লাহাবাবুদের প্রচণ্ড প্রভাব আর প্রতিপত্তি। ধর্মভীরু শান্ত নিরীহ লোকের সংখ্যা ছিল বেশি। কেউ ফলওলা, কেউ ফেরীওলা, কেউ বিড়ি বাঁধত। তাদের ছিল শান্ত জীবন, ততোধিক শান্ত ছিল পরিবেশ। কোন সময় হাঙ্গামা যে না হত এমন নয়। হাঙ্গামা হলে মিঠু দারোয়ান মীমাংসা করে দিত। মিঠু অপারগ হলে লাহাবাবুদের সদরে তার নালিশ হত। লাহাবাবুদের বিচার ব্যবস্থা মেনে নিত সবাই।

বাগবাজারে বাসা ভাড়া করে থাকার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। লাহাবাবুদের কলকাতা শহরে কম পক্ষেও তিরিশখানা বড় বড় বাড়ি রয়েছে। বাড়ির ভাড়াই লাহাবাবুদের সবচেয়ে বড় আয়ের পথ। আর তা থেকে যা উদ্বৃত্ত থাকে তা দিয়ে প্রতি বছরই নতুন সম্পত্তি খরিদ করে লাহা পরিবার। এত বড় সম্পত্তির যারা মালিক তাদেরও বাড়ি ভাড়া করে থাকতে হয়, শুনলে মন খারাপ লাগে। অবশ্যই কোন বিশেষ কারণে তাদের যেতে হয়েছে। এই পরিবারের সঙ্গে চার পাঁচ বছর ঘনিষ্টভাবে বাস করেছি তাই দুঃখবোধ স্বাভাবিক।

পানওলাকে বললাম, তাদের ঠিকানা জান?

না বাবু। ঐ মুদীর দোকানে খবর করুন। ওরা জানে। ঐ মোকামটাও তো লাহাবাবুদের। ওরা ভাড়া দেয়, নিশ্চয়ই বাসার ঠিকানা জানে।

পানের দোকান থেকে মুদির দোকানে হাজির হলাম। সবিনয়ে

সাহাবাবুদের বর্তমান ঠিকানা জানতে চাইলাম। ঠিকানা জানা থাকলেও বাড়ির নম্বর দিতে হল খুঁজে পেতে।

আজ বেলা বেড়ে গেছে। বাগবাজারে বাড়ি খোঁজার চেয়ে মেনিমাসীর সঙ্গে দেখা করে আসতে পারলে ভাল হত!

চললাম নয়নতারার গলি খুঁজতে।

গলির মুখে বেশ ভীড়।

লোকে বলাবলি করছে তিন নম্বর বাসে য়্যাসিড মেরেছে রাজা-বাজারে। তালতলায় মুসলমানরা সকালে তিনটে উড়েকে মেরেছে। বক্তাকে ঘিরে ধরে সংবাদ শুনছে বস্তীর লোকেরা। তাদের চোখে মুখেও উত্তেজনার চিহ্ন। সবাই শুনতে চায় কটা মুসলমান মেরেছে হিন্দুরা। কিন্তু বক্তা তাদের নিরাশ করলেও তাদের উত্তেজনা কমে না।

পাশ কাটিয়ে নয়নতারার গলির ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

বস্তির মুখেই জেনে নিলাম মেনিমাসীর খবর। আমার ফৌজী উর্দী অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তারা সাগ্রহেই আমার প্রশ্নের জবাব দিল। তারাই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল মেনিমাসীর ঘরে।

দরজায় দাঁড়িয়ে বললাম, মাসী আমি এসেছি।

কে?

আমি নির্মল।

মেনিমাসী দরজা খুলে সামনে দাঁড়াল। চার বছরে মেনিমাসীর কোন পরিবর্তন হয়নি। আগের চেয়ে দেখতে আরও সুন্দর হয়েছে। আরও বেশি উজ্জ্বলতা দেখা দিয়েছে গায়ের রং-এ। আমাকে দেখেই এগিয়ে এসে হাত ধরল, বাপরে! তাহলে ফিরে এসেছিস তুই! বস নিমু। তোর জন্য কত যে ভাবনা তা আর বুঝিয়ে বলা যায় না।

আমাকে বসিয়ে মেনিমাসী খাবারের জোগাড় করছিল। বললাম, তোমার ধান দুর্বার খুব জোর আছে মাসী। নইলে বেঁচে

ফিরতে পারতাম না। যে যুদ্ধ, কে শত্রু কে মিত্র জানিনা, চোখেও দেখা যায় না শত্রুকে অথচ তারা মরছে গুলী খেয়ে।

মেনিমাসী মুখ ফেরাতেই দেখলাম তার সজল চোখ ছুটো। কত পরিতৃপ্তি ও আনন্দের সে অশ্রু!

বললাম, তুমিই তো আমার সত্যিকারের মা। তোমার আশীর্বাদ না পেলে এতটা এগোতেই পারতাম না। নিরুপিসীর খবর কি! ভাল আছে তো?

আছে।

অমনভাবে উত্তর দিচ্ছ কেন!

নিরুর বড়ই কষ্ট। রামখেলাওন পালিয়েছে রে। বেশি বয়সে আমাদের এই রকম হয়। ছুবেলা আমার কাছেই খায়। বছর গেলে ছুখানা কাপড়ও দিতে হয়। তবে ভালই আছে। তোর খোঁজ করেছিল। বলেছিলাম যুদ্ধে গেছে। চিঠি পেয়েছি, ভালই আছে। নিরু কোন উত্তর দেয়নি। ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে চুপ করে ছিল। আজ কিন্তু এখন যেতে পাবি না, খেয়ে দেয়ে যাবি। তোর ছুটি কবে হবে রে নিমু?

ছুটি শীগগীরই হবে মাসী। সে কথাই ভাবছি। এতদিন তো রাজার হালে ছিলাম। এবার শুকনো রুটি জোটানও দায় হবে। ছুটি মানেই রুটিতে টান। আবার সেই নিমু চাকর।

ওকথা ভাবিসনা। মরদ জোয়ান ছেলে। বয়সই বা কত, বাইশ তেইশ। আরও জীবন তো পড়েই আছে। দেখে শুনে করে কম্মে বেশ খেতে পারবি।

অনিল মেসোর খবর কি মাসী।

মেনিমাসী চুপ করে গেল।

কথা বলছ না কেন?

সে আর নেই।

মানে মারা গেছে?

না মরেনি। সে আর আসে না।

তোমার দোকান?

তাকেই বিক্রি করে দিয়েছি। বড়ই জুলুম করছিল অংশটুকু লিখে দিতে। বললাম, তা হবে না। তোমাদের বিশ্বাস নেই। ঐ তো নিরুকে দেখছি। তা হবে না বাপু। অনিল তখন নানা অছিলায় আমার সঙ্গে কোঁদল সুরু করল। এই মতান্তর, তারপর মনান্তর। সবাই বলল আদালত কর মেনি। বললাম, যার ঘর করলাম সতের বছর তার সঙ্গে মামলা করা ভাল নয়। অনিলের সুবুদ্ধি হল, বলল, হয় তুমি না হয় আমি দোকানটা কিনে নেব। বললাম, তুমি নাও। তারপর দামদর ঠিক করে অনিল কিনে নিল। হাঙ্গামা চুকে গেছে রে নিমু। অনিলও গেছে, দোকানও গেছে। দিয়েছিলাম চার হাজার টাকা। সতের বছর তার সুদ খেয়েছি, নগদ পেয়েছি এগার হাজার। আর দুঃখ কিসের!

দুঃখ যে অনেক তা বুঝতে পারলাম তার রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে। অনিলকে হারিয়ে দুঃখ পেয়েছে, না দোকান হারিয়ে তা বলা কঠিন, তবে মেনিমাসীর দুঃখ ছিল মনের কোনে চাপা।

মাদুর পেতে দিল মেনিমাসী

বলল, তুই বিশ্রাম কর। আমি রান্নাটা সেরে নি।

বললাম, আমার কাছে বসে রান্না কর। কাজ করবে সঙ্গে সঙ্গে গল্পও করবে।

মেনিমাসী রান্না করতে করতে জিজ্ঞেস করল, তোর মেনকাদিদির খবর কি?

মেনকাদিদির খোঁজে গিয়েছিলাম। লাহাবাবু বাড়ি ছেড়ে বাগবাজারে গেছে। মুসলমানরা নাকি তাদের বাড়ি লুঠ করতে এসেছিল।

সর্বনাশ! তুই তো ছিলি না। কি যে সর্বনাশ হয়ে গেছে। বাপ্‌রে। কত লোক যে মরেছে তারও ঠিক নেই। কাটা-

কাটি আর মারামারি। আমরা যে বেঁচে আছি তা ভগবানের দয়া।

কেন এমন হল মাসী?

কিছুই জানিসনা তুই। ওরে বাপরে। পাকিস্তান না কি একটা যেন চাই। তাই পাকিস্তান কায়েম করতে মুসলমানরা ক্ষেপে গেছে।

ক্ষেপেছে তো ভালই। তারা ইংরেজের কাছে আদায় করুক পাকিস্তান। হিন্দুদের ওপর হামলা করছে কেন?

তা জানিনা বাপু। শহরটা পুড়িয়ে দিল। কত দোকানপাট লুঠ করল। কত মানুষ মারল। আহারে! ভগবান এদের ভাল করবে না। দেখিস ওদের ভাল হবে না।

হেসে বললাম, সে তো পরের কথা। এখনও তো মানুষ মারছে। আর রোজই তা ঘটছে। আটমাস ধরে এই হাঙ্গামা চলছে অথচ কোম প্রতিকার কেউ করছে না কেন?

কি জানি বাপু। আমরা তো ভয়েই মরছি। এখনই যা অবস্থা! পাকিস্তান হলে সবাইকে জবাই না করে ছাড়বে না নিশ্চয়। কিরে মণ্টু, মাছ পেলি?

দরজার বাইরে থেকে মণ্টু বলল, পেয়েছি মাসী। ভাগ্যি তাড়াতাড়ি এসেছি। উঃ কি বোমা ফাটছে বাজারের কাছে। দৌড়ে পালিয়ে এসেছি।

দেখিস নি কিছু?

দেখব! কি বলছ মাসী। পালাতে পারলে বাঁচি। মুখ ফেরানো অত সহজ নয়!

তারপরই ফিস্ ফিস্ করে বলল অবার, আমাদের নেরু।

নেরু! কি করেছে নেরু?

নেরু আর অজিত বোমা ফাটিয়েছে। মোছলমানদের ওপর বোমা মেরেছে শেয়ালদাতে। কলেজের পাশ দিয়ে পালিয়ে গেছে, ধরতে পারেনি।

তুই যে বললি কিছু দেখিনি।

বোমা ফাটার পর আর কিছু দেখিনি।

মাছের থলেটা রেখে মণ্টু ফিরে গেল। মেনিমাসী গজর গজর করতে লাগল, কি যে হয়েছে আজকাল! দেখ দিকি! নেরুটা ভাল ছেলে বলেই জানি। গরীবের ছেলে, দলে পড়েই নষ্ট হল। আরে বাপু, এখন যদি এভাবে রাশ ছেড়ে দাও তা হলে আর তাকে বাগে আনতে পারবে না। একবার যদি মানুষ বেয়াড়া হয় তাকে আর ভদ্র করা যায় না।

বললাম, কত নেরু যে সৃষ্টি হয়েছে কে জানে!

এরপর আমাদের ওপর হামলা করবে ওরা। যতদিন লুটেপুটে খাবে ততদিন নজর অন্যদিকে থাকবে না। চিরকাল তো মোছলমানেরটা লুটেপুটে খেতে পাবে না, তখনও কিন্তু হাত সুড়সুড় করবে। মরতে মরণ ঘটবে তখন আমাদের মত গরীব গোবরার।

অত ভেবনা মাসী। ভালমন্দ নিয়েই তো থাকতে হবে। বৃথা কেন অন্যের জন্য মাথা ঘামাচ্ছ।

রান্না শেষ করে একখানা শাড়ি এগিয়ে দিয়ে মাসী বলল, বারটার জল বোধহয় এসেছে। তুই চান করে আয় নিমু। শাড়িখানা পরে চান করিস।

সরষের তেল এগিয়ে দিল মেনিমাসী। আমিও তেল মেখে স্নানে গেলাম।

ভাল করে দেখলাম গোটা বাড়িটা। কোথাও বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। সবই সেই রকম আছে। আগের ভাড়াটিয়া প্রায়ই নেই। যারা আছে তাদের কাছে আমি অপরিচিত। আজ পরিচয় করার কোন আগ্রহ ছিল না। কোন রকমে স্নান শেষ করে উঠে এলাম মেনিমাসীর ঘরে। মেনিমাসী থালায় ভাত বেড়ে নিয়ে অপেক্ষা করছিল।

খেতে বস নিমু। তোর খাওয়া হলে আমি যাব নাইতে। শীতের বেলা, দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। গল্প করব রাতের বেলায়।

খেতে খেতে বললাম, রাতের বেলায় থাকতে পারব না মাসী। সন্ধ্যার আগেই ব্যারাকে ফিরতে হবে। মিলিটারীর নিয়মকানুন বড় কড়া। না ফিরলে কয়েদ করবে, বিচার হবে। সে নানা ফ্যাসাদ, অত তুমি বুঝবে না। কাল সকালে একবার মেনকাদিদির খোঁজে যাব। তারপর তোমার কাছে এসে সারাদিন কাটাব।

সন্ধ্যাবেলায় ফিরে এলাম ব্যারাকে।

এলেনবেরী মাঠে তাঁবু। ওপারে খিদিরপুর। মুসলমান বস্তী সেখানে। ওখানে যাওয়া নিষেধ আমাদের। কোন হাঙ্গামা হলে আমরা জড়িয়ে পড়তে পারি। তাই ব্রিজ অতিক্রম করে যাওয়া মানা।

আমাদের জন্য উন্মুক্ত ময়দানের পথ।

সোলেমানকে সঙ্গে নিয়ে পরদিন বের হলাম খুব সকালে। সোলেমান জানে কলকাতার অবস্থা। কলকাতার পথঘাট তার চেনা নেই বলে সঙ্গে নিয়েছিলাম। উত্তরদিকে শুধু বাস চলছিল, দক্ষিণের বাস ও ট্রাম দুটোই সচল। ব্যস্ততা সর্বত্র। কোথাও কোন হিংসার চিহ্ন নেই। আমরা পায়ে হেঁটে চলেছি। যাবার আগে সোলেমান পকেটে নিয়েছিল সামরিক পিস্তল, আমিও নিয়েছিলাম রিভলবার। আত্মরক্ষার তাগিদ ছিল দুজনেরই, অথচ বেড়াবার সখও ছিল খুব। বিপদ মাথায় করেই চলছিলাম।

সোলেমান যে উগ্র মুসলমান তা সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম।

পথে নেমেই বলল, একটা আখবার কোথায় পাব বলতে পার?

বললাম, চৌরঙ্গীতে উর্দু খবরের কাগজ বিক্রি হয়, সেখানে খুঁজে দেখতে হবে।

আগ্রহ নীল সোলেমান চৌরঙ্গী পৌঁছে তাগাদা দিতে থাকে। খুঁজে পেতে আল্‌ হিলালের একটি সংখ্যা সংগ্রহ করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়তে লাগল সোলেমান। কিছুটা পড়েই বলল, তাজ্জব কি বাত!

বললাম, কি তাজ্জব?

তোমাদের এই শহরে মুসলমানকে কোতল করা হচ্ছে আর তারা ভেগে যাচ্ছে। লাহোর হলে বুঝতে পারতে, মুসলমান হল শেরকা বাচ্চা বাদশাহকা জাত!

হেসে বললাম, শের এখন চুহা হয়েছে, তাই বুঝি দুঃখ পাচ্ছ?

না না, খুনকা বদলা খুন চাহি।

একথা হিন্দুরাও তো বলতে পারে।

নিশ্চয়।

তা হলে যে বছরের পর বছর রক্তে লাল হয়ে থাকবে ভারতের জমিন। মানুষের কাজকর্ম, ব্যবসা বাণিজ্য, চাষবাস সব বন্ধ হয়ে যাবে। শুধু চলবে রক্তের খেলা।

সোলেমান আমাব নীতিবাচক কথায় নেতিবাচক উত্তর দিয়ে বলল, ঠিক কথা, তবুও দুশমনকে খতম কবা হল মুসলমানের ধর্ম।

তোমাদের দুশমন কে?

হিন্দুরা।

তা হলে আমিও তোমার দুশমন।

নেহি নেহি, হাম আউর তুম তো মিলটারী হ্যায়।

গম্ভীরভাবে বললাম, আমবা যদি চাকরি জীবনে এক হয়ে বাস করতে পারি তা হলে সমাজজীবনে দুশমন কেন হব বলতে পার?

সোলেমান কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে বলল, ওসব কথা ছেড়ে দাও ইয়ার।

তুমিই তো বললে। তবে কি আজ থেকে তোমাকেও বিশ্বাস করতে পারব না!

কাহে। কাহে একিন নেহি।

তুমি নিজেকে মুসলমান মনে কর আর আমি মনে করি হিন্দু। দু'জনে মনে মনে শত্রু। কিন্তু ইরাবতী নদীর ধারে যখন জাপানী গোলা আসছিল তখন নিশ্চয়ই তা তোমাকে অথবা আমাকে হিন্দু অথবা মুসলমান বলে রেয়াত করত না। নয় কি? গুলী লাগলে তোমার রক্ত আর আমার রক্ত দুটো আলাদা রঙের হত না নিশ্চয়ই।

সোলেমান লজ্জিত হল না অথবা যুক্তি[illegible]ও করল না। খবরের কাগজখানা ভাঁজ করে প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে চলতে লাগল পূবদিকে।

চলতে চলতে বললাম, আমরা হিন্দু পাড়া দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের পোষাক আমাদের পরিচয়। এখানে হিন্দু-মুসলমান স্থির করা সম্ভব নয়। তাই আমরা নিরাপদ।

সোলেমান পিস্তলটা চেপে ধরে চলতে লাগল।

বললাম, পিস্তল দিয়ে ক'জনকে আটক কববে। গুলী ফুরিয়ে যাবে তখন চারদিক থেকে ছেঁকে ধরে তোমাকে পিটিয়ে মারতে পারে।

সোলেমান মৃদু হেসে হাত গুটিয়ে আবার চলতে থাকে।

জোড়া গির্জার সামনে এসে বললাম, এটা মুসলমান এলাকা। এখানে হিন্দুরা নিরাপদ নয়, আমিও নই।

সোলেমান অনেকক্ষণ পর বলল, আমি থাকতে তোমার কোন ভয় নেই।

বললাম, ভয় আমার কোনদিনই ছিল না, এখনও নেই। তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, এভাবে পাশাপাশি যারা বাস করে তাদের পক্ষে দাঙ্গাহাঙ্গামা আত্মহত্যার সামিল নয় কি! এতে লাভবান হচ্ছে কারা?

এতক্ষণে বোধহয় সোলেমান বুঝল আমার কথা।

বলল, সেই কথাই ভাবছি এতক্ষণ। রক্ত দিয়ে রক্তের সমস্যা শেষ হয় কি কখনও!

বললাম, যদি কোন জনগণের মঙ্গলের আদর্শে মানুষ রক্তপাত ঘটাত তা হলে হয়ত তা সহ্য করা যেত। একদেশে বাস করি, এক ভাষায় কথা বলি, একই খাদ্য আমাদের, অথচ ধর্মের নামে আমরা অধর্ম করি, তাতে কোন আদর্শ নেই, কোন বড় কাজও হয় না।

লাহোরের টাঙ্গাওলা সোলেমান খাঁয়ের সঙ্গে ন্যায়নীতির আলোচনা নিরর্থক। যুক্তির সারবত্তা গ্রহণ করার সামর্থ্য তার নেই। সাম্প্রদায়িক উগ্রতা ফৌজী তাঁবুতে প্রকাশ না পেলেও প্রচ্ছন্নভাবে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তার কথাবার্তায় ও কার্যকলাপে।

শেয়ালদার মোড় ঘুরে কলেজষ্ট্রীট অবধি পৌঁছবার আগেই থামতে হল।

পথচারীর চোখেমুখে সন্ত্রাস, প্রশ্ন শুধু কে লোকটা।

চোরাগোপ্তা এই হত্যাকাণ্ডে, কাপুরুষের এই জঘন্য কাজের বলি হিন্দু অথবা মুসলমান তাই জানার আগ্রহ সাধারণ মানুষের মুখে চোখে। যারা মৃত্যুকে আশ্রয় করে বিশ্রামলাভ করছে তাদের হিসাব হচ্ছে হিন্দু অথবা মুসলমানে। অপর সম্প্রদায়ের মানুষ হলে মুখে আনন্দের রেখা ফুটে ওঠে, নিজের সম্প্রদায়ের হলে উত্তেজিত হয়।

সোলেমান জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে সাথী।

বললাম, কোন পথিক নিহত হয়েছে গুপ্তঘাতকের ছুরিতে।

লড়াই না করেই?

কার সঙ্গে লড়াই করবে?—শত্রু হল অজ্ঞাত, আসে শ্বাপদের মত নিঃশব্দে, সরীসৃপের মত হিংস্র ও পলায়ন তৎপর সে। তার সঙ্গে লড়াই কে করবে!

তা হলে ওরা মরদ নয়, কাপুরুষ। লাহোরে এসব নেই। সামনে দাঁড়াও, লড়াই কর।

হাসলাম।

সোলেমানকে নিয়ে গলিপথে চলতে থাকি।

ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে গেছে।

হাঁটতে হাঁটতে চলেছি।

কিছুটা পথ চলার পর আবার কর্মব্যস্ত শহর। জনসাধারণের চোখে মুখে শুধু জিজ্ঞাসা। কি হয়েছে মশায়! কোথায়! ক'জন মরল! ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাগবাজারের ছোট গলিতে খুঁজে বের করলাম গিরীনবাবুর বাড়ি।

দরজায় বসে মিঠু দারোয়ান।

ক'বছরে তার দেহের বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে, চুলগুলো বেশ সাদা, সামনের কটা দাঁত স্থানচ্যুত। চিনতে তবুও কষ্ট হয়নি। ডেকে বললাম, মিঠুদা কেমন আছ?

মিঠু আমাকে চিনতে পারেনি, অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, ওহো, নিমু! চিনতে পারিনি ভাই। শুনেছিলাম তুমি ফৌজে আছ। তা ভালই। কোথায় আছ?

কলকাতায় আছি। তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলাম। কর্তাবাবু কোথায়?

কর্তাবাবু আছে, তবে সে কর্তাবাবু আর নেই। বড়ই রোগা আর বুড়ো হয়ে গেছে। দেখা করবে?

হাঁ।

একটু বস বৈঠকখানায়। আমি খবর দিচ্ছি।

এ বাড়ি কার মিঠুদা?

কর্তাবাবুরই বাড়ি। ওপাড়ায় হাঙ্গামা হওয়াতে কর্তাবাবু এখানে উঠে এসেছেন। এটা ছিল ভাড়াটের বাড়ি। লড়াইয়ের সময় বাড়ি খালি হওয়াতে সহজেই আসতে পেরেছি।

বলতে বলতে মিঠু ভেতরে গেল খবর দিতে।

কিছুক্ষণ বাদেই এসে ডাকল আমাকে। সোলেমানকে সঙ্গে করেই ঢুকলাম গিরীনবাবুর বৈঠকখানায়। আমাদের পোষাক দেখে গিরীনবাবু যেন চমকে উঠল। ডাকল, মিঠু।

মিঠু ছুটে এসে দাঁড়াল সামনে।

নিমুকে ডাক।

আমি নিমু, বলে এগিয়ে গেলাম।

তুমি নিমু! বেঁচে থাক বাবা। চিনতে পারিনি। তোমাদের উর্দী দেখে ঘাবড়ে গেছি। বুঝতেই তো পারছ কি সময় কাল পড়েছে! তা ভাল আছ তো?

আজ্ঞে হাঁ। অনেকদিন পর দেশে এসেছি, আপনার চরণ দর্শন করতে এলাম। আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন বাল্যকালে, সেকথা ভুলতে পারিনি।

গিরীনবাবু যেন লজ্জিত হলেন। বললেন, ওসব কথা কেন বলছ, কেউ কাউকে রক্ষা করে না, রক্ষা করেন ভগবান। তিনিই তোমাকে রক্ষা করেছেন।

বড়দিদি কোথায় আছেন?

মেনি; মেনি আছে জলপাইগুড়িতে। জামাই এখন সবজজ। মাঝে মাঝে আসে, ভালই আছে।

আমি প্রণাম করে বিদায় নিয়ে বের হবার উদ্যোগ করতেই গিরীনবাবু বলল, দাঁড়াও।

আমি ফিরে দাঁড়ালাম।

তোমার একটা হিসাব ছিল। সরকারবাবুকে ডেকে দাও। হিসাবটা শোধ হয়েছে কিনা দেখে যাও। পাওনা থাকলে টাকাটা আজই নিয়ে যেতে পার। এখন তুমি সাবালক, সব দায়িত্ব নেবার মত ক্ষমতাও হয়েছে তোমার।

বলতে পারলামনা সামান্য কটা টাকার হিসাব নেবার আমার কিছু মাত্র আগ্রহ নেই এবং তার প্রয়োজনও নেই।

সরকার মশায় হিসাব দাখিল করে বলল, আর সাতাশ টাকা পাওনা রয়েছে।

গিরীনবাবু বলল, সাতাশ টাকার আট পারসেণ্ট হিসাবে চার বছরের স্নদটাও হিসাব করে দিয়ে দাও সরকার। টাকাটা আমার কাছে ছিল, আমরা তা খাটিয়েছি কোন না কোন খাতে। নিমু তুমি সব বুঝে নিয়ে যেও। সরকার মশায় আবার ওসব বুঝতে চায় না। একটা রসিদ দিও বাপু।

সরকারের পেছন পেছন গেলাম কাচারি ঘরে।

সোলেমানকে বুঝিয়ে বলতেই সে আশ্চর্য হয়ে বলল, আজকের যুগে এমন মানুষ জন্মায়!

হেসে বললাম, অনেক যুগ আগে ওঁর জন্ম!

তা বটে, তা বটে।

সরকার মশায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মেনিমাসীর বস্তিতে এলাম।

আমরা আজ তুজন। বুঝলে মাসী। খিদে পেয়েছে খুব।

মেনিমাসী নিশ্চিন্তভাবে বলল, মাসীর খুদকুঁড়ো যা জুটবে তা পাবি। বস তোরা। হাঁরে নিমু, নেরু বলছিল তোরা নাকি বন্দুক-টন্দুক বিক্রি করিস।

তোমার কথা বুঝতে পারছি না মাসী।

মানে নেরু বলছিল মোচলমানদের শায়েস্তা করতে হলে বন্দুক-টন্দুক দরকার। তোদের কাছে তো অনেক বন্দুক আছে। তুচারটে দিতে পারিস ওদের।

সহসা উত্তর দিতে পারলাম না। বললাম, খোঁজ নিয়ে বলব।

মেনিমাসীও দেখছি মুসলমান বিদ্বেষী হয়েছে। ছোটবেলায় শুনেছি অনেক মুসলমান শ্রমিক বস্তীতে থাকত হিন্দুমেয়ের ঘরে। তাদের হাতে জল না খেলেও বস্তির সমাজে তারা অপাংক্তেয় ছিল না। আজ সে সব মুসলমান এ পথে আর আসে না নিশ্চয়ই, কিন্তু

সেই সব হিন্দু মেয়েরা তো আছে এখনও। তারাও তবে তাদের প্রণয়ী বিদ্বেষী হয়েছে অবশ্যই। যাকে একদিন শয্যায় স্থান দিয়েছে পুরুষ ও প্রতিপালকরূপে, তাদেরই রক্তপাত করার চিন্তা তারাও করছে। যেহেতু তারা অপর সম্প্রদায়ের লোক। ভাবলাম মেনিমাসীকে জিজ্ঞেস করি ইনুবালার কথা, তার ঘরের লোক ছিল রহমান মিঞা। আজ তাদের কি অবস্থা জানবার ইচ্ছা জাগল, আবার ভাবলাম যাকগে।

খেয়ে দেয়ে গড়িয়ে নিলাম মেনিমাসীর বিছানায়। সোলেমান নির্ভয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুম দিল। বিকেল হতেই ডেকে তুললাম সোলেমানকে। বললাম, চল সোলেমান। ক্যাম্পে ফেরার সময় হয়েছে।

সোলেমান হাই তুলে উঠল।

ফিরতি পথে সোলেমান কেমন বেমনা। বললাম, কি ভাবছ সাথী?

ভাবছি অনেক। আবার লাহোর যেতে হবে, আবার টাঙ্গার রশি হাতে তুলে নিয়ে হেট্ হেট্ করে ঘোড়া দাবড়াতে হবে। আবার সেই পুরানো জীবনে ফিরতে হবে। তার চেয়ে লড়াইয়ের ময়দানে খতম হওয়াই ছিল ভাল।

কি যে বলছ! এমন সুন্দর জীবন ছেড়ে মরতে চাও তুমি?

মরতে চাই বলেই তো লড়াইয়ে গিয়েছিলাম। আল্লা নারাজ তাই মরণ হল না।

আমিও কিন্তু মরণ হতে পাবে জেনে লড়াইতে গিয়েছিলাম, ঠিক মরতে যাইনি। আমি আবার ফিরে আসতে চেয়েছিলাম এই জনারণ্যে। মানুষের মত বাঁচার দাবী নিয়ে সমাজে দাঁড়াতে চেয়েছি আমি।

তুমি ইলেমদার।

কি যে বল। আমি জীবনে স্কুলের মুখ দেখিনি। আমার এক

দিদি ছিল সেই যা সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখিয়েছিল। তার কাছেই আমার শিক্ষা। সে আর কত!

কি জানি সাথী! আমার মনে হয় মরণ যখন সবার শেষ তখন শেষটাই কেন আগে আসে না। বুঝতে পারি না।

নৈরাশ্য এসেছে সোলেমানের মনে। সাধারণ নাগরিক জীবনে ফিরে আসতে সে ভয় পায়, নইলে মৃত্যুর আহ্বানে ছুটে গিয়েও এ নৈরাশ্য বোধ তার মাঝে নিশ্চয়ই জন্মাতো না।

ক্যাম্পে এসে মনটা কেমন দমে গেল। অনেকক্ষণ ভেবে ঠিক করলাম, জাপানের বিরুদ্ধে আমরা কেন যুদ্ধে করতে গিয়েছিলাম! জাপান তো ভারতের শত্রু নয়। তার শত্রুতা ইংরেজের সঙ্গে। আমরা কে? আমরা ভাড়াটিয়া নফর, ইংরেজের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়েছিলাম বুকের রক্ত দিয়ে। কারণ, আমাদের আহার্যের অভাব ছিল। আর এ অভাব সৃষ্টিও করেছিল ইংরেজ তার নিজের প্রয়োজনেই। মেনিমাসী হয়ত জীবনে মুসলমান সম্বন্ধে কখনও চিন্তা করেনি, যখনই শুনেছে তার স্বজাতি হিন্দুরা নিগৃহীত হচ্ছে, তখনই সে মুসলমান সম্বন্ধে চিন্তা করতে সুরু করেছে। আর তখনই শত্রু মনে করেছে গোটা মুসলমান সমাজকে। মেনিমাসী নয়, সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যেই এই বিষ ছড়িয়েছে। হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের ওপর আস্থা হারিয়েছে। কিন্তু কেন? ভেবে কুল কিনারা করতে পারলাম না।

একদিন মুসলমান ছিল এদেশের রাজা।

আজ রাজত্ব তারা হারিয়েছে ঠিক, কিন্তু সে রাজত্ব হিন্দুতে কেড়ে নেয় নি। মুসলমান বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্তেই ইংরেজ অধিকার করেছিল সে রাজতক্ত। তাদের ক্রোধের লক্ষ্য ইংরেজ না হয়ে হিন্দু কেন!

হিন্দুরা শিক্ষায়-দীক্ষায় সমাজব্যবস্থায় অনেক উন্নত। এই উন্নতি মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থের বাহক মুসলমানরা সহ্য করতে পারছে

না। তারাই উস্‌কানি দিচ্ছে নিরক্ষর অজ্ঞ মুসলমানদের, আর তারা মনে করছে হিন্দুরাই তাদের শত্রু। আবার হিন্দু কায়েমী স্বার্থের বাহকরা উঠতি মুসলমানদের সহ্য করতে পারছে না, তাই তারাও উস্‌কানি দিচ্ছে হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের। এদের অদৃশ্য হস্তক্ষেপের ফল হল এই রক্তারক্তি। মাঝখান থেকে লাভবান হচ্ছে ইংরেজ। তারা উভয় পক্ষকেই শাসন করছে অমিত বিক্রমে। তাদের শাসন ব্যবস্থা আরও শক্ত হচ্ছে ধীরে ধীরে।

কলকাতায় থাকলে আরও বেশি চিন্তার সময় পেতাম। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই হুকুম হল "স্ট্রাইক দি টেণ্ট"। তলপীতল্পা ঘাড়ে করে আবার রওনা হলাম উত্তর ভারতের পথে। থামলাম এসে নৈনীতে।

শুনলাম আমাদের "ডিসব্যাণ্ড" করা হবে এখান থেকেই।

সত্যিই কয়েকদিনের মধ্যে ছাড়পত্র নিয়ে ফিরে যেতে থাকে দলে দলে সৈনিক। সবাই চলেছে নিজ নিজ ঘরের দিকে। তাদের বিদায় দিচ্ছে কোম্পানীর সাথীরা। হাসিমুখে যারা এসেছিল, প্রিয়জনের সান্নিধ্য লাভের আশায় আবার হাসি মুখেই তারা ফিরে গেল নিজের নিজের ঘরে।

সাতচল্লিশ সালের প্রথম দিকে আমিও ছাড়পত্র পেলাম।

যুদ্ধে এসেছিলাম পেটের দায়ে, আমার মত হাজার হাজার জোয়ান ছেলেও এসেছিল পেটের দায়ে। আবার আমরা সবাই ঘরে ফিরছি পেটের দায়কে সামনে রেখেই। অন্যের হয়ত প্রিয়জন আছে, ঘরে ফেরার জন্য হয়ত তারা ব্যাকুলও, কিন্তু আমার নেই ঘর, নেই জন! আমার ব্যাকুলতাও নেই তাই, বরং চিন্তার জালে আটকে গেল আমার মন।

যাবার সময় কেমন খেয়াল হল, গোপনে সামরিক রিভালবারটা চুরি করে লুকিয়ে রাখলাম। কেন, তা জানিনা। মেনিমাসীর সেই জিজ্ঞাসা আমার মনে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল কিনা বলতে

পারি না। তবু রিভলবারটাকে সঙ্গী করে নেবার একটা অহেতুক আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল মনে এবং তা পূর্ণ করতে মোটেই বিলম্ব করিনি।

সামরিক উর্দী হল আমার পক্ষে পাশপোর্ট। তারও ওপরে ছিল দেশের ডামাডোল অবস্থা। তাই কেউ প্রশ্ন করল না, কেউ তল্লাস করল না। নৈনী থেকে কলকাতা অবধি পথ বিনা বাধায় পৌঁছে গেলাম। ষ্টেশন থেকে সোজা এসে উঠলাম মেনিমাসীর বস্তিতে।

আমাকে ফিরে পেয়ে মেনিমাসীর আহ্লাদের অবধি নেই। কয়েকদিন তার আদর যত্নে বেশ বিপন্ন হয়ে উঠেছিলাম। একদিন বললাম, এভাবে আর বসে থাকা যায় না মাসী। ছিলাম গৃহভৃত্য, আবার গৃহভৃত্যের কাজ খুঁজে নিতে হবে। যে কয়টা টাকা সম্বল তা আর কতদিন। দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে। কাজের চেষ্টা করি।

মেনিমাসী বাধা দিয়ে বলল, দরকার কি চাকরের কাজ করার, তার চেয়ে আমি কিছু টাকা দিচ্ছি, কোন ব্যবসা কর।

ব্যবসা কি করব, করার কিছু আছে কি! থাকলেও আমার অভিজ্ঞতা কতটুকু। যে কাজই কর তা শিখতে হয়। তোমার টাকা নষ্ট হবে মাসী। দেশের অবস্থা তো দেখছ। কখন কি হয় কে বলতে পারে! তার চেয়ে চাকরি খুঁজে নেওয়া ভাল।

মেনিমাসী আমার কথায় খুশী হল না। কয়েকদিন চুপ করে থেকে বলল, একটা কাজ করবি নিমু, লাভ খুব না হলেও দিন চলে যাবে।

বললাম, কি কাজ?

তরকারির ব্যবসা। গ্রাম থেকে তরকারি কিনে এনে শহরে বিক্রি করা।

কথাটা মন্দ বলনি মাসী কিন্তু একাজে হাজার হাজার পাইকের রয়েছে। তাদের সঙ্গে পারব কি?

কেন পারবি না ? ওরা পারে তুই পারবি না কেন !

পারাটাই বড় কথা নয় মাসী। লাভ লোকসান ভেবে কাজ করতে হয়। ভয় হচ্ছে ওদের সঙ্গে কমপিটিশনে হয়ত পারব না। ওরা জাত পাইকের আর আমি কাঁচা লোক।

ওরা একদিনে পাইকের হয়নি, ওরাও কাঁচা ছিল। লাভ লোকসান সহ্য করেই কাজ করছে।

যুক্তিতে মেনিমাসীর জয় হল।

একদিন সকালের ট্রেনে বের হলাম লক্ষ্মীকান্তপুরের পথে, কোন দিন যেতাম ডায়মণ্ডহারবারের পথেও।

বিমলা তরকারি আনে ধাপার মাঠ থেকে। ওদিকে বছর ধরে বড়ই গোলমাল। বিমলা আর ধাপায় যায় না। জোয়ান মেয়ে তাই শঙ্কা বেশি। বিমলা জাতে তিওর। ছোট জাতের মেয়ে তাই সৎ জীবিকার কোন কাজকেই ছোট মনে করে না। মাথায় করে মোট টেনে এনে রাস্তায় বসে বিক্রি করতে মোটেই লজ্জা বোধ করে না। তার রংটা ময়লা রাস্তার ধুলোয়। দেহটা বেশ সাজানো, হঠাৎ বয়স বলা কঠিন।

বিমলার সঙ্গে পরিচয় পথেই।

নেত্রা ষ্টেশনে নেমেছি, বিমলাও কয়েকটি পুরানো চটের বস্তা নিয়ে নেমেছে।

আগে চলছিল বিমলা আমি ছিলাম পেছনে। বার বার পেছনে তাকিয়ে দেখছিল আমাকে। ধোয়া কাপড় জামা পড়া ভদ্রলোক দেখে বিমলাই জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবে বাবু।

বললাম গন্তব্যস্থল।

আমিও যাব ওখানে। কার বাড়িতে যাবে ?

ঠিক নেই। তরকারি কিনব মনে করে বেরিয়েছি। দেখি কোথায় পাওয়া যায়।

বিমলা ঠোঁট উল্টে বলল, বাড়িতে ব্যাপার আছে বুঝি ?

না। ব্যবসার জন্য।

আশ্চর্য হয়ে বিমলা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, কোঁচা কাছায় তরকারির ব্যবসা হয় না বাবু। আমাদের মত হতে পারলে ব্যবসা করতে পারবে। পারবে তুমি মাথায় করে এক দেড় মণ মাল বইতে ? কুলি দিয়ে টানাতে হলে লাভের গুড় পিঁপড়েতেই খাবে। বুঝলে।

বিমলা পাকা ব্যবসায়ী। বললাম, তুমিও বুঝি এই ব্যবসা কর ?

করিতো বটেই, পেটও চালাই। তিনজন খাওয়ানোর লোক, তাদেরও পেট ভরাই।

কথাগুলো বিমলা বেশ গর্বের সঙ্গে বলল।

কিছুদূর গিয়ে বিমলা বলল, তোমার ঘরে ক'জন লোক ?

কেন ?

ব্যবসায় পেট ভরবে তো ?

ঠাট্টা করল বিমলা।

বুঝলাম। ওকে কোন কঠিন কথা বলার চেয়ে হেসে বললাম, ভরবে।

অনেক বাবু এসে ধাক্কা খেয়েছে। এই তো নবীনবাবু, সেই যে শ্যালদার মোড়ে এখন দোকান করেছে, তার কথাই বলছি। অনেক টাকা ঘা খেয়েছে।

বললাম, জানি না, চিনি না। আমি একা।

একা! বলে বিমলা আবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

অন্য ধান্দা দেখ। এটায় পোষাবে না। গায়ে ধুলো লাগবে।

বিমলা আবার ঠাট্টা করল।

হেসে বললাম, তোমার ব্যবসার কোন ক্ষতি করব না।

তা বলছি না।

তা হলে ঠাট্টা করছ কেন। মানুষ দেখে শেখে, আবার ঠেকেও শেখে।

বিমলা এবার লজ্জিত হল। তার শ্যামবর্ণের মুখখানা রাঙা হল। অনেকক্ষণ নীরবে চলতে চলতে বলল, তা বটে। তোমার ভাল হোক।

কেমন করে হবে? তুমি প্রথম থেকেই বাধা দিচ্ছ।

বাবুদের বড় ভয় করি তাই বাধা দিয়েছিলাম। তুমি পারবে বাবু।

বিমলা হঠাৎ কেন সার্টিফিকেট দিল তা বুঝলাম ধীরে ধীরে।

বিমলা হল আমার নিত্যকার সঙ্গী। তার সঙ্গেই গ্রামে গ্রামে যেতাম তরকারি কিনতে। দুজনে বস্তা বোঝাই দিয়ে মাথায় করে কলকাতায় পৌছতাম বিকেলবেলায়। পাইকিরি বাজারে মাল বিক্রি করে যে যার ঘরে ফিরে যেতাম। সকাল পাঁচটা চল্লিশ মিনিটের গাড়ি ধরতাম দুজনে।

বিমলা গল্প করত সারাটা পথ ধরে। তার দেশের কথা, ভাই-বোনের কথা আরও কত কি! একদিন জিজ্ঞেস করলাম, বিমলা তোমার শশুরবাড়ির কথা কেন বল না?

মৃদু হাসি ফুটে উঠল বিমলার মুখে। অনেকক্ষণ ভেবে বলল, সেটা বড় কলঙ্ক।

কলঙ্ক!

হাঁ। আমার বে' হয়েছিল এগার বছর বয়সে।

বিমলা বলল, আবাদের নাম শুনেছ, বাঘ আর কুমীরের দেশ আবাদ! সেই দেশে যেমন আমার জন্ম তেমনি সেই দেশেই আমার বিয়ে। আমার মতই গরীব ছিল আমার স্বামী। তুমি ভাবছ গরীব আবার বিয়ে করে কেন? ও তুমি বুঝবে না। বিয়ে করাটাই হল মনুষের ধর্ম। আমাদের যেমন স্বামী দরকার তেমনি পুরুষেরও দরকার স্ত্রীর। তাই ছোটবেলায় বুদ্ধি ফুটবার আগেই বিয়ে। কি জানি যদি বড় হয়ে গরীবের ঘর করতে না চাই!

নিবারণ ছিল গরীব জেলে। জাত ব্যবসা মাছের হলেও মাছ মারার সঙ্গতি ছিল না, অন্যের ক্ষেত মজুরের কাজ করত। নিবারণের তখন বয়স আঠার, জোয়ান ছেলের বয়স। কিন্তু পেটভরে ত্বুবেলা খেতে পেত না বলে দেহটা খুব সবল ছিল না। আমার বাবা ওসব চিন্তা না করেই আড়াই কুড়ি টাকা পেয়ে বিয়ে দিয়েছিল।

আমার বয়স যখন চোদ্দ, নিবারণ পুরো জোয়ান। রোগা হলেও খুব পরিশ্রম করত। করলে কি হবে, সারা বছরের রুটি রুজি জোটানো ছিল তার ক্ষমতার বাইরে।

আমাদের কোন জমি ছিল না।

আবাদে ক'জনেরই বা জমি আছে। সবাই ক্ষেতমজুর। যাদের জমি আছে তারা বাস করে কলকাতায়। বছর শেষে আবাদে বখরা নিতে পেয়াদা পাঠায়। আমাদের বখরা যা হোত তার আদ্দেক যেত ঋণ শোধ করতে। সাবা বছর কর্জা করে খেতে হত। আর ত্বনো ধান দিয়ে কর্জা শোধ করাই হল রীতি। আমাদেরও তাই করতে হত।

সেবার আকালের বছর।

কারও ঘরে খাবার নেই।

আমাদেরও নেই।

নিবারণ ডাকাতের দলে যোগ দিল।

ডাকাতিতে মোটামুটি কিছু আসত, চলত দিন কয়েক। আবার সেই অভাব। সব দিনতো সমান যায় না। নিবারণ ধরা পড়ল একদিন। পুলিশ কিছু মালপত্রও পেল আমার ঘরে।

বিচারে নিবারণের জেল হল আটবছর।

আমার বয়স কম, সংসারে বুড়ী শাশুড়ী আর বিধবা ননদ। তাদের পেটের ভাত জোগাতে আমিই নেমেছি কাজে। অনেক কাজ করেছি, অনেক গালমন্দ খেয়ে শেষ পর্যন্ত তরকারি বেচে দিন কাটাচ্ছি। তিনটে বছর এইভাবেই কেটে গেছে। নিবারণের ঘরে ফিরতে আরও তিন চার বছর বাকী।

বিমলার কাছে তার স্বামী-শাশুড়ী-ননদের অনেক গল্প শুনেছি।"

একদিন মন্তব্য করেছিল বিমলা, পেটে ভাত না থাকলে মানুষ চুরি ডাকাতি করেও খায়। তাতে দোষ কোথায় বল দিকি!

বললাম, নিবারণ তোমার মত তরকারি বেচতেও তো পারত।

পুরুষ মানুষ, পুরুষ মানুষের মতই কাজ করেছে।

তা হলে তুমি ডাকাতির সমর্থন কর।

তা করি। যার অনেক আছে সে ডাকাতি করেই তা সঞ্চয় করে, সে ডাকাতি করে আইনকে ফাঁকি দিয়ে, আর তাদের কাছ থেকে যারা জোর করে ছিনিয়ে নেয় তারা বে-আইনী কাজ করে। আইন যদি মানুষকে খেতে না দেয় তা হলে বে-আইনী কাজ করাই তো সহজ। তাতে দোষ কোথায়। আচ্ছা তুমিই বল, আইন অনুসারে পৃথিবীর কোন মানুষ চলে কি? চলতে পারে কি! মিনিটে মিনিটে আমরা বে-আইনী কাজ করি।

কিন্তু ডাকাতি যে ধরনের বে-আইনী, সে সব কাজ সে ধরনের নয়।

বিমলা হেসে বলল, ছোট সাপের বিষ বুঝি বিষ নয়।

তুলনাটা ঠিক হল না বিমলা।

তা হলে যারা অন্যকে ফাঁকি দিয়ে আইনকে কলা দেখায় তাদের তুলনায় ডাকাতি অন্যায় নয়।

বিমলা বেশ জোর দিয়েই নিবারণের কাজ সমর্থন করত। কোন সময়ই দুঃখ প্রকাশ করত না।

একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, নিবারণের জন্য দুঃখ হয় না বিমলা?

আগে হত। পরে ভেবেছি কেন দুঃখ করব। আমার প্রয়োজন পেটের ভাত। তা দেয় না। আমার প্রয়োজন স্বামীর সংসর্গ, তাও পাই না। মানুষ বাঁচার জন্য যা চায় তা যদি না পাই তা হলে দুঃখ করে লাভ আছে কি।

চমকে উঠে বলেছিলাম, তুমি নিবারণকে ভালবাস না বিমলা ?

বিমলা হাসল।

হাসছ কেন ?

এগার বছরের মেয়ে ভালবাসতে শেখে কি, শিখলেও একটা অজানা পুরুষকে ভালবাসা উচিত কি ? সম্ভব কি ! ওটা তুমি বুঝবে না বাবু। বিয়ে করলে বুঝতে। আমাদের মত তোমার যদি বিয়ে হত তা হলে বুঝতে ভালবাসাটা হল বেড়াল পোষার মত। যতক্ষণ কাছে থাকবে ততক্ষণ মায়া, না থাকলে কিছুই নয়। আমাদের আসল ভালবাসা হল সন্তান সৃষ্টি করা। ওটা অনেক ছোট কথা, তুমি তা বুঝবে না।

বিমলা বেশ সহজভাবে কথা বলে। তাই রাগ করতে পাবি না।

একদিন বিমলা বলল, আব কতকাল তরকারি বেচবে বাবু। লাভ কিছুতো হচ্ছে, এবাব দোকান টোকান করে জাঁকিয়ে বস।

তাই ভাবছি। ইংবেজ নাকি চলে যাবে। ওরা গেলে কিছু করব মনে করেছি।

বিমলা হেসে বলল, যাদের কাজ কবার তারা ইংরেজ থাকলেও করবে না থাকলেও করবে। মোটমাট তোমাব ইচ্ছে নেই কাজ করাব।

বোধহয় তাই।

তোমার বাবা-মা কেউ নেই।

না।

কোথায় থাক ?

মাসীর কাছে।

আমি যাব তোমার মাসীর কাছে। বলব তাকে।

বেশ ! চল একদিন।

আগামী হপ্তায়।

বেশ।

দিন ঠিক করে দিল বিমলা। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে বিমলা আসেনি। পরেরদিন শেয়ালদাতেও তাকে দেখতে পেলাম না। অসুখ বিসুখ হয়েছে মনে করে কাজে বেরিয়ে গেলাম।

একদিন দুদিন করতে করতে বার তেরদিন কেটে গেল। বিমলার দেখা নেই। তার বাড়ির ঠিকানাও জানি না। জানলে খবর নিতাম।

অবশেষে বিমলাই আমাকে আবিষ্কার করল।

তাকে চিনতে পারিনি। তার মাথায় ছিল সিঁদুরের দাগ, সে দাগ নেই। হাতে ছিল শাঁখা, তাও নেই। তাই চিনতে পারিনি। বিমলা হেসে বলল, চিনতে পারলে না বুঝি!

বললাম, চিনেছি। কিন্তু!

সোয়ামী মরেছে জেলখানায়। ভাতার ভাত না দিলেও মরণে বিধবা হতে হয়। তাই হয়েছি। বলতে বলতে বিমলা জোরে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে বলল, যাক চুকে গেছে সব হাঙ্গামা। আমিও বেঁচেছি নিবারণও বেঁচেছে।

বললাম, বৈধব্য তোমাকে দুঃখিত করেনি।

সধবা থেকেও যখন সুখ ছিল না, বিধবা হয়েই বা দুঃখ করব কেন?

ট্রেনের হুইশিল পড়তেই ছুটে গেলাম। সেদিনের মত গল্প করা শেষ। ব্যস্ত হলাম তরকারির হিসাব নিয়ে।

বিমলার চলনে ও কথনে কোন জড়তা নেই।

বিমলা এসেছিল মেনিমাসীর কাছে।

পরিচয় করিয়ে দিলাম।

বিমলা আর মেনিমাসীকে কথা বলার সুযোগ দিয়ে আমি বেরিয়ে গেলাম।

বাড়ি ফিরে এসে দেখি বিমলা চলে গেছে। মেনিমাসীর মুখ ভার।

জিজ্ঞেস করলাম, কি হল মাসী ?

মেনিমাসী গম্ভীরভাবে বলল, তোর কথা ভাবছি।

সে তো অনেক বছর ধরে ভাবছ। আর কত ভাববে ?

মেয়েটাকে ভয় করছে।

মানে ?

তোর ঘাড়ে চেপে না বসে।

হেসে বললাম, বিমলা কারও ঘাড়ে চেপে বসার মত মেয়ে নয় মাসী, ও দয়া করে যদি কাউকে ঘাড়ে তুলে নেয় সেটাই হল ভয়ের। নামাতে পারবে না সহজে।

একই কথা। তুই ওর খপ্পরে যেন পড়িস না।

বললাম, তা বলতে পারি না, তবে বিমলাকে খুব ভাল লাগে। ওর সঙ্গে কথা বলেও সুখ।

মেনিমাসী বলল, ঠিক এই কথাই বিমলাও বলল। বলল, বাবুর সঙ্গে কথা বলেও সুখ।

তাই নাকি !

মাসী !

কেন রে।

আমার বাবাকে দেখেছ ?

দেখেছি।

মাকে ?

দেখেছি।

তারা আমাকে কি দিয়েছে ?

মেনিমাসী চুপ করে রইল, আঁচল দিয়ে মুখ মুছে উঠে যাচ্ছিল। বললাম, যেওনা। পৃথিবীতে তুমি বিনা আর কেউ আমাকে ভালবাসে কি ! মানুষ তো চায় এমন একটা সঙ্গী যে তারজন্য চিন্তা করবে, দুঃখ পাবে, সুখ পাবে। এমন একটা মানুষ আমারও প্রয়োজন।

তা হলে বিয়ে কর। আমি মেয়ে দেখি।

কিন্তু আমার মায়ের পরিচয়টা তাদের দিও। তাদের বল যে আমি কায়েতের ঘরের ছেলে, আমার মা পালিয়ে গেছে শিশু ছেলেকে ফেলে রেখে আর একজনের হাত ধরে।

কি বলছিস নিমু? মায়ের সম্বন্ধে খারাপ কথা বলতে নেই।

সেটা হল তোমাদের নীতিকথা। মায়ের নীতিজ্ঞান থাকলে সন্তানকে ফেলে পালাত কি! যাই বল মাসী, মা ছিলেন ভীষণ বাস্তবধর্মী, সেজন্যই তাকে শ্রদ্ধা করি, নইলে ঘৃণা করতাম।

মেনিমাসী রণে ভঙ্গ দিল সেদিন।

পরের দিন বিমলাকে বললাম।

মেনিমাসীকে বুঝি বলেছ আমার সঙ্গে কথা বলেও সুখ।

বিমলা হেসে বলল, তুমি বুঝি লজ্জা পেয়েছ আমার কথা শুনে।

বললাম, ঘুরিয়ে কথা বলছ কেন?

তোমার সঙ্গে কথা বলে যদি দুঃখ পেতাম, তা হলে নিশ্চয়ই তাও বলতাম।

কিন্তু মেনিমাসী মনে করেছে আমাদের গোপন পীরিত জন্মেছে।

সবাই তাই মনে করত।

লজ্জায় আমার কান মুখ গরম হয়ে উঠল। কোন কথা বলতে পারছিলাম না। বিমলা হেসে বলল, তোমরা বাবুলোক, ছোট-লোকের সঙ্গে পীরিত করলে তোমাদের মান যায়। তাই দেখছিলাম তুমি কতবড় মানী লোক। আমার সঙ্গে তুমি পীরিত করলে ছি! ছি! আর তোমার সঙ্গে আমি পীরিত করলে ধন্য, ধন্য।

দুটো একই কথা।

না মশায়, তা নয়। কোন পক্ষ এগোবে সেটাই দেখবে সবাই। আমি যদি তোমাকে জালে ফেলতে পালি তা হলে লোকে আমাকে ধন্য ধন্য করবে, আর তোমার জালে আমি পড়লে, তোমাকে ছি! ছি! করবে লোকে।

বিমলার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

কি ভাবছ নিমু বাবু! আমার অনেক নাগর জুটেছিল, ঠাঁই দেইনি। গতর খাটিয়ে খাই আবার গতর দিয়ে জন্তুর খোরাক হব, তা সহ্য করতে পারিনি, তাই খেদিয়েছি সবাইকে। ওরা মুখটা আর বুকটা দেখে জোয়ানীর হিসাব করে, তার পর ফাটকা বাজিতে দাম ঠিক করে, সিকে থেকে চোদ্দ সিকে। তারপর সন্তান পেটে করে বেড়াও চোদ্দ সিকের বদলে। তা হবে না। বাপের নামটি থাকবে না, মায়ের কাছেও ঘেন্না লজ্জা, তা হতে দেব না। তাই ধন্য ধন্য হতে পারি নি। তুমিও বোধহয় অনেক ভেবে স্থিতি হতে পারছ না।

গম্ভীরভাবে বললাম, একি তোমার মনের কথা বিমলা?

তুমি কি মনে কর মুখের কথা। সারাদিন পুরুষদের সঙ্গে ওঠা বসা করতে হয়, কতরকম ঠাট্টা ইয়ার্কি শুনতে হয়। তারপর যা বলি তা যদি শুধুই মুখের কথা হয়, তা হলে মনের কথা যে কোনটা তা আবিষ্কার করতে হবে।

বিমলাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলাম না।

সেদিন বিমলাকে আরও ভাল করে জানতে পারলাম। মনে মনে শঙ্কিত হলাম। বিমলার মুখ ফুটেছে, এবার আরও এগোতে পারবে মনে করছি। সেটা আমার পক্ষে কতটা ফলদায়ী হবে তা ভেবে পেলাম না।

ফেরবার পথে বিমলা বলল, কাল ইংরেজ চলে যাবে।

কে বলল?

সবাই বলছে, এবার আমরা স্বাধীন হব।

তাই নাকি!

ঠাট্টা করছ। সত্যিই ইংরেজ চলে যাবে। কিন্তু স্বাধীন হলে আমাদের কি লাভ হবে তাই ভাবছি।

ভাবনার কথা। কিন্তু আমার বিশ্বাস আমরাও লুটেপুটে খাবার

স্বাধীনতা পাব। তুমিও নিশ্চয়ই সে লুটের ভাগ পাবে। আমি কিন্তু ছেড়ে দেবার পাত্র নই। নিশ্চয়ই নেমে পড়ব।

বিমলা হেসে বলল, তুমি মিলিটারীর লোক, তোমার সাহস আছে, গায়ে জোর আছে।

সাবধান বিমলা। নজর দিও না। তোমার নজরে আমি শুকিয়ে যাব দেখছি।

বিমলা গম্ভীরভাবে বলল, শোন নিমু বাবু, স্বাধীনতা যারা পাবে আমরা তাদের দলে নই। আমি নই, তুমি নও, আমার মত লাখো লাখো লোকও নয়। আমাদের মাথায় করে তরকারি বয়ে নিয়ে যেতে হবে রোজই। রোজই খাবারের ধান্দায় প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হবে।

একটা কথা শুনবে!

বল।

কাল আর গ্রামে আসব না।

কি করবে?

কোথাও বেড়াতে যাব। যাবে তুমি?

বিমলা ভেবে নিল।

উত্তর দাও।

তুমি সহ্য করতে পারবে কি?

না পারলেও কালকের দিনটা স্মরণে রাখতে নিশ্চয়ই সহ্য করব।

সারা জীবনের একটা দিন মাত্র!

একটা দিন খুব কম নয় বিমলা। এক হয়ত দুই হবে, দুই বাড়তে বাড়তে দুশ' হতে পারে।

বিমলা মৃদু হেসে বলল, তোমার সখ পূরণ করতে নিশ্চয় যাব। তবে, এটা কিন্তু ছি! ছি! ব্যাপার।

আমি তা মাথা পেতে নেব।

সকাল বেলায় শেয়ালদা স্টেশনে বিমলার সঙ্গে দেখা। চওড়া পাড় শাড়ি তার পরনে, টেনে খোঁপা বেঁধেছে। পায়ে একজোড়া কম দামের চটি, হাতে দুগাছা কাঁচের চুড়ি।

আমাকে দেখেই জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবে?

ঠিক করিনি। তুমিই বল।

ছোট লাইনের গাড়ি চড়ায় খুব সখ আমার। যাবে আমাকে নিয়ে।

কোথায়?

ফলতায় গো, ফলতায়। ছোট্ট গাড়ি ঘুট ঘুট করে লোকের বাড়ির উঠান দিয়ে, আম গাছের তলা দিয়ে, পুকুরের পার ধরে ছুটে চলবে। বেশ লাগবে। যাবে!

বললাম, চল। এখান থেকে যেতে হবে মাঝেরহাটে। বজবজ লাইনের গাড়িতে চল!

বজবজের গাড়িতে উঠে বসলাম দুজনে।

আমার জীবনে একটি রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

দুপুরবেলায় ফলতায় পৌঁছেই বললাম, এই ট্রেনেই ফিরে চল বিমলা।

না। চল নদীর ধারে গিয়ে বসি। কত বড় নদী। উঃ!

তুমি জাতে জেলে তাই নদীকে বড় ভাল লাগছে।

বিমলা হেসে বলল, তোমার বুঝি লাগছে না। এমন মানুষ বুঝি পৃথিবীতে নেই যে নদীকে ভালবাসে না। তুমিই বোধহয় একমাত্র মানুষ যে নিজে জেলে নয় বলে নদীকে ভালবাসতে পারনি।

কষ্ট হল বিমলার কথা শুনে। ওর কথার তীক্ষ্ণতায় বিষণ্ণ হয়ে পড়লাম। নদীর কিনারা ধরে চলতে থাকি নীরবে। নারকোল গাছের ছায়াতে বসে বললাম, এখানে বসে নদীকে বেশ দেখতে পাবে।

বিমলা চুপ করে বসে রইল।

বেলা বাড়তে থাকে ; বিমলা সেই তখন থেকে চুপ করেই রয়েছে। আমি কথা বলার জন্য উসখুস্ করছি অথচ কিছুই বলতে পারছি না। অবশেষে বলতে বাধ্য হলাম, খিদে পায়নি তোমার।

বিমলা মুখ ঘুরিয়ে বলল, খিদে! ছুনিয়াতে ঐ একটি আদিম অনুভূতি যা সবাই সমান ভাবে অনুভব করে। তার জন্য অত ব্যস্ত কেন নিমুবাবু। সারা জীবন বরাদ্দ থাক খাবারের জন্য, বাকি থাকুক মাত্র একটিদিন, যেদিনটা মনে রাখব স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিন বলে। আজ আমাদের না-খাওয়া দিনের উদ্বোধন হবে। বুঝলে।

সাংঘাতিক কথা বলছ বিমলা! তুমি বুঝি অনাহার দিয়েই স্বাধীনতার দিনকে স্মরণীয় করতে চাও ?

বিমলা কোন উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে চলতে লাগল নদীর পাশে পাশে, আমিও চললাম তার পিছু পিছু। চলতে চলতে একটা সাঁকোর সামনে থমকে দাঁড়াল বিমলা!

দাঁড়ালে কেন ?

চল ভেতরে গিয়ে বসি। বলে বিমলা নির্ভয়ে সাঁকো পেরিয়ে প্রবেশ করল পরিখা ঘেরা এক আঙ্গিনায়। চৌকিদার ছিল সিঁড়িতে বসে। জানতে চাইলাম, এটা কি ?

চৌকিদার বলল, কেল্লা। নবাব সিরাজ কলকাতা দখল করলে ইংরেজরা পালিয়ে এসে এই কেল্লায় আশ্রয় নিয়েছিল।

ফলতার কেল্লা।

কিছুই নেই, মাটির নীচে কয়েকখানা ভাঙ্গা ঘর শুধু। আর রয়েছে অকেজো কয়েকটি মধ্যযুগীয় কামান। বিমলার সেদিকে লক্ষ্য নেই। এগিয়ে চলেছে ছুর্গের প্রাকারের দিকে। আমি পুরাতন ফৌজী মন নিয়ে দেখতে থাকি কেল্লার গঠন প্রকৃতি। সেকালের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা যে কত হাস্যকর তা আজকের যুদ্ধপদ্ধতি দেখলে ভাল করে বোঝা যায়। তবুও সেদিন এগুলোই ছিল আত্মরক্ষার ছুর্ভেদ্য ছুর্গ।

বিমলার কাছে এসে ডাকলাম, বিমলা।

চমক ভাঙ্গল তার।

বিমলা ভাল হয়ে বসে ইসারা করল তার পাশে বসতে। তার পাশে বসেই দেখি বিমলার চোখে জল। জানতে ইচ্ছে হয়েছিল তার কাঁদার কারণ, আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগে আঁচলে চোখ মুছে বিমলাই বলল, চল এবার ফিরে যাই।

আমি প্রতিবাদ না করে উঠে দাঁড়াতে বিমলা আবার আমার হাত ধরে টেনে বসাল পাশে।

অশিক্ষিত তিওয়ের মেয়ে বিমলা, তার চোখের ভাষাই যথেষ্ট। তার চোখে মমতার ছায়া, আকুল আবেদন আপন করে নেবার। আমি অভিভুত হয়ে পড়েছিলাম। নীচু গলায় ডাকলাম, বিমলা।

অমন করে তুমি ডেকো না নিমুবাবু। আমি আত্মসম্বরণ করতে পারব না।

বিমলার সঙ্গে ফিরে এসেছিলাম নতুন জীবনের আস্বাদ নিয়ে। বিমলা আমাকে ভালবেসেছে। ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে উজাড় করে দিয়েছে নিজেকে।

একদিন হাসতে হাসতে বলেছিলাম, তুমি তো লেখাপড়া জাননা, তবু এত কিছু শিখলে কোথা থেকে! বিমলা উত্তর না দিয়ে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল বাহির বিশ্বকে। খোলা পৃথিবী তাকে অকৃপণ ভাবে শিক্ষিত করেছে। তার বাস্তববুদ্ধির কাছে আমি শিশু মাত্র।

বহুকাল কেটে গেছে তারপর। বিমলাকে পেয়েছি নিজস্ব করে। বিমলাই পরিচালনা করত আমাকে! আমি কোন কাজে নিজের মতামত দেবার আগেই দেখতাম বিমলার মতামত অতি কঠিনভাবে আমার মতামতের কণ্ঠরোধ করেছে।

কিন্তু বিমলা, যেমন এসেছিল বিদ্যুতের ঝলকানির মত। যেমন উজ্জ্বলতা সৃষ্টি করেছিল, তেমনি নিভেও গেল চোখ ধাঁধিয়ে। আমার জন্য রেখে গিয়েছিল তার সঞ্চয় বাস্তব জ্ঞানটুকু।

বিমলাকে নিয়ে ঘর বাঁধার প্রচণ্ড ইচ্ছা ছিল মনে। বিমলাও মোটেই অনিচ্ছুক ছিল না। কিন্তু সম্ভব হয় নি শুধু মাত্র তার বৃদ্ধা শাশুড়ী আর ননদের জন্য। বিমলা বলত, কর্তব্য তাকে নির্মম করেছে।

বিমলা আগা গোড়াই ছিল নিজের সম্বন্ধে অসতর্ক। নিজের প্রতি এত বেশি অবহেলা করতে দেখিনি আর কাউকে। মাঝে মাঝে মেনিমাসীর কাছে যেত। মেনিমাসী তাকে বলত, চুলটা আঁচড়াতে পারিসনা বিমলা। বিমলা হেসে বলত, তোমার যেমন কথা। আমি বুড়ী মেয়ে, আমি কি আবার বিয়ে করতে যাব যে সেজেগুজে লোকের চোখ ঝলসে দেব।

মেনিমাসী রাগ করে বলত, চুল বাঁধলে বুঝি লোকের চোখ ঝলসানো হয়।

বিমলা মুখ টিপে হাসত।

তুই খেয়েছিস বিমলা ?—জিজ্ঞেস করত মেনিমাসী।

না মাসী। খিদে পায়নি।

বলিস কিরে। সেই সকালে গেছিস এলি বিকেল পাঁচটায়। নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। ঘরেও তো কিছু নেই। দেখি চারটি মুড়ি আনিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁরে, নিমু কোথায় গেল ? ওটাও তোর মতই ছন্নছাড়া হতভাগা।

কি যে বলছ মাসী।

ঠিকই বলছি। দেখ বিমলা, যাকে রাখবি সে তোকে রাখবে। দেহটার যত্ন করলে দেহটাই তোকে রক্ষা করবে। বুঝলি।

বিমলা মুখ টিপে হাসত।

তোমার আদরে আমার যে জীবন যাবার জোগাড়। অত আদর করনা মাসী। বলে বিমলা মুখ ঘুরিয়ে বসত। মেনিমাসীও কম নয়, বলত, তোর কপাল। কপাল পুড়িয়েছিস এবার কিছুটা আদর সোহাগ গায়ে মেখে নে, আর তো সুযোগ আসবে না।

বিমলা মেনিমাসীর গল্প করত আর মুখ টিপে হাসত। বলত, তোমার মাসী যে মায়ের চেয়ে বেশি দরদী। তান না হলে যায় না।

বলতাম, মাসীর ছেলে নেই, আমি তার কুড়ানো ছেলে। তাই ছেলের ভাবী বউকে আদর একটু বেশি করে। তাকে অত ছোট করে কেন দেখছ।

বিমলা উত্তর দিতনা।

আমিও এই অবস্থাগুলো রপ্ত করে মনে মনে খুশীই হতাম।

বিমলার কাছেই আমার ভালবাসা শিক্ষার হাতেখড়ি।

বিমলা কোনদিনই তার বাসায় যেতে দিতনা। তার শাশুড়ী ও ননদের কাছে নিজেকে কিছুতেই ছোট করতে চাইতো না। সে বলত, নিবারণের মরার খবর আজও তাদের দিতে পারিনি। কেমন যেন কষ্ট হয়। তাই মাঝে মাঝে বুড়ী যখন নিবারণের আগমন প্রত্যাশায় কাঁদে তখন নিজেকে স্থির রাখতে পারিনা। মা হতে পারিনি, মায়ের ব্যথা অত বুঝতে পারিনা। তবুও মনে হয়, সন্তানের মৃত্যু সংবাদ মাকে জানান সবচেয়ে বড় নিষ্ঠুরতা। সেই নিষ্ঠুরতা করেই যদি তোমার হাত ধরে তাদের সামনে নিয়ে হাজির হই, তা হবে অমানুষিকতা। তা করতে পারবনা নিমুবাবু।

এই ভাবেই আমাদের দিন কাটবে কি?—প্রশ্ন করতাম।

বিমলা সঙ্গে সঙ্গে বলত, মনের দিক থেকে তোমার তো কোন অভাব থাকা উচিত নয়। আর তোমাকে তো বলেছি আমাকে বাজারের মেয়ে মনে না করে যদি সমাজের মেয়ে মনে করতে পার তা হলে দেহের প্রয়োজনও আপনা থেকেই সংযত হবে।

বিমলা সত্যিই নিজেকে সংযত করেছিল, আমাকেও সংযত হবার সুযোগ দিয়েছিল।

মাঝে মাঝে বলত, মাংসের ওপর লোভ জাগা স্বাভাবিক, তা রোধ করা সহজও নয়। তবুও আমার অনুরোধ তুমি কিছুদিন আত্মসম্বরণ কর।

কদিন আগে নিজের জন্য এক জোড়া শাড়ি, শাশুড়ি ননদের জন্য একখানা করে থান আর আমার জন্য একখানা ধুতি কিনে হাজির হল মেনিমাসীর ঘরে। জিজ্ঞেস করলাম, এতটাকা কোথায় পেলে বিমলা?

তোমার দয়া।

আমি তো একটি পয়সাও দিইনি তোমাকে।

আশা আছে পাব তোমার কাছে, তাই নিজের যা ছিল তার একটা অংশ ব্যয় করে সবাইয়ের লজ্জা নিবারণ করছি।

আবেক দিন এসে মেনিমাসীকে বলল, তোমার কি জাত?

মেনিমাসী বোধ হয় ভুলে গিয়েছিল তার জাত। অনেক ভেবে বলল, সদ্‌গোপ।

আমি তিওর। যাকে তোমরা হরিজন মনে কর। আমি আজ রাঁধব তুমি খাবে তো?

মেনিমাসী সানন্দে বলল, নিশ্চয়।

মেনিমাসীকে সরিয়ে দিয়ে বিমলা রাঁধতে বসল। খাবার সময় আমাকে জিজ্ঞেস করল, কেমন হয়েছে রান্না?

বললাম, ভালই।

কে বেঁধেছে জানো?

না।

আমি।

তাই মাছের ঝোলে নুন বেশি মনে হচ্ছে।

মিথ্যে কথা। হতেই পারে না।

মেনিমাসী থাকতে তুমি কেন রাঁধতে গেলে?

তোমাকে তাক্ লাগিয়ে দেব মনে করে। মেনিমাসীও যেমন

তোমার মাসী নয়, আমিও তেমনি তোমার কেউ নই। একজন রাঁধলেই তো হল।

বিমলার মুখের ওপর কথা বলার সাহস ছিল না। চুপ করে গেলাম।

খেয়েদেয়ে মেনিমাসী গেল বাজারে দোক্তাপাতা কিনতে। আসল উদ্দেশ্য আমাদের তুজনকে একত্র থাকার সুযোগ করে দেওয়া। মেনিমাসী চলে যেতেই বললাম, দেখলে মাসীর বুদ্ধি।

কুবুদ্ধি বল।

কেন?

জোয়ান ছেলে আর মেয়ে, স্বামী স্ত্রী নয়। তাদের একঘরে আটকে রাখার অর্থ বেশ্যাবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া। তা হতে পারে না।

মনের প্রাণের কথা হতে তো পারে।

বিমলা খিল খিল করে হেসে উঠল।

সবই হতে পারে, বলে বিমলা টানতে টানতে আমায় মাসীর বিছানায় বসিয়ে দিয়ে আমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল। আমি তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে যেতেই বলল, খবরদার। খুব আস্কারা পেয়ে গেছ বুঝি!

বোকার মত চেয়ে থাকতে দেখে হেসে উঠল বিমলা।

নিজের মনেই বলে উঠল তোমার বেলায় ছি! ছি! আর আমার বেলায় ধন্য ধন্য।

বলা শেষ করেই মাথা উচু করে আমার ঠোঁটে ঠোঁট ছুইয়ে বলল, খুশী তো।

তার মুখখানা বুকের সঙ্গে চেপে ধরে বললাম, খুশী।

খুশীর আমেজ কাটতে বেশি দিন পেরোয় নি। হাসপাতালের স্লিপ নিয়ে যে পেয়াদা এসেছিল তাকে ভগ্নদূত অথবা যমদূত কোন আখ্যা দেব তা আজও স্থির করতে পারিনি। তুদিন আমি গ্রামে

যেতে পারিনি। বিমলা একাই গিয়েছিল মগরাহাট। সেখানে কোথাও কিছু খেয়েছিল। শেষ রাতে ভেদবমি সুরু। শাশুড়ী আর ননদকে মোটেই কিছু বলেনি ভোরের আগে। সকাল বেলায় যখন হাতপায়ে খিল ধরতে আরম্ভ করেছে তখন ননদকে ডেকে বলেছে তার অবস্থা। পাশের ঘরের লোকের সাহায্য নিয়ে ক্যাম্পবেল হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছিল ননদ। তখনও বিমলার জ্ঞান ছিল টনটনে। হাসপাতালের খাতায় আমার ঠিকানাটা লিখে দিয়েছিল স্বজন বলে।

খবর পেলাম বিকেলে।

ছুটে গেলাম দেখতে।

এই বিভাগে রুগীর সঙ্গে দেখা করা নিষেধ। বাইরে টাঙ্গানো চার্টে দেখতে হয় রুগীর অবস্থা। সেদিন ফিরে আসতে হল তাকে না দেখেই। সংবাদ পেলাম অবস্থা আশঙ্কাজনক।

পরের দিন সকাল না হতেই তার মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছল আমার কাছে।

ছুটে গিয়েছিলাম।

মৃতদেহ নেওয়া ভিন্ন আর কোন কাজ ছিল না সেদিন।

চিতায় তুলে দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম। মাসী ছাড়া আর একটি লোকই বোধহয় আমার জন্য কাঁদতো, আমার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হত। আর সে রইল না।

বিমলা চলে গেল।

কয়েকমাসের মধুর স্মৃতিতে পূর্ণ করে দিয়ে গেল আমায়।

মেনিমাসীও এসেছিল শ্মশানে। আমাকে ডেকে তুলে পাশে বসিয়ে প্রবোধ দিয়েছিল, আমি নীরবে শুনছিলাম।

সব শেষ। চিতা ধুয়ে, গঙ্গায় অস্থি দিয়ে ফিরে এলাম।

মেনিমাসীকে বললাম, বিমলার শ্রাদ্ধ করতে হবে মাসী।

গম্ভীরভাবে মেনিমাসী বলল, কোন অধিকারে? শ্রাদ্ধ করবি কোন সুবাদে!

তা জানি না। বিমলা ছিল আমার সর্বস্ব, তার মৃত্যুকে শ্রদ্ধা জানাতেই হবে।

বিমলা যে আমার কত আপন জন তা বোধগম্য হল সেদিন।

বিমলা মরবার পর আমার জীবনধারা গেল বদলে। মায়ের আশঙ্কা আমাকে পরিণতির দিকে ঠেলে নিয়ে চলল ধীরে ধীরে।

অনেকদিন পর সামরিক রিভলবারটা বের করে দেখলাম। নিজের বুকের কাছে নলটা চেপে ধরে ইচ্ছে হল নিজেকেই শেষ করে দেই একটি গুলীতে। পারলাম না। কেমন যেন মায়া, সে মায়া বাঁচার। মবাকে কত বেশি ভয় করি তা তখনই বুঝতে পারলাম।

দিনের পর দিন কেটে যায়।

তরকারির ব্যবসা বন্ধ। মাঝে মাঝে কোন বাজারে যাই, বেচা-কেনা লক্ষ্য করি, আবার ফিরে আসি। মেনিমাসী আমাকে নিয়ে বেশ চিন্তিত। সহসা তারও মনের পরিবর্তন ঘটল। আমাকে ডেকে চুপি চুপি বলল, চল নিমু কোথাও কদিন বেরিয়ে আসি। কলকাতা আর ভাল লাগছে না। যাবি?

কোথায় যাবে?

তুই ঠিক কর। আর বাপু ভাল লাগছে না। কাশীতে যাবি?

না মাসী। তীর্থস্থানগুলোকে বড়ই ভয়। তারচেয়ে চল কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায়। দেহটা মজবুত করতে পারবে। তোমারও তো দিন ঘনিয়ে আসছে, শেষ বয়সটাতে শরীর যাতে সুস্থ থাকে সেদিকে নজর দাও।

তোর যেমন কথা। শরীর তো ভালই আছে চিরকাল, মনটাই রুগ্ন হয়েছে খুব বেশি, তাই তীর্থস্থানই আমার শেষ আশ্রয়। তুই বাপু কোথাও ঘরটর ভাড়া নিয়ে আমাকে রেখে আয়।

সে সব ভেবে চিন্তে দেখব। এখন ও নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।

মেনিমাসীকে যতই যুক্তি দিয়ে বুঝাতে চাই ততই সে তার মতটাকে আঁকড়ে ধরে। অবশেষে তাকে সঙ্গে করে দেওঘরের টিকিট কেটে বসতে হল গাড়িতে।

হাত জোর করে কপালে ঠেকিয়ে মেনিমাসী বলল, বাবা বৈদ্যনাথ এবার মুখ তুলে তাকালেন। অনেক পাপ করেছি বাবা, যদি বাবার পায়ে ঠাঁই পাই তা হলে পরকালের চিন্তাটা আর করতে হবে না।

শহরের উপকণ্ঠে ছোট্ট একটা বাড়ি ভাড়া করে দিলাম। নিয়মিত যাতে বৈদ্যনাথের মাথায় জল দিতে পারে তার ব্যবস্থাও করা গেল। সারা মাসের খাবারের ব্যবস্থা করে বললাম, মাসী এবার আমার ছুটি।

এত তাড়াতাড়ি কেন যাবি। ক'দিন ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে নে।

না মাসী। পেট বাগ মানবে না। তোমার অনেক খেয়েছি, অনেক ঋণ তোমার কাছে। স্নেহের ঋণ শুধবার ক্ষমতা আমার নেই। যদি কোন কাজকম্ম করে তোমাকে কিছু প্রণামী দিতে পারি তার চেষ্টা করাই ভাল। সে চেষ্টা আমাকে করতেই হবে।

মেনিমাসীর নানা প্রতিবাদ ঠেলে ফিরে এলাম কলকাতায়। মেনিমাসীর ঘরেই আশ্রয় নিলাম। মনে মনে কেমন একটা আনন্দের অনুভূতি। বিমলা নেই, মেনিমাসীও দূরে, আমার আকর্ষণ বলতে আর কিছুই রইল না। এবার আমি সম্পূর্ণ মুক্ত। মেনিমাসীর ঘরে কদিন শুয়ে শুয়ে কাটল। কাজের কোন চেষ্টাই করতে পারিনি। ইচ্ছাও ছিল না। কেমন মানসিক আলস্যে দেহটাও প্রভাবিত।

বাইরের কোলাহলে ঘর থেকে বের হতে হল।

সবাই চিৎকার করছে ভোট দাও। আমাকে দাও, আমাকে দাও, আমাকে দাও। আমি ভাল, আমি তোমার বন্ধু, আমি তোমার মঙ্গল চাই, আমাকে ভোট দাও।

শুনতে ভালই লাগল।

ভোট।

এও এক যুদ্ধ।

গণ যুদ্ধ।

অনেক কথা, অনেক বাণী, অনেক বক্তৃতা। সব শুনলাম, পড়লাম। ভালই লাগল। বস্তির নেরু বলল, লেগে পড় নিমুদা, টু পাইস হবে।

নেরু টু পাইসের ধান্দায় ঘোরে। পয়সার গন্ধ পায় য়্যালসেশিয়ান কুকুরের মত। যথাসময়ে যথাস্থানে নেরুকে পাওয়া যায়। তাকে চিনি ভাল করেই।

বললাম, তোমার কিছু হল নেরু ?

কিছু না হলে কোন শালা যায় ওদের দলে।

কার দলে ?

কংগ্রেস। পয়সা দেবার ক্ষমতা আর কারও নেই নিমুদা। শালা কম্যুনিষ্টই বল আর হিন্দুমহাসভাই বল আর ফারাড ব্লক বল, কোন শালার পকেটে কিছু নেই, সব গড়ের মাঠ। কংগ্রেসে লেগে যাও, টু পাইস হবে, হয়ত ভাল একটা চাকরিও জুটে যেতে পারে। লাক্।

বললাম, তোমার কথা মনে থাকবে। ওসব হাঙ্গামায় যেতে ইচ্ছে নেই নেরু।

কি যে বল দাদা, ত্ব'একটা মাস কামাই করে নাও, আবার তো সেই পাঁচ বছর পরে। ততদিন শুকোতে হবে। তার চেয়ে যা পাও নিয়ে নাও।

পরে বলব, বলে নেরুর হাত থেকে রেহাই পেলাম।

বিকেলে কাপড় জামা বদলে পথ চলতে থাকি। চলতে চলতে কোন সময় এসে গেছি পুরানো লাহাবাড়ির সামনে তা টের পাইনি। গেটের সামনে মিঠুর সঙ্গে দেখা। মিঠু কেমন স্থবির হয়ে এসেছে। কয়েক বছরের ব্যবধানে এত পরিবর্তন, আশ্চর্য।

মিঠু আমাকে চিনতে পারেনি।

এগিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, মিঠুদা কেমন আছ?

ভাল। নির্বিকার জবাব।

তার জবাবে বুঝতে পারলাম আমাকে চিনতে পারেনি। আবার বললাম, আমি নিমু, চিনতে পারলে না?

মিঠু মুখ তুলে দেখল। চোখের দৃষ্টিক্ষমতা কমে গেছে, তাই চাউনিতে বিস্ময়। অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, চিনেছি। কেমন আছিস নিমু।

ভাল আছি। তুমি যে অনেক বুড়ো হয়ে গেলে।

তা তো হবেই।

মনে মনে হিসাব করে বলল, সাতচল্লিশ বছর চাকরি করছি লাহাবাড়িতে। চোদ্দ বছর বয়সে এসেছিলাম, এখন ষাট ছাড়িয়েছি। বয়স তো হয়েছেই।

বললাম, তা ঠিক। কর্তাবাবু কেমন আছে?

কর্তাবাবু আর নেই নিমু। ফতে হয়েছে।

মনটা দমে গেল। কবে গিরীনবাবু মারা গেছে তা জানবার আগ্রহ ছিল না। মিঠু কর্তাবাবুর মরার খবর দিয়ে চোখ বুঁজে কি যেন ভাবল।

আমি বললাম, মেনকাদিদি কোথায় জানো?

আরে আমাদের জামাইবাবু যে জজ হয়েছে, আলিপুরে আছে। বড়দিদি এখন বালিগঞ্জে। নতুন বাড়ি করেছে সেখানে।

বাড়ির ঠিকানা জান তুমি?

কেন? যাবি সেখানে? বাড়িটা চিনি, নম্বরটা জানি না। ত্রিকোণ পার্কটা দেখছিস। সেটা পেরিয়ে ডান দিকে যাবি। দেখবি অনেক বাড়ি তৈরী হচ্ছে, সেখানে লালরঙের একটা বাড়ি। বলবি জজ সাহেব, দত্ত সাহেবের বাড়ি। তুই যদি যাস তা হলে বড়দিকে আমার কথা বলিস।

মিঠুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরতি পথ ধরলাম।

পাশেই বড় রাস্তা। রাস্তার মোড়েই চায়ের দোকান। ঢুকে পড়লাম দোকানে। একপাশে ফাঁকা টেবিলে জায়গা করে নিলাম। দোকান সরগরম। সবার মুখে এক কথা 'ভোট'। মেয়ে পুরুষ দল বেঁধে বসেছে চা খেতে। পেয়ালার চা উত্তাপহীন, উত্তাপ রয়েছে তাদের আলোচনায়। আমি শ্রোতা। শুনতে আসিনি, শুনতে চাইনি তবুও শুনতে হচ্ছে। হঠাৎ একজন আমাকে লক্ষ্য করে বলল, আপনার কি মত বলুন তো!

আমি ইতস্তত করে বললাম, কোন বিষয়ে?

কাকে ভোট দেওয়া উচিত।

ভেবে বলতে হবে।

সেকি, আজকের এই গণতন্ত্রের যুগে কাকে ভোট দেবেন তা ভাবতে হবে! দেখুন, কংগ্রেস দেশের স্বাধীনতা এনেছে ষাট বছর লড়াই করে। তার দাবী রয়েছে সবার ওপর। নয়কি!

বললাম, কেউ যদি বলে কংগ্রেস দেশের সর্বনাশ করেছে, স্বাধীনতার ভেল্‌কি দেখিয়ে জনজীবনে অশান্তি এনেছে তা হলে আপনার কিছু বলার আছে কি?

ওসব কম্যুনিষ্টদের কথা। আপনি বুঝি,···

আজ্ঞে আমি কিছুই নই। ভোট নিয়ে মাথা ঘামাইনা, আগ্রহও নেই। আপনি বললেন, তাই কাউনটার সমালোচনা করলাম। বোধহয় আমার জীবনে এই প্রথম।

হতভম্বের মত আমার দিকে চেয়ে থেকে ভদ্রলোক পাশের লোককে বলল, সব রাশিয়া আর চীনের দালাল। ওরা দুহাতে লুটছে আর দেশের সর্বনাশ করছে।

সহ্য করতে পারলাম না মন্তব্য। বললাম, আপনার মতের সঙ্গে কারও মত না মিললেই বুঝি সে দালাল হবে। আশ্চর্য আপনাদের অঙ্ক।

ভদ্রলোক ক্রোধে ফেটে পড়ল। চিৎকার করে বলল, দালাল, নিশ্চয়ই দালাল। দালালের জায়গা নেই এদেশে। বাগবাজারে ওসব দালালী চলবে না। কলা বাগানের বস্তীতে ওসব দালালী সাজে। সেখানে যাও।

আমার পক্ষে সংযত থাকা কঠিন হল, তবুও সংযতভাবে বললাম, আপনি অনর্থক কেন রাগ করছেন!

রাগ! তোমাকে যে জুতিয়ে লাল করিনি এই তোমার ভাগ্যি। দালালীর জায়গা পাওনি শালা।

অসহ্য। তবুও সহ্য করে বেরিয়ে আসতে হল চায়ের দোকান থেকে। ভীড় জমে উঠবার উপক্রম হল। কলকাতার ভীড় হল সর্বনাশা। কে দোষী বিচার করার আগে নির্দোষ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাও বিচিত্র নয়। তাই বেরিয়ে পড়ে আত্মগোপন করা ছাড়া পথ ছিল না। বলতে গেলে পালিয়েই নির্যাতনের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করলাম।

ফিরে আসতেই নেরুর সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখেই দন্তবিকাশ করে নেরু বলল, আপনার খোঁজে সুবোধদা এসেছিল।

সুবোধদা! তিনি আবার কে?

সুবোধদাকে চেনেন না। লাক্। আমাদের সেক্রেটারী।

নেরুদের সেক্রেটারী! অদ্ভুত শোনাল তার কথা। বললাম, কেন এসেছিল?

আমি তোমার কথা বলতেই সুবোধদা বলল, এই রকম লোকেরই আমাদের দরকার। কম্যুনিষ্টদের শায়েস্তা করতে হলে শক্ত লোক দরকার। আমরা হলাম ছিঁচকে লোক, তুমি হলে খাটি মাল, আমাদের লিডার।

নেরু কথা শেষ করে একগাল হেসে নিল। রাতের আবছা আলোতে নেরুর চেহারা ভাল করে দেখা না গেলেও তার চোখ দুটো যে বাজপাখীর মত শিকার খুঁজছে তা বুঝতে কষ্ট হল না। নেরু

আভি ব্যস্ততার সঙ্গে বলল, তুমি কাল সকালে ঘরে থেক, সুবোধদা আবার আসবে। তোমার সঙ্গে দেখা না করে ছাড়বে না। আমি যাচ্ছি, তুমি থেক কিন্তু।

নেরু ত্বরিতে অন্ধকারে গা ঢাকা দিল।

বস্তির মুখে আকালুর সঙ্গে দেখা। আকালু কাজ করে নারকেল ডাঙ্গায় তার কোম্পানীতে। সকালবেলায় বের হয়ে সন্ধ্যেবেলায় ফেরে। ফেরার সময় তাড়ির দোকানে বিশ্রাম করে বেশ মৌজ-সহকারে ঘরে ফেরে। আজও মৌজ করেই আসছিল। আমাকে দেখেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কায়দা মাফিক স্যালুট করে বলল, ফৌজী সাহেব ভাল আছ তো?

ওর ভঙ্গী দেখে হেসে উঠলাম। বললাম, তুমি ভাল আছ তো?

ছিলাম, এখন নেই।

মানে?

মানে নেরু আজকাল খুবই উৎপাত সুরু করেছে। আমার ঘরের লোক নিয়ে টানাটানি করছে।

তুমি জানলে কি করে?

রুপো বলছিল। পাঁচবছর ঘর করছি, সে না বলে পারে। বলল, নেরু আজকাল চোলাইয়ের ব্যবসা করছে, অনেক পয়সা। কংগ্রেসী-বাবুরা পয়সা দিচ্ছে। নেরুর পয়সার গরম হয়েছে। রুপোকে বলেছে, তোকে নতুন শাড়ি, সোনার মাকড়ি দেব, আকালুকে তাড়িয়ে দে। আমিও বাপের বেটা, দেখব নেরুকে। তোমাকে বলে রাখলাম হাবিলদার, ওকে জানেমানে মেরে শেষ করব।

কথা বলা শেষ করে আকালু টলতে টলতে তার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

হোটেল থেকে খেয়ে এসে শুয়ে পড়লাম। ঘুম আসছিল না চোখে। মেয়ে মানুষের ফোঁফানি শুনে উঠে বসলাম। তখন বেশ ভীড় জমেছে দক্ষিণদিকের ঘরটায়। দরজা খুলে দাঁড়ালাম। রুপোর

কান্না। আকালু তার সতীত্বে সন্দেহ করে তাকে চরিত্রবতী করার অভিভাবক সেজেছে লাঠি হাতে করে।

মনে মনে হাসলাম।

রুপো বোধহয় আকালুর চেয়ে বয়সে বড়। কমপক্ষে পাঁচজনের ঘর করেছে তার প্রথম যৌবনে। যৌবন থিতিয়ে আসতে আশঙ্কায় ঘর বেঁধেছে আকালুর সঙ্গে। বয়স তার কত তা বলা কঠিন, তবে দেহটা তার বয়স বলছে পঁচিশ পেরোয়নি। আকালু সেই পঁচিশ বছর বয়সকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চেয়েছে পাঁচ বছর এক নাগারে। রুপোর বয়স বাড়লেও দেহের জৌলুষ কমেনি। তাই নজর পড়েছে নেরুর, কারণ নেরুর পয়সা হয়েছে আজকাল। নেরুকে জানেমানে মেরে শেষ করতে না পেরে রুপোর ওপর শোধ তুলছে আকালু।

ঘটনাটা বেশ পরিষ্কার হল।

রুপো এতক্ষণ ফোঁপাচ্ছিল। এবার শোনা গেল তার কণ্ঠ। লোক জমেছে, তার সাহসও বেড়েছে। সে এবার অশ্লীলভাষায় গালমন্দ সুরু করল আকালুকে। সবাই শুনল, কেউ আকালুর পক্ষ সমর্থন করল, কেউ রুপোর, তারপর সব চুপচাপ। যে যার মত ফিরে গেল নিজের ঘরে।

দাম্পত্য কলহ।

অজাযুদ্ধে লঘুক্রিয়া।

আমিও এসে শুয়ে পড়লাম।

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠেই কাপড়জামা বদলে ছুটলাম বালিগঞ্জের দিকে। মেনকাদিদির সঙ্গে দেখা করার প্রবল বাসনা আমাকে যেন টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল।

খুঁজে বের করলাম সেই লাল বাড়িটা। বাড়ির সামনে বোর্ড ঝুলছে Mr. A. Dutta, Addisional Session Judge,—আমার প্রার্থিত স্থানে এসে গেছি। এতক্ষণ যে উৎসাহ নিয়ে এসেছি তা ঐ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে লোপ পেল। কেমন একটা ভীতি, কেমন

একটা লজ্জা আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে, আমি আর এক পাও এগোতে পারছি না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম দরজার সামনে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। হঠাৎ কানে এল, কাকে চাই?

গলা আমার শুকিয়ে গেছে।

তাকিয়ে দেখলাম বাজারের থলি হাতে করে একটি গৃহভৃত্য।

বললাম, মেনকাদিদি এখানে থাকেন।

গিন্নিমার কথা বলছেন, কোথা থেকে আসছেন?

আসছি নয়নতারার গলি থেকে। গিন্নিমাকে গিয়ে বল, নির্মল এসেছে দেখা করতে।

বাজারের থলি হাতে করে ভেতরে গেল গৃহভৃত্য। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম দরজার সামনে।

প্রায় আধঘন্টা বাদে ফিরে এসে বলল, আসুন।

আমাকে নিয়ে হাজির করল মেনকাদিদির সামনে। আমি বিস্মিতভাবে দেখছিলাম মেনকাদিদিকে। প্রায় বার তের বছর পর দেখা। মেনকাদিদির সে চেহারা নেই, রোগা হয়ে গেছে দেহটা। চোখের কোনে কালি। আমি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললাম, আমি নিমু।

চিনেছি। বস। বলে মেনকাদিদি চাকরকে বলল, বেতের মোড়া এগিয়ে দিতে।

বললাম, রাস্তায় আপনাকে দেখলে চিনতে পারতাম না বড় দিদি।

আমিও না। কি করছিস আজকাল?

বসে আছি। মিলিটারী থেকে ছুটি পেয়ে কিছুকাল তরকারির ব্যবসা করেছি, তা সহ্য হল না। এখন একদম বেকার। ভাবছি কোন ছোটখাট ব্যবসা করব। দেশের যা অবস্থা, কি যে হবে তা ঠিক করতে পারছি না।

বিয়ে করেছিস নিমু?

চমকে উঠলাম। মনে পড়ল বিমলাকে।

কথা বলছিস না কেন?

বললাম, বিয়ে করার সময় পাইনি।

তা হলে ইচ্ছে আছে।

লজ্জায় মাথা নীচু করে বললাম, জানি না।

মেনকাদিদি কথা ঘুরিয়ে বলল, সকালে কি খেয়েছিস। খাস নি কিছু?

না। কাল মিঠুর কাছ থেকে আপনার খবর পেয়ে অবধি ছটফট করেছি আপনাকে দেখতে। ঘুম থেকে উঠেই ছুটে এসেছি।

মেনকাদিদির চোখ কথা বলল। ইঙ্গিত পৌঁছল চাকরের মনে।

হ্যাঁরে নিমু, শুনেছিলাম তুই নাকি মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে দেখা করতিস?

মাঝে মাঝে না বড়দি, সেবার কলকাতায় এসেছিলাম কয়েক-দিনের জন্য,সে সময় একদিন কর্তাবাবুকে প্রণাম করতে গিয়েছিলাম। অনেক ঋণ আপনার কাছে আর কর্তাবাবুর কাছে। ঋণ-শোধ দেবার জন্য কিছুই নেই ঐ প্রণামটুকু ছাড়া। তাই যখনই আপনাদের সংবাদ পাই তখনই প্রণাম করতে আসি।

মেনকাদিদি হাসল।

বললাম, আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, আপনি আমাকে সঙ্গে নেবেন বলেছিলেন!

কথাটা ঠিক। কিন্তু আমার সঙ্গে থাকলে তুইতো চিরজীবন নিমু চাকর হয়েই থাকতিস। তার চেয়ে তোকে ছেড়ে দিয়েছিলাম মানুষের ভীড়ে, সেখানে তুই খুঁটে খেতে শিখেছিস, সেটাই কি ভাল হয়নি!

তা ঠিক। কিন্তু বড়দি, মানুষতো শুধু খুঁটে খেয়েই খুশী হয় না। মানুষ চায় মা-বোনের স্নেহ ভালবাসা। আমি যে কিছুই পাইনি।

যা কিছু প্রাপ্য ছিল তার আংশিক পূর্ণ করেছিলেন আপনি আর মেনিমাসী। মেনিমাসী আমাদের প্রতিবেশী এক নিঃসন্তান মহিলা। তাই স্নেহটা পেতাম তার কাছেও, এখনও তা পাই।

মেনকাদিদি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

চাকর খাবার এনে হাজির করতেই মেনকাদিদি ভেতরে গেল। কিছুক্ষণ বাদে আবার এসে বসল আমার সামনে। আমার দিকে চেয়ে বলল, আমারও মা মারা গিয়েছিলেন ছোটবেলায়। কত ছোট ছিলাম তা তোকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। মায়ের স্নেহ আমিও পাইনি, তাই দুঃখ আমারও কম নয়। তা বলে আমি আমার কর্তব্য না করে তো পারি না। নদীর বুক শুকিয়ে গেলেও বালি খুঁড়ে জল বের করাই রীতি। সেটাই করা উচিত। তোর বড় জামাইবাবু আরেক অদ্ভুত লোক। সারাদিন মোকদ্দমার নথি নিয়ে ব্যস্ত। তাকে নিয়ে ঘর করা একটা তামাসার ব্যাপার, তবুও তো ঘর করছি। না পেয়েও পাওয়ার আনন্দ ভোগ করছি। তেমনি ধারা তোকেও হতে হবে রে নিমু।

ঠিক বলেছেন বড়দিদি। পাওয়ার আনন্দ আশঙ্কা নিয়ে জন্মায়। না পাওয়ার ক্ষোভের পেছনে থাকে আশার আনন্দ। সেটাই ভাল।

তুই তো অনেক শিখেছিস নিমু!

হেসে বললাম, আপনার দয়া। আপনি যদি আমাকে না শেখাতেন তা হলে আজ আমি কোথায় যে ভেসে যেতাম তা নিজেই জানিনা।

খাওয়া শেষ করে প্রণাম করলাম মেনকাদিদিকে।

আবার আসিস ভাই।

তা আর বলতে হবে না। আপনার এই ভাইটির উৎপাতে অস্থির হতে হবে।

মেনকাদিদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার পথে এসে দাঁড়ালাম। ফিরে ফিরে দেখছিলাম বাড়িখানা। কিন্তু যে বাড়ির

স্মৃতির সঙ্গে মেনকা দিদি জড়িত সে বাড়ির তুলনায় এই বাড়ি কত তুচ্ছ! যে মেনকাদিদিকে দেখেছি লাহা বাড়িতে সে মেনকাদিদির কঙ্কালকে যেন দেখলাম আজ। মনটা খারাপ হয়ে গেল। আনমনা পথ চলছিলাম। থামতে হল। সেই 'ভোট ফর' পতাকা আর ফেসটুন নিয়ে পথ পরিক্রমা করছে কোন দলীয় স্বেচ্ছাসেবকের দল। দাঁড়িয়ে দেখলাম। স্বাধীনতার দান গণতন্ত্র, গণতন্ত্রের দান ভোট ফর, ভোট ফর। ভোট ফরের দান সমাজে বিশৃঙ্খলা। সমাজে বিশৃঙ্খলার দান বৈরী প্রতিবেশী। বৈরী প্রতিবেশীর দান গৃহবিবাদ। মূল নড়িয়ে দিয়েছে স্বাধীনতা। আমি তোমার ভাল করব, আমাকে ভোট দাও। কেন? তোমার যদি ভাল করার ইচ্ছাই থাকে, তা হলে তুমি গদীতে না বসেও তো তা করতে পার। তা করছ না কেন? ক্ষমতা চাই হাতে। কিসের ক্ষমতা! তা জানি না। জানো, শাসন করার শোষণ করার অবাধ ক্ষমতা। তোমার ভাল করার ইচ্ছার পেছনে রয়েছে আত্মসুখ, অপরের সুখ নয়। ওসব ওরাও জানে, যারা 'ভোট ফর' করছে তারাও জানে, তবুও সাময়িক লাভের আশায় সবাই মেতেছে 'ভোট ফর'-এর ধান্ধায়।

একটুকরো ছাপা কাগজ হাতে গছিয়ে দিয়ে একজন বলল, পড়ুন।

পড়েছিলাম। তার আগে দেখেছিলাম একটা পোস্টার। হাতে লেখা ছাপায় লেখা পোস্টারে শহর নতুন চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রণয়িনীকে যে যার মনের মনের মত সাজিয়েছে। রূপসজ্জা যারা দেখবে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই। শোভাযাত্রা পেরিয়ে যেতেই ট্রামে উঠে বসলাম। পড়লাম সেই ছাপা কাগজ।

'আমি ভাল'।

আমার মত দেশপ্রেমী দেশদরদী কোথায় খুঁজে পাবে তুমি!

ভাঁজ করে পকেটে রাখলাম কাগজটা।

দশটা না বাজতেই নয়নতারার গলির মুখে পৌঁছে আবার থমকে দাঁড়াতে হল। গলির মুখে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আকালু। চোখ দুটো লাল, বোধহয় তাড়ির প্রসাদে। আমাকে দেখেই আকালু এগিয়ে এল; সেলাম দিল মিলিটারী কায়দায়।

জিজ্ঞেস করলাম, কি খবর আকালু?

ভোটওলাদের মাথা ফাটাব।

হঠাৎ এই দুর্বুদ্ধি কেন?

নেরু শালা রুপোকে ভাগিয়েছে। ভোটওলা হয়েছে নেরু। সব শালা ভোটওলা হল বদমায়েস। ওদের রক্ত দেখব তবেই অন্ন তুলব মুখে।

আকালু ক্ষিপ্ত হয়েছে। তবে ক্ষিপ্ত হবার কারণও যথেষ্ট। রুপো ঘর ছেড়েছে। নেরুর সঙ্গে নিশ্চয়ই যায়নি। হয়ত নেরুর ইঙ্গিতে কোথাও আত্মগোপন করেছে। গতরাতের দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল। আকালুকে বললাম, কাল রুপোকে মেরেছিলে তুমি?

সে তো সামান্য দুএক ঘা।

সেজন্যেই রুপো পালিয়েছে। রুপো তো তোমার সাতপাকের বউ নয়। অত্যাচার করলে পোষা কুকুরও কামড়ে দেয়। নেরুকে কেন দুষছ।

আকালু কেমন ঝিমিয়ে গেল আমার কথা শুনে।

হঠাৎ লাঠিখানা মাটিতে ফেলে দিয়ে বলল, ঠিক বলেছ হাবিলদার। রুপো তো আমার সাতপাকের বউ নয়। থাকবে কেন চড়-চাপড় খেয়ে। ঘরের বউ হলে চড়চাপড় খেয়েও ভাতকাপড় পেলেই খুশী। আমারই ভুল হয়েছে। কাল একটু বেশি নেশা হয়েছিল।

আজকের দিনটা অপেক্ষা কর। খবর ঠিকই পাবে। রুপোর গায়ের জ্বালা গেলে নিশ্চয় ফিরে আসবে। পাঁচ বছরের ঘর এক দিনে ভাঙতে চাইবে না।

আকালু স্বীকার করল তার অপরাধ। রাজি হল রুপোর জন্য প্রতীক্ষা করতে।

ঘরে এসে দম ছেড়ে বাঁচলাম।

বাইরের আবহাওয়া বড়ই ঘোলাটে মনে হচ্ছিল। কোনরকমে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে পারলে সৌভাগ্যবান মনে করব নিজেকে। পেটের তাগাদা ছিল না, খেয়ে এসেছি, তাই গা এলিয়ে দিলাম বিছানায়। কতক্ষণ জানিনা। চোখ জড়িয়ে এসেছে এমন সময় দরজায় ধাক্কা পড়ল। উঠে দরজা খুলতেই দেখি অপরিচিত একটি যুবক। প্রশ্ন করলাম কাকে চাই?

আপনাকে। আপনার কাছেই এসেছি।

সুবোধবাবুর কাছ থেকে বুঝি?

না। সুবোধবাবুকে আমি চিনি না। আমি এসেছি পাশের বস্তি থেকে। আপনার নাম শুনেছি। ভাবছিলাম পরিচয় করা উচিত, তাই এসেছি।

বসুন। আপনার নাম?

অমিয় বিশ্বাস।

বসুন, তারপর বলুন কি বলতে চান।

জানেন তো পাড়ায় বড় গরম?

কই, এখন তো শীতকাল।

তা বলছি না। ভোটের জন্য মেতেছে সবাই। পাড়া গরম হয়ে আছে।

তাই মনে হচ্ছে বটে। আপনিও কি ভোটের জন্য এসেছেন? আমার তো মাত্র একটা ভোট। ক'জনকে দেব?

আপনি কি প্রমিজ করেছেন কাউকে?

না। প্রমিজ করব কিনা তাও ঠিক করিনি এখনও।

ভালই করেছেন। কিন্তু আপনার ভোটই তো সব নয়। বস্তির সব ভোটের দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে। আমাদের তো পয়সা।

নেই তাই আমরা ভাল ভাল কর্মিদের পাঠিয়েছি ভোটের জন্য। আপনাকে আমরা মনে করি একজন ভাল কর্মী।

হেসে বললাম, আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করছি। আমি কর্মী নই, কর্ম কল্পার ক্ষমতাও আমার নেই। ইচ্ছাও নেই, কেননা ভোট দিয়ে কি হবে! আমি আপনি সেই পথে পথেই ঘুরব, যারা চতুর তারা সার বস্তুর সদ্ব্যবহার করবে। সেখানে আপনার আমার প্রবেশ নিষেধ।

কিন্তু দেশের শাসন ব্যবস্থা চালু রাখতে সরকার গঠন করতে তো হবে।

এখন কি সরকার নেই।

গণতন্ত্রী সরকার চাই। মানে আমরা চাই ডেমোক্রেসী।

বাধা দিয়ে বললাম, হিপোক্রেসী নয় নিশ্চয়ই।

নিশ্চয় নয়।

কিন্তু এ পর্যন্ত আপনি তো বললেন না আপনার দলের নাম, তার কি নীতি। অথচ আমাকে কর্মী স্থির করে কর্ম দেবার চেষ্টা করছেন!

ভুল হয়ে গেছে। আমি মহাসভার কথা বলছি! জানেন তো মুসলমানরা দাবী করল তারা ভারতীয় নয়, তারা মুসলমান। কংগ্রেস তা স্বীকার করে মুসলমানদের দিয়েছে পাকিস্তান। অথচ এখানে সেই সব মুসলমানরাই জামাই আদরে বাস করছে। আর কংগ্রেস তাদের তোষণ করছে ভোটের আশায়। আজ হিন্দুকে বাঁচতে হবে হিন্দুত্ব নিয়ে, ভারতীয় ঐতিহ্য বজায় রেখে। এই মহৎ কাজে আপনার সহায়তা পাব আশা করছি।

আপনাকে হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারছি না, ভেবে বলব।

বেশ তাই করুন। কবে আসব?

আসতে হবেনা। যদি আপনাদের নীতি আমার মনোগত অভিলাষ পুর্ণ করতে পারে তা হলে আমিই যাব্র আপনার কাছে।

বিদায় নিল অমিয় বিশ্বাস।

আমি দরজা বন্ধ করে বিছানায় আশ্রয় নিলাম। রাজনীতির প্যাঁচে ক্রমেই ঘুলিয়ে উঠল আমার মগজ। ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না কোনটা সত্যিকার বাঁচার পথ।

ভোট পর্ব শেষ হবার মুখে।

চারিদিকে শুধু চিৎকার আর জটলা। ঘণ্টায় ঘণ্টায় সভা। পথ কর্ণারে সভা, ময়দানে সভা, গলিতে সভা, পার্কে সভা। মানুষেরও ধৈর্য লক্ষণীয়। তারা সভার নাম শুনে জড়ো হয়। বক্তব্য শোনে, মন্তব্য করে, আবার ঝগড়াও বাধায়।

আমি নির্বিকার। নেরু নিরস্ত হয়েছে। অমিয় বিশ্বাস আর আসেনি। আমি ভাবছি কি করে কর্ম সংস্থান সম্ভব। কি করে নিজের দায় নিজে বহন করতে পারি। তার চেষ্টাই বড় চেষ্টা।

রোজ সকালে আশা নিয়ে বের হই কর্ম প্রাপ্তির আশায়, ফিরে আসি নৈরাশ্য সম্বল করে।

রোজই সন্ধ্যায় হোটেলে খেয়ে গা এলিয়ে দেই বিছানায়। কেউ আমার হদিসও পায় না।

আমার পরিচয় এক্স্ সার্ভিস ম্যান।

লেখাপড়ায় কতদূর?—স্কুলে পড়িনি কোন কালেও।

গৃহভৃত্য ভিন্ন অন্য চাকরি তোমার যোগ্যতায় পাওয়া সম্ভব নয়।

এই প্রত্যুত্তর শুনে আসছি রোজই।

আমরা ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেছি।

মোটেই নয়। তোমরা ইংরেজের ভাড়াটিয়া লোক, ভারতের পরাধীনতাকে কায়েম রাখতে লড়াই করতে গিয়েছিলে, তোমাদের অবদান নেই ভারত স্বাধীন করতে।

কেন? নৌ-বিদ্রোহ।

ওটা ছেলেমানুষী। তোমাদের ছেলেমানুষীর ফল কি হত জানো? বোম্বাইতে ভারতীয় মূলধন ধ্বংস হত। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ভারত পিছিয়ে পড়ত। নতুন ভারত গড়তে যে মূলধন, যে শিল্পোন্নতির প্রয়োজন তার মূলে তোমরা কুঠারাঘাত করতে উদ্যত হয়েছিল। নৌ-বিদ্রোহ হল ভারতের সর্বনাশের প্রথম প্রচেষ্টা।

থমকে গেলাম।

আবার স্মরণ করলাম, কোষ্টাল ব্যাটারির শহীদদের কথাও কি ভুলে গেছ?

যারা ভুল পথে চলে তাদের ভুলে যাওয়াই ধর্ম। তুমি যার ভৃত্য তার সেবা তোমার ধর্ম। তুমি বিদ্রোহ করেছিলে ঠিকই, কিন্তু তার অর্থ নেমকহারামী। নেমকহারামের স্থান নেই ভারতে।

কিন্তু!

আবার কিন্তু কি?

যাদের মাথায় সাদা টুপি দেখছি, যারা ভোটের জন্য দুয়ারে দুয়ারে কেঁদে বেড়াচ্ছে, তাদের অনেককেই আমরা কিছু কিছু চিনি। ওরাই তো একদিন ইংরেজের পয়সা খেয়ে সহকর্মীদের জেলে পাঠিয়েছিল!

প্রমাণ আছে? কাগজে কলমে দলিল দস্তাবেজে প্রমাণ দিতে পার। জানো, যা আদালতে প্রমাণ করা যায় না তা মিথ্যা।

ঘাবড়ে গেলাম! তাইতো!

আবার উত্তর পেলাম, যারা জেলে যায় তারা বেওকুফ। যারা বাইরে থেকে অপরকে জেলে পাঠায় তারাই হল নেতা। নেতাদের কথা চিন্তা কর। কত ত্যাগ স্বীকার করেছে তারা তা তুমি চিন্তাও করতে পার না।

যুক্তির পর যুক্তি। সু-যুক্তি কুযুক্তির সমাহার।

শুনে শুনে ফিরে আসি ঘরে। ভাবতে থাকি অন্ধকার

ভবিষ্যতের কথা। পকেটের সঞ্চয় কমছে, এই সময় অর্থ করে নিতে না পারলে অনাহার নিশ্চিত।

ভাবলাম, একটা পেট চলে যাবে কোন রকম।

আরও প্রয়োজন তো আছে জীবনে!

তা বটে।

বাইরে চিৎকার ভোট ফর। দো-দো রুপেয়া এক-এক ভোট। চিন্তার সূত্র গেল ছিঁড়ে।

রাতের পর দিন আসে, দিনের পর রাত।

তারপর এল ভোটের দিন।

কেউ গেল কেউ গেল না। আমি যাব যাব করেও আর যাওয়া হল না।

কদিন পরে উজির আমীর ওমরাহদের নাম বের হল কাগজে। বিজয়ীরা উৎসব করল, আবীর মেখে বিজয়ী বীর রাস্তায় রাস্তায় নিজের পরিচয় জাহির করল। তার পরেই সব আবার ঠাণ্ডা।

নেরুকে দেখলাম চুপ করে বসে আছে রোয়াকে।

জিজ্ঞেস করলাম, কি সংবাদ নেরু?

নেরু মাথা নেড়ে বলল, পাঁচ বছর।

মানে?

পাঁচ বছর বেকার থাকতে হবে।

কেন?

সামনে নববর্ষ, তারপর কবি প্রণাম, তারপর জন্মাষ্টমী, দেখতে দেখতে এসে যাবে মহাপূজা, সবাই উৎসবে মাতবে শ্যামা দর্শনে, শীত জমলে মা বাগ্‌দেবী। একটার পর একটা রয়েছে বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনে। লেগে পড় নেরু। বেকারত্ব থাকবে না।

কথাগুলো পছন্দ হল নেরুর। সোল্লাসে বলল, ঠিক বলেছ নিমুদা।

রোয়াক গুলজার হয়ে উঠল ক'দিনেই।

. নেরু মেতে উঠল সমাজ সেবায়। আমি ছুটে গেলাম দেওঘরে। মেনিমাসীর অসুখ-সংবাদ এসেছে। তাকে দেখতে যাওয়া আমার পক্ষে অপরিহার্য। সকাল বেলায় দেওঘর পৌঁছেই ছুটে গেলাম মেনিমাসীর আস্তানায়। আমাকে দেখতে পেয়ে মেনিমাসী বিছানা ছেড়ে নিজেই উঠে এসেছিল। আমাকে সাদরে ডেকে নিল ঘরে।

তোমার কি হয়েছে মাসী?

আমার প্রথম প্রশ্নে মাসী ঘাবড়ে গেল। সামলে নিয়ে বলল, খুব কিছু নয়। এখন ভাল আছি।

কিন্তু তোমার চিঠিতে,...

বাধা দিয়ে মেনিমাসী বলল, আমি তো লিখতে জানি না! পরকে দিয়ে লেখাই। কি লিখতে কি লিখেছে কে জানে! অনেক-দিন তোকে না দেখে মনটা হাঁপিয়ে উঠেছিল।

তাই বল। সেই জন্যেই মিথ্যে মিথ্যে অসুখের খবর দিয়েছিলে!

তা যা মনে করিস। হাঁরে কাজ কম্ম হল কিছু?

না মাসী। চাকরি কেউ দিল না। আমিও আশা ছেড়ে দিয়েছি। ভাবছি, কোন ছোটখাট ব্যবসা যদি করতে পারি তার চেষ্টা দেখব। কিন্তু আমাকে দেখতে এত তাড়াহুড়া কেন! তোমার মতলব কিছু আছে বোধহয়!

মেনিমাসী হেসে বলল, মতলব নিশ্চয়ই কিছু আছে। আগে খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম কর। পরে বলব।

আমি কোন আগ্রহ না দেখিয়ে কাপড় জামা বদলে খাবারের অপেক্ষা করতে থাকি।

সারাদিন মেনিমাসী বাড়ি ছিল না। আমিও রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি অপনোদন করলাম দিবানিদ্রা দিয়ে। সন্ধ্যাবেলায় একদল মহিলার সঙ্গে মাসী ফিরে এল বাসায়। এসেই জিজ্ঞেস করল, ঘুম কেমন হল নিমু?

ভালই হয়েছে মাসী। দেহটা বেশ ঝরঝরে হয়েছে। তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?

কত জায়গায়। বাবার মন্দিরে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে সইয়ের বাড়ি। তারপর বাজার হাট করে ফিরছি।. সই এসেছে তোকে দেখতে।

আমাকে দেখতে!. আমি কি দেখবার মত বস্তু নাকি ?

না-রে না। আমার বোনের ছেলে দেখবে না ওরা। এখানে থাকি, ওদের সঙ্গে বাবার মন্দিরেই পরিচয়। আমার তো কোন সঙ্গী সাথী ছিল না, ওদের পেয়ে বেশ কাটছে দিনগুলো। লোক খুবই ভাল। অল্প বয়সে দুটো মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়েছিল। বিষয় সম্পত্তি দেওরে নিয়ে নিল ফাঁকি দিয়ে, হাতের কাছে যা কিছু ছিল তাই নিয়ে এখন তীর্থে এসে বাস করছে। পাশের বাড়ির বউটা ওদের খুব যত্ন আদর করে। সেও এসেছে।

এক সঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে মেনিমাসী হাঁপাতে থাকে।

তা হলে ডাক ওদের, আমি চিড়িয়াখানার অথবা যাদুঘরের বস্তু কিনা পরখ করুক সবাই।

মেনিমাসীকে ডাকতে হয় নি। দরজার পাশেই দাঁড়িয়েছিল সকলে। আমার কথা সব কিছুই শুনেছিল। কথা শেষ হতেই ঘোমটা টেনে একজন বিধবা মহিলা এসে প্রবেশ করল ঘরে।

এই আমার সই শোভনার মা। প্রণাম কর নিমু।

মেনিমাসীর আদেশে প্রণাম করতেই শোভনার মা বলল, বেঁচে থাক বাবা।

পরিচয় পর্ব শেষ হতে বিশেষ বিলম্ব হল না। যাবার বেলায় তার বাড়িতে আগামী মধ্যাহ্নে খুদকুঁড়ো খাবার নেমতন্ন করে গেল মাসীর সই। আমি 'না' বলতে পারলাম না।

সবাইকে বিদায় দিয়ে মেনিমাসী ফিরে আসতেই জিজ্ঞেস করলাম, তোমার মতলবটা কি বল দিকি ?

মতলব বুঝতে পারিস নি! লেখাপড়া জানা ছেলে এত বোকা তো কখনও হয় না!

কখনও না হলেও এখন তো হয়েছি। তোমার মতলবটা খুলেই বল।

ঘর সংসার করতে হবে না?—গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল মেনি-মাসী।

তাই বুঝি শোভনার সর্বনাশ করতে চাইছ। নিজের পেটের ভাত জোগাড় করতে পারিনে এখনও, তোমার শোভনার পেটের ভাত জোগাড় করা তো দূরের কথা! তোমার মাথায় এ ভূত চাপল কেন বলতে পার?

শোভনার ভাবনা তোর নয়, সে ভাবনা আমার। তুই বিয়ে করবি কিনা বল?

বিয়ে আমার সহ্য হবে না মাসী। ভেবেছিলাম বিমলাকে বিয়ে করব, সে তো বাঁচল না। আবার শোভনাকে বিয়ে করতে চাইলে ছাঁদনাতলায় সে মুচ্ছো গিয়ে না মরে।

যত সব অলুক্ষণে কথা। তা হলে কথা দেব ওদের।

আমাকে ভাবতে দাও মাসী। কাল দুপুরে নেমতন্ন খেতে যাব। সেখানে শোভনাকে দেখব, তার সঙ্গে কথা বলব, তারপর তোমাকে আমার মত জানাব।

বেশ তাই হবে। বলে মেনিমাসী সে প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে রান্নার জোগাড়ে গেল।

আমিও নিশ্চিন্তে বালিশ টেনে নিয়ে আবার ঘুমের চেষ্টা করতে থাকি।

পরের দিন মেনিমাসীর সঙ্গে গেলাম শোভনাদের বাড়িতে নেমতন্ন রক্ষা করতে। আমাদের অভ্যর্থনা জানাবার দায়িত্ব ছিল শোভনার। বসবার ব্যবস্থা করে চায়ের জোগাড়ে যেতেই মেনিমাসী উঠে দাঁড়িয়ে বলল আমাকে, এই হল শোভনা। ও যখন চা নিয়ে

ফিরে আসবে তখন কথা বলিস। মেয়েটা কাজেকর্মে কথা বার্তায় খুবই চৌকস। ওকে দেখলেও সুখ।

বললাম, আচ্ছা।

মাসী চলে গেল তার সই-এর কাছে।

ঘরে বসে রইলাম একাই।

শোভনা চায়ের পেয়ালা হাতে করে ঘরে ঢুকে বলল, চা খান।

হাত বাড়িয়ে পেয়ালাটা নিয়ে বললাম, আপনার সঙ্গে একটু আলাপ আলোচনা করতে চাই।

শোভনার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। কোন রকমে ঢোক গিলে বলল, বলুন।

আপনি বসুন। অনেক কথা বলতে হবে। না, না। বসতেই হবে। আপনি তো জানেন আপনার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হচ্ছে?

শোভনা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

বললাম, আমাদের দেশে চেনা নেই জানা নেই ছেলে মেয়ের বিয়ে দেয় বাপ মায়ে। এই চিরাচরিত প্রথায় আমার বিশেষ শ্রদ্ধা নেই। সেজন্য যাচাই করে নেবার প্রশ্ন জেগেছে মনে। আপনাকে যাচাই না করে আমাকে যাচাই করবার সুযোগ আপনাকে দিচ্ছি। ওকি, উঠছেন কেন, আসল বিষয় তো বলাই হয় নি, এ তো ভূমিকা! আপনি জানেন কি আমি বেকার?

মৃদুস্বরে শোভনা বলল, জানি।

আপনার দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে অথচ আপনার প্রয়োজনীয় অন্ন সংস্থান করার সামর্থ্যটুকুও আমার নেই।

আপনার মাসীর যথেষ্ট আছে।

মাসী নিশ্চয়ই তা বলেছে, কিন্তু যার ক্ষমতা নেই নিজের স্ত্রী প্রতিপালনের তার পক্ষে স্ত্রীর ওপর কোন দাবী রাখাও সম্ভব নয়। মাসীর ভরসায় বিয়ে করাটা নির্বোধের কাজ।

সে বিষয়ে আপনি আমার ওপর নির্ভর করতে পারেন।

আপনার ওপর নির্ভর করতে পারতাম কিন্তু আপনি কি জানেন আমার পিতামাতার পরিচয়।

জানি না।

আমার পরিচয় আমাতেই শেষ নয়। আমার পরিচয়, আমার জন্মবৃত্তান্ত, আমার পিতা-মাতা, আমার কর্ম। এসব বিষয়ে ভাল করে খোঁজ নিয়ে অগ্রসর হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আশা করি, আপনি আপনার মায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলে নেবেন।

শোভনা মুখ লাল করে উঠে গেল।

ভেবেছিলাম ঝড় উঠবে।

কোথাও কোন কম্পন দেখতে পেলাম না। অতিথি সংকারের ব্যবস্থা ভালই এবং সুষ্ঠু। শোভনা আর তার ছোট বোন রমলা পরিবেশন করল কোমরে কাপড় জড়িয়ে। আমি শোভনার দিকে মুখ তুলে তাকাবার ভরসা পাচ্ছিলাম না, কিন্তু শোভনা ছিল অতিশয় সপ্রতিভ। কিছুক্ষণ আগে যে সব প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছি তার ছাপ পড়েনি তার কোন কাজেই।

মেনিমাসী খুব খুশী মনে যখন ফিরে এল তার আস্তানায় তখন বিশ্বাস জন্মাল শোভনা আমাব বিষয় নিয়ে কোন রকমই আলোচনা করেনি। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

মেনিমাসী বলল, সই খুব খুশী হয়েছে তোকে দেখে। বলল, হাঁ ছেলের মত ছেলে। শোভনার সঙ্গে মানাবেও ভাল।

শোভনা কিছু বলল না?

হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছে। তোকে কাল একবার যেতে বলেছে। যাক, তোদের মনের মিল যে হবে তা বুঝতে পারছি। ভগবান তোদের সুখী করুক। জানিস নিমু, তোর ছেলে মেয়ে যখন আমাকে দিদিমা বলে ডাকবে, বলতে বলতে মেনিমাসী কেঁদে ফেলল।

আমি তাকে সান্ত্বনা কি দেব, নিজেকেই সান্ত্বনা দেবার পথ খুঁজে পাচ্ছি না। আমি যে মেনিমাসীকে সব চেয়ে বেশি আঘাত দিতে

উন্মত্ত হয়েছি তা মেনিমাসী হয়ত স্বপ্নেও ভাবেনি। ভাবছিলাম এই স্নেহময়ী মহিলাকে আঘাত দেওয়া উচিত হবে কি না!

সন্ধ্যাবেলায় শোভনার মা এল মেয়েদের নিয়ে।

আমি উঠোনে মাতুর পেতে বসেছিলাম। শোভনা আমার সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে। চলুন, বাইরে একটু বেরিয়ে আসি।

সন্ধ্যা বেলায়!

সকাল সন্ধ্যা আমাদের কাছে সবই সমান। চলুন। রাত বেশি হবার আগেই ফিরে আসতে হবে।

আপনার মাকে বলেছেন কি?

শোভনার এত সাহস দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তবুও বাধ্য হলাম তার সঙ্গে যেতে। বাড়ীর বাইরে এসে শোভনা মৃত্নস্বরে বলল, আপনার কথাগুলো অনেকবার ভেবেছি। যাচাই করা আমার শেষ। নিজের জন্মকাহিনী যে স্পষ্ট করে বলতে পারে অপরকে এবং তারজন্য কোন কুণ্ঠাবোধ করে না বা অপরকে বিব্রত করতেও চায় না, তাকে শ্রদ্ধা করাই হল সর্বনিম্ন মূল্য দান। তার চেয়েও বেশী সে সব লোকের প্রাপ্য। যে অন্যায় করে সে অন্যায় গোপন করতে চায়। যে অন্যায়কে স্বীকার করে সে অপরাধী হলেও নিকৃষ্ট চরিত্রের নয়, সত্যের ওপর তার শ্রদ্ধা আছে নিশ্চয়ই। এমন মানুষ লাখে একজন পাওয়া দায়।

আপনি কি আমাকে লক্ষ্য করে এসব কথা বলছেন?

শোভনা বলল, এখানে তৃতীয় ব্যক্তি তো কেউ নেই।

কিন্তু শ্রদ্ধা আমার প্রাপ্য নয়। আমার অক্ষমতাকে গোপন করতে কলঙ্কজনক একটা সত্যকে স্বীকার করেছি, সেটা আমার স্বার্থরক্ষার অজুহাতে, সমাজের সেবা করতে নয়।

খোলা মাঠের পাশ দিয়ে কাঁচা নর্দমা বেয়ে যাচ্ছে। নর্দমাটা পেরিয়ে মাঠে এসে বসলাম দুজনে। আকাশে ষষ্ঠীর চাঁদ, ফিকে

আলো। বাতাসটাও ঝিরঝিরে। ভালই লাগছিল। আজ আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গ এই প্রাকৃতিক পরিবেশে বড়ই বেমানান।

শোভনা বলল, আপনি ভাবছেন মেয়েটা কি দুঃসাহসী। ভাবছেন মেয়েটা কি লজ্জাহীনা। নাটক নভেলের চরিত্র নিয়ে বুঝি গড়ে উঠেছে মেয়েটা। রাতের বেলায় অপর পুরুষের সঙ্গে এভাবে বাইরে বের হতে পারে যে মেয়ে সে মেয়ে কখনই ভাল হতে পারে না, নয় কি?

হেসে বললাম, অত বেশি ভেবে দেখিনি। আপনিই বা অত বেশি ভাবছেন কেন!

আমার মায়ের জন্য। মা মনে মনে লঙ্কা ভাগ করছেন। মেয়েকে পাত্রস্থ করতে পারলেই খুশী। কেন খুশী হবে না। সব মা-ই খুশী হয়, কিন্তু মেয়েরও যে একটা জীবন আছে সে বিষয়ে কখনও ভেবে দেখতে চায় না আমার মা। আমার জীবনের সঙ্গে যার জীবন জড়িয়ে দিতে চায় তাকে কতটা সুখী করতে পারব তা ভেবে দেখে না আমার মা।

আজ সকালেই তো সব দায়িত্ব নিতে রাজি হয়েছিলেন?

প্রয়োজন নির্মলবাবু, প্রয়োজন। আমার প্রয়োজন আত্মরক্ষার। আত্মরক্ষার তাগিদে। আমার বাবাকে দেখিনি কিন্তু মাকে দেখেছি। যেদিন মার আর উপায় ছিল না বাংলাদেশে বাস করার সেদিনই সে ছুটে এসেছে বিদেশে। আমার মায়ের রূপ ছিল, রুচি ছিল, ছিল না শুধু রুপো, তাই রুচির বিকার ঘটাতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু বাঘিনী অপরের রক্ত শুষে খেলেও সন্তানের রক্ত শুষে খেতে পারে না। তেমনি, আমার মাও সন্তানকে নষ্ট করতে চায় না।

থামুন।

কেন?

আমাদের পরিচয় অতি সামান্য।

কিন্তু সেই সামান্য পরিচয়কে মূলধন করেই আপনি আমাকে

যাচাই করার সুযোগ দিয়েছিলেন, এবার আপনাকেও যাচাই করে নেবার সুযোগ আমি দিলাম।

আমার অক্ষমতাকে আমি গোপন করতে চেয়েছি।

আমি আমার প্রয়োজনকে তুলে ধরতে চেয়েছি। বলে হাসল শোভনা।

আর কোন কথা বলতে পারলাম না।

শোভনা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তা হলে আমাদের বিয়ে সম্ভব নয়, কেমন ?

আমিও উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, অসম্ভব নয় তবে ত্বরিতে কিছু হবে না।

শোভনা পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বলল, আজ যা সম্ভব নয় আগামী কোন দিনে তা সম্ভব করলে লোকের কাছে জবাবদিহী করতে পারবেন তো ?

লোক তো কেউ নেই। সেদিন আমরা থাকব দু'জন। আমাদের সঙ্গে অপর কারও কোন সম্পর্ক রাখবার প্রয়োজনও হবে না। আমরা দুজনেই হব গোত্রছাড়া।

সেদিনের অপেক্ষায় থাকতে পারব কি !

চেষ্টা করব দুজনেই।

শোভনা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। আমিও তার পাশে পাশে চলতে চলতে বললাম, সত্যিই কি আমরা পরস্পরকে কোনদিন ভালবাসতে পারব !

শোভনা চাপা কণ্ঠে বলল, ভালবাসতে আমাদের জন্ম হয়নি, আমরা শুধু প্রয়োজনের দাস।

বোধহয় তাই। আমাদের চাওয়াটা যেন পাওয়ার সম্ভাবনার হিসাব না করেই চলে।

শোভনা শুধু বলল, হুঁ।

সে রাতে মেনিমাসী খেতে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোর মনের মতন বউ হবে তো ?

একথা কেন জিজ্ঞেস করছ মাসী? তোমরা তো মনটাকে বিচার করতে চাওনা, তোমরা চাও বিয়ে।

তবুও তোদের আলাপ পরিচয়ের মাঝ দিয়ে মন বোঝাবুঝি করে নেয়া দরকার মনে করি। আমাদের ছিল পোড়া কপাল। মন বোঝাবুঝি করে নিতে পারিনি বলে তোর অনিলমেসোর কাছা ধরে ছুটে বেরিয়েছি, তার আর ফলও পেতে দেরী হয়নি, তাতো জানিস!

এ বিয়ে হবে না মাসী।

চমকে উঠল মেনিমাসী। কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে গম্ভীরভাবে বলল, কেন?

শোভনা বিয়ে করতে রাজি নয়।

মিথ্যে কথা। আমাকে সে নিজের মুখে বলেছে বিয়ে করবে। এখন তুই-ই বলছিস উল্টো কথা।

তা হলে ধরে নাও এ বিয়েতে আমার মত নেই।

মেনিমাসীর চোখ দুটো থেকে যেন আগুনের ফুলকি ছুটে বের হল। গম্ভীরভাবে বলল, আমিও তাই মনে করেছিলাম। কিন্তু আমি যে কথা দিয়েছি শোভনার মাকে।

তোমার অধিকারের বাইরে চলে গেছ।

তোর হয়ে কথা দেবার অধিকার আমার নেই!

অন্য সব বিষয়ে থাকলেও এবিষয়ে নেই বলেই মনে করি। সারাজীবন যাকে নিয়ে ঘর করব তাকে যাচাই করে নেবার ব্যবস্থা না করেই তুমি যে কথা দিয়েছ, তা নেহাত ছেলেমানুষী হয়েছে।

মেনিমাসী গুম হয়ে যায়।

ঝড় উঠেছে তার মনে।

সত্যিই যে তার কোন অধিকার নেই তা স্পষ্ট বুঝতে পেরে চুপ করে গেল। আমিও অসোয়াস্তি অনুভব করছিলাম। কোনরকমে খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লাম।

পরের দিন সকাল বেলায় বললাম, আমি আজই কলকাতা যাব মাসী।

মেনিমাসী শুধু 'আচ্ছা' বলে তার কর্তব্য শেষ করল।

আমি ঘুরতে ঘুরতে হাজির হলাম শোভনাদের বাড়িতে। শোভনার মা আমাকে দেখে খুশী মনেই বসতে বলল।

আজ কলকাতা যাচ্ছি মাসীমা।

এত তাড়াতাড়ি ?

এখানকার কাজ শেষ। এবার নিজের কাজে লাগতে হবে। যাবার আগে দেখা করে যাচ্ছি। অপরাধ কিছু হয়ে থাকলে মাপ করবেন।

শোভনার মা বিব্রতভাবে বলল, সে কি কথা। তুমি ঘরের ছেলে, অপরাধ কেন করবে। আবার কবে আসবে বাবা ?

জানি না। শোভনা কোথায় মাসীমা ?

শোভনার মা হাঁক দিলেন, শোভনা, শোভনা এদিকে আয়, নির্মল এসেছে। মায়ের ডাক শুনে শোভনা এল না, এল রমলা। এসেই বলল, দিদির মাথা ধরেছে আসতে পারবে না বলল।

আমার কাছে শোভনা পরিষ্কার হল তার এই অনীহা জানিয়ে। অতি মামুলি ছু'একটা কথা বলে ফিরে এলাম মেনিমাসীর কাছে। আমাকে দেখেই মেনিমাসী বলল, তোর গাড়ি কটায় ?

বললাম, বিকেলে।

মেনিমাসী আর কোন কথা না বলে নিজের কাজে মন দিল। আমি ভেতরে ভেতরে অসহিষ্ণু হয়ে পড়লাম। কত তাড়াতাড়ি দেওঘর ছাড়তে পারি সে চিন্তাই চেপে বসল মনে।

ছুপুর বেলায় ক্যাম্বিসের ব্যাগটা হাতে করে মেনিমাসীকে বললাম, আমি যাচ্ছি মাসী।

মেনিমাসী বলল, আচ্ছা।

একবারও বলল না, আবার আসিস।

আমি বুঝলাম, আমার সঙ্গে মেনিমাসীর সম্পর্ক এখানেই শেষ। মেনিমাসী যদি আমার কথাগুলো আরও একটু ভাববার অবসর পেত, তা হলে হয়ত এভাবে এতটা উদাস মনোভাব নিয়ে কথা বলত না। আমিও যেন নিজেকে বাঁচাবার তাগিদে টিপ করে মেনিমাসীর পায়ে মাথা ছুঁইয়ে ছুটে বের হলাম পথে। দুপুরের রোদে ঘামতে ঘামতে ষ্টেশনে পৌঁছে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

গাড়ি ছাড়তে তখনও আড়াইঘণ্টা দেরী।

গাড়ির অপেক্ষায় বসে বসে ভাবছিলাম মেনিমাসীর কথা। মেনিমাসী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল অনিল মেসোর সঙ্গে। মনের নিভৃত কোণে ঘর ফিরে পাবার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল, হয়ত সন্তান পাবার বাসনাও ছিল মনে। কিন্তু মেনিমাসী এসেছিল দৈহিক উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করার মত অবস্থা ছিল না তার। অনিলমেসোও তখন ছিল মেনিমাসীর অনুবর্তী। হঠাৎ তাদের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। মা হবার চিরন্তন বাসনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল। আবার সমাজে ফিরে গিয়ে নব জীবনের প্রবর্তনা তখন ছিল অকল্পনীয়। মেনিমাসী বস্তির জীবনকে আপন করে নিয়ে তারই মধ্যে অতৃপ্তির বোঝা বয়ে বেড়িয়েছে এতকাল। তার সুপ্ত বাসনাকে রূপদান করতে আমাকে গৃহমুখী করার চেষ্টা করেছে। আমার প্রত্যাখ্যান স্বাভাবিকভাবেই তার অভিমানী মনকে আহত করেছে। কিন্তু তাকে খুশী করা আমার পক্ষে যে মোটেই সম্ভব নয়, আমি যে নিরুপায়—একথা বুঝিয়ে বলতে পারিনি। বরং অধিকারের প্রশ্ন তুলে তাকে শয্যাশায়ী করতে দ্বিধা করিনি। কেননা, সে সময়ে দ্বিতীয় আর কোন পথ খুঁজে পাই নি আমি।

ঘণ্টা দিল গাড়ি ছাড়ার।

চিন্তার সূত্র ছিন্ন হল। ধীরে ধীরে গাড়িতে উঠে বসলাম। চোখের সামনে থেকে "বৈদ্যনাথ দেওঘর" বোর্ডটি সরে গেল।

চার

যোশিডিতে গাড়ি বদল করে কলকাতা গামী ট্রেনে আশ্রয় নিতেই মেনিমাসী আর শোভনাকে নিজের অজ্ঞাতে ভুলে গেলাম। গাড়িতে ছিল প্রচণ্ড ভীড়। আর যাত্রীদের অধিকাংশই ছিল উত্তর বিহারের লোক। বাঙালী বলতে বোধ হয় আমি একাই ছিলাম বগিটাতে। চিত্তরঞ্জনে গাড়ির চেহারা বদল হল। নবাগত প্রায় সবাই বাঙালী। ভীর ঠেলে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়ে উঠল কয়েকটি পরিবার, কিছু যাত্রী নামল সেখানে। বসবার জায়গাও পেলাম তখন। প্রশ্ন করল একজন, এ গাড়ি কোথায় যাবে?

কে যেন বলল, কলকাতা।

কোন টিশনমে?

শিয়ালদহ।

হবরা নেহি! তব্ তো তকলিফ হোগা। ও রামভানুয়া শুনল কাঁহা জায়েগা।

দূর থেকে রামভানু কি বলল তা শোনা গেল না। সে হয়ত জানে গাড়ি হাওড়া না গিয়ে শিয়ালদহ যাবে। সেজন্য কোন আগ্রহ দেখাল না।

আসানসোল থেকে গাড়ি ছাড়বার আগে চারজন লোককে দৌড়ে ওভারব্রিজ পেরোতে দেখলাম। দুজন শেষের বগিতে উঠল লাফিয়ে, সেই বগির যাত্রী আমরা। গাড়ি তখন বেশ বেগেই চলছে। নবাগত যাত্রীরা দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাকছে আও আও। যাদের ডাকছিল, তারা গাড়িতে উঠতে পারেনি তখনও। যাত্রী দুজন দুটো দীর্ঘশ্বাস ফেলল! গালে হাত দিয়ে ধপাস করে বসে পড়ল মেঝেতে।

পাশের লোক জিজ্ঞেস করল, কি হল মহারাজ?

নবাগত একজন বিষণ্ণভাবে বলল, রহ গিয়া।

তাতে কি, পরের গাড়িতে আসবে। পেছনেই তো একস্প্রেস আসছে।

নেহি বাবুজি। জিসকো চাপানে আয়া হাম দোনো উলোক রহা গিয়া আউর হামলোক সোয়ারী বন গয়া।

সত্যিই দুঃখের কথা। যারা এগাড়িতে যাবে তারা পেছনে প্লাটফরমে থেকে গেল আর যারা 'সি অফ্' করতে এসেছিল তারা সোয়ারী হল। এর চেয়ে দুঃখের আর কি থাকতে পারে! পাশের লোকটা ফিক্ ফিক্ করে হেসে উঠল।

হাসতা হ্যায় কাহে।

কুচ নেহি মহারাজ। রানীগঞ্জমে উতার যাইয়ে। একসপ্রেস ভি উহাঁ ঠারেগী।

রাণীগঞ্জে যাত্রী দুজন নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। পাশের ভদ্রলোক রস সহকারে কাহিনীটা বিবৃত করতেই সবাই একজোট হয়ে হো-হো করে হেসে নিল কিছুক্ষণ।

তামাসাটা আমিও উপভোগ করলাম। ওদের মত হো-হো করে হাসতে না পারলেও মনের ভেতর পাক দিচ্ছিল এই তামাসার ব্যাপারটা।

একটু ধরুন তো।

তাকিয়ে দেখলাম একটি ভদ্রলোক তার হাতের একটা স্যুটকেশ এগিয়ে দিচ্ছেন।

ধরলাম সেটা।

বাংকে রাখুন, ঐ ঐদিকটায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। আর বলবেন না মশায়! এইসব খোট্টাদের জ্বালায় পথ চলা দায়। ওদের দেশে খেতে পায় না। ওদের গভরমেণ্ট আর গভরমেণ্টের দল সবাই গাড়িভাড়া দিয়ে উপদেশ ছড়ায় 'কলকত্তা যাও'। আর মশায় এদিকে বাংলাদেশে ভাতের অভাব। তবুও লাখ লাখ খোট্টা

এসে ভীড় করছে সেই বাংলাদেশে। আর এদের খোরাক জোটাতে হিমশিম খাচ্ছে বাংলাদেশ। বলতে পারবেন না। বললেই সংহতি নষ্ট হবে। নিজের দেশের বেকার মানুষদের অন্যদেশে ঠেসে দিয়ে সংহতি রক্ষা করছে আমাদের প্রভুরা। দেখুন না, গাড়িতে পা ফেলবার জায়গা নেই। যে ভাবে খোট্টার ভীড় জমছে, শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে বাঙালীর জায়গা থাকলে বাবার ভাগ্যি। আপনি কি বলেন!

বাগবাজারের চায়ের দোকানেও আমার অভিমত জানতে চেয়েছিল ক জন জোয়ান ছেলে। অভিমত দিয়ে প্রাণান্ত হবার যোগাড়। সে অভিজ্ঞতা ভুলতে পারিনি। ভদ্রলোক আমার মত জানতে চাওয়াতে বললাম, যা বলেছেন।

বুঝুন ব্যাপার। এই মোচনমান আর খোট্টা, এদের সহ্য করতে পারিনা একটুও। যদি মোচনমান আবার খোট্টা হয় তা হলে ঘরের গরু জরু সব কাবার।

ভদ্রলোকের উষ্মার কারণ বুঝতে না পেরে আবার বললাম, যা বলেছেন।

উৎসাহিত হয়ে ভদ্রলোক আবার বললেন, দেখুন—দেখুন কেমন পা ছড়িয়ে বসেছে, আর মেয়েরা বসতে জায়গা পাচ্ছে না। ইচ্ছে করে ঠ্যাংগুলো ঠেঙ্গিয়ে ভেঙ্গে দি।

উৎসাহের জোয়ারে ভদ্রলোক অনেক দূর এগিয়েছেন। এর পরেই হয়ত সুরু হবে হাঙ্গামা। আর তাকে সমর্থন জানাবার সাহস পেলাম না। চুপ করে মুখ ঘুরিয়ে বসলাম।

গাড়ি বর্ধমানের এলাকা ছাড়তে না ছাড়তে দলে দলে লোক উঠল বস্তা ঘাড়ে করে। সবাই ব্যবসায়ী। কিসের ব্যবসায়ী তা কারও অজানা নয়। এরা সরকারের গাড়িতে বিনা পয়সায় ভ্রমণ করে, গ্রামের অন্ন ছিনিয়ে এনে শহরের মানুষের পেট ভড়ায়। ভীড়ে দম বন্ধ হবার উপক্রম।

কলকাতা পৌঁছবার আগেই নেমে গেল ঐ ব্যবসায়ীর দল।

নিশ্বাস ফেলে বাঁচল যাত্রীরা!

তবুও নিষ্কৃতি নেই। গাড়ি চলছে। গাড়ির সঙ্গে চলছে চলমান দোকান—কোনটা চানাচুরের, কোনটা ওষুধের, কোনটা মিঠে জলের। এই ভ্রাম্যমান দোকানের মলিকরাও অনেকেই বিনা টিকিটের যাত্রী। তবে এদের অত্যাচার কম, উৎপাত বেশি। এরাও কলকাতা পৌঁছবার আগেই নিজের নিজের আস্তানায় ফিরে গেল।

গাড়ি দাঁড়াল শিয়ালদহে।

রাত তখন এগারোটা।

ব্যস্ত শহর অনেকটা ঝিমিয়ে এসেছে। পথিকরা ছুটছে ঘরের দিকে। শহরের শেষ বাস চলে গেছে, শেষ ট্রাম তখনও পথে হামাগুড়ি দিচ্ছে; পণ্য নিয়ে ঠেলাগাড়ী আর লরীর শোভাযাত্রা। হাঁটতে হাঁটতে চলেছি। মাঝ রাতের কলকাতা দেখবার মত। একদল মানুষ ক্লান্তি নিয়ে বিশ্রামের আশায় ছোটে, আর আরেকদল কিছু উপায়ের ধান্দায় গলিপথে আত্মগোপন করে হানা দেয় শহরের কোন নিদ্রিত পুরীতে অথবা অসতর্ক পথিকের ওপর হামলা কবার জন্য ওঁত পেতে থাকে।

ফিরে এসেছিলাম নয়নতারার গলিতে। মেনিমাসীর সেই পুরাতন ঘরখানাই আমার আশ্রয়। তালা খোলার শব্দে পাশের ঘরের নিমাই পাত্র গলা খাঁকারি দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কে?

আমি, আমি নিমু, নির্মল।

কখন এলে ভায়া?

সবে এসে পৌঁছেছি।

ভাল তো?

হাঁ।

নিমাই পাত্রের গলার শব্দ শুনতে পেলাম না আর।

বিছানাটা ঝেড়ে নিয়ে শুয়ে পড়লাম।

ঘুম নেই চোখে।

বিমলা, শোভনা, মেনিমাসী, মেনকাদিদি, মিঠু দারোয়ান, সোলেমান সবাই ভীড় করে এসে দাঁড়াল আমার মনের দুয়ারে। সবাইকে ঠেলে পথ করে নিল একটি মাত্র চিন্তা। সে চিন্তা হল বাঁচার চিন্তা। আহার্য চাই, আশ্রয় চাই, বাঁচার মত উপকরণ চাই।

রাত কেটে গেল কি ভাবে জানি না।

সকাল বেলায় বের হলাম কাজের আশায়। আবার সেই পথ পরিক্রমা। দরজায় দরজায় আবেদন।

পকেট ক্রমেই খালি হতে থাকে।

আতঙ্ক জাগল মনে। আগে মেনিমাসী ছিল আমার সহায়। তাও হারিয়েছে।

মাসের পর মাস কাটছে, পকেটও শূন্য হচ্ছে। হিসাব করে দেখলাম আর একটা বছর কাটতে পারে কোন রকমে।

ঘুরতে ঘুবতে গেলাম ময়দানে।

বেশ জমেছে একটা সভা। চিৎকার শুনছি, চালের দাম কমাতে হবে। কয়েক পয়সার বাদাম ভাজা কিনে বসলাম এক পাশে। আমিও শ্রোতা। বক্তারা পর পর বলে চলেছেন, অথচ আমার কানে সব কথা ঢুকছে না।

কে যেন বলল, কোথায় থাকেন মশাই ?

তাকিয়ে দেখলাম সুপুরুষ একটি ভদ্রলোক। প্রশ্নকর্তা তিনিই।

কেন মশাই ?

এমনি জিজ্ঞেস করছি। রাগ করলেন না কি ?

বাগ করব কেন ? আচমকা প্রশ্নে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আপনার পরিচয়টা !

আমি চাকরি করি, গড়িয়াহাটায় থাকি। আপনার নাম ?

আমার নাম বললাম।

কোথায় কাজ করেন ?

কাজ ! বলে থেমে গেলাম।

ভদ্রলোক হেসে বলল, কাজ নেই ! আশ্চর্য কি ! দেশে, বিশেষ করে বাংলা দেশে তিন চার লাখ জোয়ান ছেলে বেকার। যুবশক্তির এমন অপচয় আর কোন দেশে হয়নি, হয় না। ইংরেজ যাবার সময় যে সব সর্ত আরোপ করেছিল তার সবটাই স্বীকার করে নিয়েছিল আমাদের নেতারা, শুধু স্বীকার করেনি আমাদের সর্তগুলো। যার সব চেয়ে বড় সর্ত হল পেটের ভাত, সেটা দেবার দায়িত্ব নেয় নি আমাদের নেতারা।

নতুন পরিচয়, বলতে গেলে অপরিচয়, তার মাঝ দিয়ে প্রসঙ্গ যে পথ ধরেছে তা নিশ্চয়ই মেঠো রাজনীতি নয়। আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। ভদ্রলোক বোধহয় আমাকে তার সমমতাবলম্বী মনে করে উৎসাহ সহকারে বলতে লাগল। শুনুন নির্মলবাবু, সব বোগাস্। শুধু নিজেদের কোলে ঝোল টানতে সবাই ব্যস্ত। বোঝা যাবে, সামনে ইলেকশনে। দেশের লোকই বলবে, শাসন ক্ষমতা কার হাতে থাকবে। শুধু আবিচার আর অবিচার, স্বজন পোষণ আর বিরোধী দমন, দুর্নীতির অগ্রগমন আর উচ্ছৃঙ্খলতার পরিপোষণ। গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে হয়।

বললাম, উপায় কি বলুন ! সবাই এই অবস্থা মেনে চলছি, চলতে বাধ্য হচ্ছি, চলতে হবেও।

নিশ্চয় নয়। এর প্রতিকার চাই।

করবে কে ? হাসলাম আমি।

হাসি দেখে ভদ্রলোক ক্ষিপ্তের মত বলল, হাসছেন। প্রতিকার করব আমরা। আমরা যারা খেতে পাই না দুবেলা। বিলাস বহুল কিছু লোকের দিকে তাকিয়ে দেখুন আর তাকিয়ে দেখুন নিজের দিকে।

আপনি অপরের ভাল সহ্য করতে চান না।

নিশ্চয় চাই। কিন্তু নিজের ভালকে অস্বীকার করে নয়।

কে আপনাকে বাধা দিচ্ছে ভাল না করতে। নিজের ভাল নিজেই করুন, অপরের ভাল দেখে চোখ টাটালে চলবে কেন। প্রত্যেকেরই তো নিজের নিজের সম্পদ সৃষ্টির অধিকার আছে।

সম্পদ সৃষ্টির অধিকার আছে ঠিকই, কিন্তু তা বঞ্চনা করে নয়। অপরের মেহনতীর অংশ লুঠে নিয়ে সম্পদ সৃষ্টি অসহ্য।

তর্ক করবার প্রবৃত্তি ছিল না, মনের অবস্থাও তার উপযোগী নয়। আমি চুপ করে বাদাম চিবুতে থাকি। ভদ্রলোকও নিরস্ত্র হবার মত লোক নয়। আবার আরম্ভ করল, এ স্বাধীনতার চেয়ে পরাধীনতা অনেক ভাল ছিল।

সহ্য করতে পারলাম না তার কথা। বললাম, তা হলে ইংরেজকে ডেকে আনুন আবার। আসুন, আমরা সবাই মিলে বৃটিশ রাণীর কাছে দরখাস্ত পাঠাই, হে মহানুভব মহারাণী, আপনি আবার দয়া করে ফিরে আসুন।

কিছু সময় বিরতির পরে বললাম, উত্তেজিত হচ্ছেন কেন!

আপনার কথা শুনে। পৃথিবীতে মশায় দুটো জাত আছে। আর আছে দুটো শ্রেণী। পুরুষ আর মেয়ে এই হল দুটো জাত। আর ধনী আর গরীব এই হল দুটো শ্রেণী। মেয়েরা সমান অধিকার দাবী করছে, দাবী আদায়ও করছে। তেমনি সমতা দাবী করছে গরীবরাও, আর তা আদায় করতে আন্দোলন করছে তারা। আজ হোক কাল হোক, একদিন সে সমতা আসবেই, তবে সহজ উপায়ে নয়। আবেদন নিবেদনে নয়। আসবে আন্দোলনে। সেই আন্দোলনের প্রস্তুতি চলেছে।

ভদ্রলোকের যুক্তি সহ্য করতে পারছিলাম না। উঠে পড়লাম। ভীড়ের মধ্যে মিশে গেলাম। সভা তখনও চলছে, তখনও অনেকের বলা বাকি। চৌরঙ্গী পেরিয়ে সবে ফুটপাতে উঠেছি এমন সময় আবার ডাক শুনলাম, শুনুন।

ফিরে তাকালাম।

বিদেশীর পোষাক গায়ে জড়িয়ে ডাকছিল একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক।

জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে ডাকছেন ?

হ্যাঁ। আপনি তো আলোচনা করছিলেন ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে। শুনছিলাম আপনাদের কথাবার্তা। ঠিকই বলেছেন, হিংসা, শুধু হিংসা। নিজের তো মুরোদ নেই, যার মুরোদ আছে তার উন্নতি দেখলেই ওদের চোখ টাটায়। এবার জাহান্নামে পাঠাতে চায় দেশকে। আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে পিছু পিছু এসেছি। ধন্যবাদ।

আমি লজ্জিতভাবে বললাম, আমি যা বলেছি তা শুধু তর্কের খাতিরে।

তা কি হয় মশায়। পেটের কথা ভুল করেও মাঝে মাঝে জিভ দিয়ে বের হয়ে যায়।

ভদ্রলোক আরও কিছু বলতে গিয়ে থেমে যায়। আমিও ধন্যবাদের বিনিময়ে ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরে দাঁড়াই। ভদ্রলোক আবার বলে, কোথায় যাবেন ?

বাসায়।

খুব তাড়াতাড়ি আছে বুঝি ! নেই। তাহলে চলুন দুকাপ গরম পানি ঢেলে আসি উদরে। সেই সকালে খেয়ে বেরিয়েছি, ক্ষিদে পেয়েছে মশায়।

গায়ে পড়ে অপরিচিত লোককে নেমতন্ন করে খাওয়াবার রীতি হয়ত ছিল দুশ' বছর আগে। এখন ওসব অচল। আজ কাউকে অযাচিতভাবে ডেকে খাওয়ানো নিশ্চয়ই অভিসন্ধি প্রসূত। আমি আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে ইতস্তত করছিলাম। আমার ইতস্তত ভাব লক্ষ্য করে ভদ্রলোক বলে, আসুন, আসুন। মানুষের সঙ্গে প্রথমে সামান্য পরিচয় হয় তারপর সেই পরিচয়ই ধীরে ধীরে বন্ধুত্বের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয়।

আমাকে কোন কথা বলার অবসর না দিয়ে কর্পোরেশন অফিসের উল্টো দিকের একটা চায়ের দোকানে টেনে বসাল আমাকে। চায়ের সঙ্গে টায়ের ব্যবস্থা করে ভদ্রলোক আলোচনায় মেতে উঠল।

দেশটাকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে এইসব লোকেরা। যেখানেই অশান্তি, তার মূলে রয়েছে ঐ সব তথাকথিত জননেতার দল। আচ্ছা আপনি-ই বলুন, দেশে যদি খাবার না জন্মায় তার জন্য দায়ী কি গভরমেণ্ট! খাবার কম, বিদেশের উপর নির্ভর করতেই হবে। আমেরিকা তো দরাজ হাতে খাবার দিচ্ছে মশায়। আমরা গম খাব না, আহ্লাদে কথা। এরা কি চায় তা নিজেরাই জানে না।

কথা শেষ করে চায়ে চুমুক দিল ভদ্রলোক।

আমি রাজনীতি বুঝিনা, সমাজনীতি বুঝিনা, অর্থনীতি তো নয়-ই। অবাক হয়ে শুনছিলাম তার কথা। ভদ্রলোক আবার সুরু করল, বেকার সমস্যা দূর হবে কি করে! কি কাজ দেবে সরকার। কাজ তো মুরগীর ডিম নয়। একটু অপেক্ষা করতে হবে, দেশকে গঠন করার সুযোগ দিতে হবে। কি বলেন মশাই। হ্যাঁ, আপনার নামটা তো জানিনা।

নাম বললাম।

খাসা নামটি আপনার। বলে ভদ্রলোক আপ্যায়নের হাসি হাসলেন।

যাই বলুন, এই সর্বনাশা লাল ঝাণ্ডার দলগুলোকে উৎখাত করতে না পারলে দেশের উন্নতি অসম্ভব। এদের নিপাত করতেই হবে।

বললাম, কিন্তু ওরা তো কাজ চায়। কাজের বিনিময়ে খেতে চায়।

সেতো সবাই চায়। কাজ বললেই কাজ পাওয়া যায় কি!

কিন্তু পেটতো শুনতে চায় না সে কথা। হ্যাঁ, আপনার নামটা এখনও জানতে পারিনি।

আমার নাম শুভেন্দু। তা ঠিক বলেছেন! পেটের খিদে শুনতে চায় না কোন যুক্তি। কিন্তু আজ অবধি কেউ-কি না খেয়ে আছে এদেশে।

তার হিসাব জানিনা শুভেন্দুবাবু। আমার কথাই বলছি। আমার কিছু সম্বল ছিল তাই দিন কাটছে নুন ভাত খেয়ে। আর আমি একা। কিন্তু একদিন এ সঞ্চয় শেষ হবে, কাজের প্রয়োজন দেখা দেবে নিদারুণ হয়ে। সেদিন কাজ না পেলে, পেটের দায়ে অকাজ করতেই হবে।

তা ঠিক, কিন্তু যারা দেশ গড়ার মহান দায়িত্ব নিয়েছে, তাদের সুযোগ দিতে হবে তো!

সুযোগ! তা বটে। কিন্তু বাঁচার সুযোগটাই তো সবচেয়ে বড় কথা। উন্নয়ন প্রচেষ্টার মন্থরগতি আমাদের আরও পেছনে ঠেলে দিচ্ছে।

নিন উঠুন নির্মলবাবু। চলুন খোলা মাঠে গিয়ে বসি। তাও কি বসবার উপায় আছে! রোজ সভা, রোজই শোভাযাত্রা। কি যেন হয়েছে কলকাতা শহরটার। আরে মশায় খিদে সবারই আছে। তা বলে ছিনিয়ে কেড়ে নেবার দস্তুর কোন দেশে আছে বলুন তো? ধরুন আমেরিকা। সবচেয়ে ধনীর দেশ। সেখানেও বেকার আছে, সেখানেও নানা সমস্যা আছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত শুনেছেন কখনও, যে সে দেশের মানুষ ছিনিয়ে কেড়ে নিয়েছে অপরের মুখের গ্রাস। অসম্ভব! তাদের একটা কালচার আছে মশায়। তা হতেই পারে না।

বললাম, আমেরিকার সম্বন্ধে আমার কোনই জ্ঞান নেই।

জ্ঞান নেই, বলেন কি! আমেরিকা না থাকলে আমাদের না খেয়ে থাকতে হত। অথচ সেই আমেরিকা সম্বন্ধেই জানেন না। আশ্চর্য!

হেসে বললাম, সবাই কি সব কিছু জানে?

জানা উচিত। আসুন আমার সঙ্গে। আমেরিকার সঙ্গে সাক্ষাত পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। এই যে ওদের দপ্তর। আসুন। দেখুন কত ভদ্র ওরা। সত্যিই মশায় একটা মহান জাত ওরা।

আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল ইউসিসের দপ্তরে।

সুসজ্জিত মনোরম বিরাট হলে দর্শনীয় অনেক কিছু চিত্র ও গ্রন্থ। বিরাট পাঠাগারটা দেখতে দেখতে সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল।

রাস্তায় এসে শুভেন্দু বলল, কোথায় যাবেন ?

যা সবাই করে, মানে নিজের আস্তানায়। আচ্ছা চলছি।

সে কি মশায়। পরিচয় হল, বন্ধুত্বই হল বলতে পারেন, অথচ কোথায় যাবেন তাও জানতে পারলাম না ! বলুন আপনার ঠিকানা, এই নিন আমারটাও। সকালে নটা অবধি থাকি, চলে আসবেন একদিন । গল্প করব দুজনে। আপনার ঠিকানা হল, বলেই ডায়েরী বের করে আমার ঠিকানা লিখে নিয়ে নিজের ঠিকানার একটা কার্ড দিল আমাকে। সযত্নে কার্ডটা পকেটে রেখে বললাম, আচ্ছা আসি আজকের মত। আবার দেখা হবে।

হবে কি মশায়। হতেই হবে। আপনার মত বন্ধু পাওয়া ভাগ্য।

হাঁটতে হাঁটতে ফিরছিলাম আর ভাবছিলাম। কলকাতা শহরে এমন ভদ্রলোক আছে বলে আমার ধারণা ছিল না। অকারণে, অযাচিতভাবে কেউ যে বন্ধুত্ব পাতায় তাও বিশ্বাস করতে পারিনি। কেমন অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম শুভেন্দুর ব্যবহারে।

নয়নতারার গলির মুখে আকালুর সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখেই পুরানো কায়দায় স্যালুট দিয়ে বলল, খবর ভাল তো হাবিলদার।

হেসে বললাম, তোমার।

আমার খবর ভাল নয়। তারের কারখানা বন্ধ। লক্ আউট।

হঠাৎ।

আমরা রেট বাড়াতে বলেছিলাম, ওরা কারখানাটাই বন্ধ করে

দিয়েছে। এখন বেকার। আরেকটা কথা বলব বলে দাঁড়িয়ে আছি হাবিলদার, কটা টাকা দিতে পারবে? হপ্তার টাকা পাইনি। একা লোক চলে যেত কটা দিন। কিন্তু রাসমণি এসেছে, খরচও বেড়েছে।

রাসমণি আবার কে?

ও তুমি বুঝবে না। আরে পুরুষ মানুষ কি একা থাকতে পারে না কি! বুড়ী মাগীটা পালিয়ে গেল, ঐ নেরুশালা ভাগিয়ে নিল। এবার রাসমণি এসেছে মাগীটার জায়গায়। হাওড়ার মেয়ে। খাসা মেয়ে, ভাল মেয়ে। অনেক দিনের পীরিত। এতদিন আনতে পারিনি। এবার এনেছি মাগীটা পালাতেই।

আবার মারপিট করবে না তো?

ওটা একটু মাল খেলেই হয়। তবে কি জান হাবিলদার, দু চারটে চড় চাপড় না দিলে ওরাও ঠিক থাকে না। তোমরা যা মনে কর তা নয়। সব মেয়েছেলেই মরদের বশ। তা ওসব যাক, কটা টাকা দাও দিকি? দুনো ফেরত দেব। সত্যি বলছি হাবিলদার, রাসমণিকে একজোড়া শাড়ি না দিলে আর ঘরে রাখা যাবে না। দেবে হাবিলদার!

বললাম, আমার কাছে এখন টাকা নেই। কাল পরশু চেষ্টা করে দেখব।

আকালু মুখ ঘুরিয়ে বলল, আমার দরকার আজ, আর তুমি চেষ্টা করবে কাল পরশু। ভাল বলেছ হাবিলদার। খিদে পেয়েছে, বলছ ভাত পাবে পরশু। যাও যাও দিতে হবে না। আমি দীনুর কাছে দেখছি।

আহা রাগ করছ কেন আকালু।

রাগের কথা হলে রাগ করব বইকি!

কানের কাছে মুখ এনে বলল, মানুষ যে দুটো জিনিসই চায় একান্ত করে, পেটের ভাত আর সহবাস।

আমি কোন কথা খুঁজে না পেয়ে বললাম, কাল সকালে দেব টাকা।

আকালু খুশী মনে দাঁত বের করে বলল, এই জন্যই তো তোমার গোলাম হয়ে আছি হাবিলদার। তারের কারখানা খুললে দুনো শোধ দেব।

আর শোনার ইচ্ছা হল না। সোজা নিজের ঘরে এসে দরজা খুললাম।

আকালুর কথা কানের কাছে বারবার ধাক্কা দিতে থাকে। মানুষ চায় পেটের ভাত আর সহবাস। পেটের ভাত আর সহবাসের জন্য মানুষ মেহনত করে, আশ্রয় খোঁজে। আকালু আমার চেয়ে বেশি বাস্তববাদী, সংসারের মূলমন্ত্রকে সে বেশ রপ্ত করেছে!

মাঝ রাতে চিৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

পাশের বস্তীতে যেন মারামারি হৈ চৈ চলছে। উঠবার ইচ্ছা ছিল না। তবুও উঠতে হল। গলির মুখটাতে আসতেই নেরুর সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে নেরু?

কিছুই নয় নিনুদা। গাঁজা।

সে আবার কি!

বিনয় আর ভাসান গাঁজার চোরা কারবার করত। ভাগাভাগি নিয়ে মন কষাকষি চলছিল কিছুদিন থেকে। আজ হিসাব নিকাশ করতে বসে হাঙ্গামা। বিনয়ের দলবল আর ভাসানের দলবল বোতল মারছে। ওদিকে যেওনা, এখুনি পুলিশ এসে যাবে।

পুলিশকে তুমিও ভয় কর!

আমি! ছোঃ! বলে থুতু ফেলল নেরু।

উদারভাবে নেরু আবার বলল, শুয়ে পড়ুন, এতো হামেশাই হচ্ছে। গাঁজা-চরস-আফিম, এসবের কারবার করে দুখানা গাড়ি কিনেছে অবনী। সে সব কথা শুনে কাজ নেই। আমি ওদের চিনি।

নেকুর উপদেশেই হোক, আর অন্য যে কোন কারণেই হোক ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম। বাকি রাতটুকু আর ঘুম এলনা চোখে।

সকাল হতেই আকালু এসে দাঁড়াল দরজায়।

পুরানো কায়দায় স্যালুট দিয়ে বলল, এলাম হাবিলদার। এবার যা হয় কর।

কত টাকার দরকার?

বিশ হলেই হবে।

শুধবে কি করে! কাজ নেই তো তোমার?

নেই বললেই নেই। জ্বালিয়ে দেব শালাদের কারখানা। কাজ দিতেই হবে। তখন দুনো দেব হাবিলদার। আকালু এক বাপের বেটা, কথার নড়চড় পাবে না।

দূর থেকে ডাক শোনা গেল, মিস্তিরি।

আকালু সচকিতে বলল, কি হল হাবিলদার। টাকাটা দাও। ওদিকে রাসমণি বসে আছে। বাজার হাট করতে হবে। বুঝতে পারছ তো মেয়েমানুষ নিয়ে সংসার করার কত ঝামেলা। কাজ নেই, থাকলে এত ভাবনা ছিল না।

মনে মনে হাসলাম। আকালু যেন পাওনাদার। টাকা না দেওয়াটা যেন অপরাধ। হেসে বললাম, সংসারতো করিনি ভাই। আচ্ছা, এই নাও বিশটাকা। তোমার রাসমণি খুশী থাক, তুমিও রাসমণিকে নিয়ে খুশী থাক।

যা বলেছ হাবিলদার। সেই মাগীটা ছিল অতি নচ্ছার। দুষিত চরিত্র। আর রাসমণি। এমনটি সবার কপালে জোটেনা।

দশটাকার নোট দুখানা উল্টেপাল্টে দেখে নিয়ে আকালু বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আজকাল হোটেলে খেতে যাইনা। খরচ বেশি। বাড়িতে রান্না করি। তাড়াতাড়ি উনুন জ্বালিয়ে রান্না চাপিয়ে দিলাম। আবার দরজায় দরজায় ঘুরতে হবে সারাদিন! কাজ না পাওয়াটাও

একটা কাজ। খুঁজে বেড়ানও একটা কাজ। বোধহয় বেকার জীবনে জুতোর শুকতলা ছিঁড়ে কাজ খোঁজার চেয়ে বেশি মেহনত বাঙালীর ছেলেকে কখনও করতে হয় না। আমিও একটা কাজ পেয়েছি, কাজ খোঁজার কাজ। সেই কাজে যেতে হলেও পেট ভরাতে হয়, তারই ব্যবস্থা করি সকালে।

রাতের বেলায় রান্না করিনা। সকালের শুকনো রুটির সঙ্গে গুড় হল উপাদেয় খাদ্য। সতর্কভাবে পদক্ষেপ না করলে যে অনাহারে থাকতে হবে সত্বর, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না!

সকালবেলায় রাঁধতে বসে শুভেন্দুর কথা মনে পড়ল। কাল তার ব্যবহারে কোথাও কোন খুঁত পাইনি। তাকে সন্দেহ করবার মত কোন সুযোগও সৃষ্টি হয়নি। পরিচয় অতি সামান্যই। হিসাব করে বিচার করার মত নয়।

আমার পথ পরিক্রমা সুরু হল আবার।

দিন কেটে যেতেই ধীরে ধীরে ইডেন উদ্যানে গিয়ে বসলাম। কাটা ফলওয়ালার কাছ থেকে নুন মাখানো শশা চিবুতে চিবুতে গিয়ে বসলাম মাঠের মাঝে। অনেকে এল অনেকে গেল, আমি বসে রইলাম একা। রাতের আলো জ্বলেছে, উদ্যান আলোয় আলোময় হলেও গাছের অন্ধকার ছায়ায় তখনও বসে রয়েছে প্রিয়জনের দল। পাশের ঝোপে এসে বসল দুজন। একজন তরুণ আরেকজন তরুণী! তাদের গলার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম।

তরুণী বলল, এখন বিয়ে করতে পারিনা নন্দ।

কেন?

তুমি আমার স্বজাতি নও, বাবা-মা আমাকে কিছুই দেবেনা এই বিয়েতে।

তাহলে তোমার বাবা-মা জীবিত থাকতে বিয়ে আমাদের হবেনা?

হবে। তবে যা আদায় করার তা আদায় করে নিতে হবে

সর্বাগ্রে। তারপর হাতিয়ে নেওয়া শেষ হলে দুজনে রেজেস্ট্রী করে চলে যাব অনেক দূরে।

কানপেতে শুনছিলাম।

থামল ওরা।

ফিসফিসানি শোনা গেল, মোটেই বোঝা গেল না।

তরুণের কণ্ঠস্বর, তোমাকে একটা জিনিস দেব আজ।

কি জিনিস?

তা বলব না। এদিকে এসে বস, আরও একটু কাছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার হাত বাড়াও।

আর শোনা গেল না।

তরুণীর কণ্ঠস্বর, কি অসভ্য তুমি!

সভ্য থাকতে দিলে কই!

তাই বলে মুখে মুখ দিয়ে সোহাগ করতে হবে নাকি!

এই তো সব চেয়ে বড় উপহার।

আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল দুজন।

তারপর আবার ফিসফিসানি।

উঠে পড়লাম সেখান থেকে। তরুণ তরুণীর নিভৃত মিলনের সাক্ষী হবার আকাঙ্ক্ষা ছিলনা আমার। ঘুরতে ঘুরতে রাজভবন পেরিয়ে চিত্তরঞ্জন এভেন্যুর মোড়ে এসে দাঁড়ালাম। চৌরঙ্গীতে তখন আলোর মেলা। কর্মব্যস্ততা কম, ভীড় বেশি খাবারের দোকানে।

হাঁটতে থাকি।

জোড়া বেঁধে চলেছে বহুজন। মন্থর তাদের গতি, কিন্তু উচ্ছল হাসিতে ভরপুর মন। এদের মধ্যে হয়ত সেই তরুণ তরুণীও আছে। তাদের চোখে দেখিনি, কণ্ঠস্বর শুনেছি। আবার কোনদিন তাদের কণ্ঠস্বর কানে এলেও হয়ত চিনতে পারবনা। কিন্তু ভালই লেগেছিল তাদের সেদিনের গোপন প্রণয়ের অভিনয় অথবা অভিসার। আকালু

ঠিকই বলেছে, পেটের ভাত আর সহবাস। সবাই বুঝি এই ছুটি প্রার্থনা নিয়েই জন্মেছে। আর সেই প্রার্থনা পূর্ণ করতে সবাই ছুটেছেও। একে অপরকে বঞ্চনা করেও সার্থক হতে চাইছে।

মাসের পর মাস কেটে যায়।

মাঝে মাঝে শুভেন্দুর কথা মনে পড়ে।

পকেটের অর্থ শেষ হয়ে এসেছে। ঘরের ভাড়া দিতে পারিনি গত তিনমাস ধরে। সকাল হতে না হতেই বেরিয়ে পড়ি রাস্তায়, পকেটের পয়সা হিসাব করে খরচ করি। বাড়িওলার তাগাদায় সারাদিন পথে পথে কাটাই, আর ফিরে যাই অনেক রাতে। সামান্য ভাড়ার ঘর, সে ভাড়াও দিতে পারি না। একদিন হাজির হলাম আকালুর কাছে।

কি খবর হাবিলদার ?—দাঁত বের করে জিজ্ঞেস করল আকালু।

আমার টাকা কটা ফেরত দেবে আকালু।

নিশ্চয় দেব তবে দেরী হবে হাবিলদার। তুমি নিশ্চয় মনে রেখ, এক বাপের বেটা আকালু কখন দু'কথা বলে না। তোমার টাকা নিশ্চয় দেব, আর দুনো দেব। কোন ভাবনা করনা হাবিলদার, তবে দেরী হবে একটু।

বললাম, কত দেরী হবে আকালু ?

তা দু মাসও হতে পারে ছ মাসও হতে পারে।

তোমার তো কারখানা খুলেছে!

সেটাইতো হয়েছে কাল। যখন কাজ ছিলনা তখন বলতে পারতাম কাজ নেই। এখন সে উপায়টি নেই হাবিলদার। হপ্তা পেলেই রাসমণি পকেটে হাত দিয়ে কেড়ে নেয় হপ্তার রোজগার। তার সংসার আগে তারপব ধারদেনা। নইলে কবে শোধ করে দিতাম তোমার টাকা, হেঁঃ।

আর শোনার ইচ্ছা হল না। টাকা ফেরত পাওয়ার আশা যে আর নেই তা বুঝেই ফিরে এলাম। অথচ ঘরভাড়া না দিয়ে এভাবে

থাকার ইচ্ছাও নেই। ঘরভাড়ার টাকাটা কোন রকমে সংগ্রহ করতেই হবে। গলির মুখে নেরুর সঙ্গে দেখা।

এই যে নিমুদা!

কোথায় যাচ্ছ নেরু?

সুবোধদার কাছে। সামনে ইলেকশান জান তো! তারই তোড়জোড় হচ্ছে আবার। তুমিও এবার নেমে পড় নিমুদা। টু পাইস হবে।

কি কাজ করতে হবে?

কিছুই নয়। শুধু ভোট ফর। যারা ভোট দেবে তারা আমাদের চিৎকার শুনেই ভোট দেবেনা, কিন্তু তবুও চিৎকার করতে হবে। আর একটা কাজ করতে পারলেও বেশ ভাল রোজগার হবে।

কি কাজ? প্রশ্ন করে জানতে চাই।

কানের কাছে মুখ এনে সে এবার ফিসফিস করে বলে, কমুনিষ্ট ঠ্যাঙ্গাতে হবে।

তাতে লাভ!

শালারা এ পাড়ায় পা দেবেনা। তাতেই তো সুবিধে।

ওরা বুঝি চুপ করে থাকবে। ফিরতি আঘাত তো কিছু দেবেই।

তা পেটাপেটি করতে গেলে দুঘা খেতেও হয়। সেটা তো ভয়ের কিছু নয়। এই দেখ, বলে নেরু পিঠের জামা তুলে দেখাল। তার পিঠে পুরানো একটা কাটা দাগ।

গতবার শালারা ছুরি মেরেছিল।

একথা তো শুনিনি কখনও!

তুমি শোননি কিন্তু অন্য সবাই শুনেছে। ইলেকশানের দিনে শালারা ছুরি চালাল। বেঁচে গেছি ভাগ্যি, এবার শোধ নিতে হবে নিমুদা। তুমি রেডি হও। আমি তোমার কথা আজই বলব সুবোধদাকে।

বললাম, বেশ। আমাকে কিছু ভাবতে হবে নেরু। হঠাৎ কিছু করার দিকে আমার ইচ্ছা নেই। ভেবে চিন্তে যা হয় করব।

সেবার ভাবতে ভাবতে সিজিন শেষ। মরশুম আসবে পাঁচ বছরে একবার। তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। আখেরে অনেক সুবিধা হতে পারে। লেগে থাকতে হবে।

এবার ভাল করে ভেবে দেখব নেরু। পরে তোমাকে জানাব। তা বলে তোমার সুবোধদাকে টানতে টানতে আমার ঘরে নিয়ে এস না যেন।

আপনি যখন মানা করছেন তখন কি আর তা করব। নিশ্চয়ই করব না।

নেরু ফিরে চলে যাচ্ছিল।

আবার ডাকলাম। জিজ্ঞেস করলাম।

আমার একটা চাকরি করে দিতে পারে তোমাদের সুবোধদা?

নিশ্চয় পারে। তার চেয়েও ভাল, একটা স্টল করে দিতে পারে। টুকটাক ব্যবসা করতে পারবে তুমি।

তাতে মূলধন দরকার নেরু।

তার ব্যবস্থাও সুবোধদা করতে পারবে। তোমার কথা বলব। দেখবে একটা কিছু করবেই। তুমি চল আমার সঙ্গে। সুবোধদার সঙ্গে পাকা কথা বলে আসবে।

কথা বললেই তো কাজ হয় না। শেষ পর্যন্ত কথা রক্ষা করবে তো?

নিশ্চয় করবে। সুবোধদার কথা হল হাতীর দাঁত। কোথাও ভেজাল নেই।

আগে তুমি জিজ্ঞেস কর, তারপর আমি যাব।

নেরু সমর্থন করল আমার প্রস্তাব। বলল, বেশ তাই হবে।

গলি ছেড়ে পথ ধরলাম।

হাঁটতে হাঁটতে মেনকাদিদির বাড়িতে হাজির হলাম।

বাড়ি খালি। আছে শুধু দরোয়ান আর ঝি-চাকর।

জামাইবাবু বদলি হয়ে চলে গেছে মেদিনীপুর। মেনকাদিদিও গেছে তার সঙ্গে।

আশা করেছিলাম মেনকাদিদির কাছ থেকে কিছু নগদ সংগ্রহ করে বাড়িভাড়ার ঝামেলাটা মিটিয়ে ফেলব। সে পথও বন্ধ হয়ে গেল।

আবার হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এলাম।

এসে বসলাম ময়দানে। *

ময়দানে রোজই মিটিং, রোজই শোভাযাত্রার হিড়িক। সেদিনও তাই। বসলাম মনুমেণ্ট থেকে কিছুটা দূরে। বক্তার পর বক্তা বলে চলেছেন, সবারই বক্তব্য আমাকে অথবা আমার দলকে ভোট দাও। সবাই নিজেদের গরিমা আর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে ব্যস্ত। সবাই বলছে 'আমি ভাল'—মন্দ শুধু বিরোধীরা।

শুনতে শুনতে কান পচে যাবার উপক্রম।

শেষ বিচারের দিন এখনও অনেক দূরে, তাই কারও বক্তব্য নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা মূর্খতা।

মিটিং শেষ হবার আগে এসে বসলাম ইউসিসের সামনে। অনেক ক'দিন আগে আর একবার এসেছিলাম এখানে শুভেন্দুর সঙ্গে। অনেকবার মনে হয়েছে শুভেন্দুর সঙ্গে দেখা করব। নিজের দৈন্যের কথা বলে একটা কাজ খুঁজে দিতে বলব। পারিনি। কেমন একটা অহেতুক লজ্জা আমায় গ্রাস করেছিল, কিছুতেই আমি শুভেন্দুর কাছে যেতে পারিনি।

আজ আবার শুভেন্দুর কথা মনে পড়ল।

এক বছর পেরিয়ে গেছে, শুভেন্দুর সঙ্গে দেখা হয়নি। আজ দেখা হলেও হয়ত চিনতেই পারবে না। সেদিন শুভেন্দুর কাছে যে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার পেয়েছি তা ভুলবার নয়।

ইউসিসের লাইব্রেরী হলে ঢুকলাম।

আরে নির্মলবাবু যে, বলে যে লোকটি এগিয়ে এল আমার কাছাকাছি সে-ই হল শুভেন্দু।

সামনে এসে বলল, নমস্কার, চিনতে পারছেন? আমি শুভেন্দু, সেই যে পরিচয় হয়েছিল!

লজ্জিতভাবে বললাম, হাঁ চিনেছি। আপনাকে ভুলতে পারিনি শুভেন্দুবাবু।

অবশ্যই ভুলেছেন, নইলে দেখা করতেন নিশ্চয়ই।

আপনিও তো দেখা করতে পারতেন। ঠিকানা তো দুজনেরই জানা আছে। দোষ ত্রুটি ঘটে থাকলে দুজনেরই হয়েছে, কি বলেন।

শুভেন্দু লজ্জিতভাবে হেসে বলল, ঠিক বলেছেন। গতস্য শোচনা নাস্তি। তা কি মনে করে এদিকে?

দৈব। নেহাত দৈব ঘটনা। এই পথে যেতে যেতেই এসে পড়লাম এখানে। আপনার সঙ্গে দেখা হবে তা ভাবতেও পারি নি। আপনি বুঝি এখানেই থাকেন?

থাকিনা, মাঝে মাঝে আসি। মার্কিনীদের সম্বন্ধে আমার বেশ কিছু আগ্রহ রয়েছে। সেই জন্যই ওদের লিটারেচার পড়তে আসি এখানে। চলুন চা খেয়ে আসি। আহা, ভাবছেন বুঝি আমি আপনাকে আপ্যায়ন করতে চাইছি, তা মোটেই নয়। পাঁচ দশ পয়সার চা আপনিও আমাকে খাওয়াতে পারেন। এটা হল আমাদের পুরানো পরিচয়কে চাগিয়ে তুলতে কিছুক্ষণ একত্রে বসে গল্প করা। নয় কি! আসুন।

সারাদিন যার বাদামভাজা ভিন্ন অপর কোন খাদ্য পেটে পড়েনি, চায়ের এ আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারা তার পক্ষে সহজ নয়। তবুও দু একবার মৌখিক 'না' বলে শুভেন্দুর সঙ্গে সেই পুরাতন চায়ের দোকানে গিয়ে বসলাম।

আজকাল করছেন কি? জিজ্ঞেস করল শুভেন্দু।

অষ্টরম্ভা। যাকে কথায় বলে ভেরেণ্ডাভাজা, তাই ভাজছি।

শুভেন্দু চিন্তিতভাবে বলল, এতো ঠিক নয়। একটা কিছু করা উচিত।

উচিত জানি, কিন্তু পাচ্ছি কোথায়? বিত্তাবুদ্ধি তো এমন কিছু নয় যে কাজ পাওয়া সহজ হবে। আমাদের এ বিত্তাবুদ্ধিতে মন্ত্রী হওয়াই সুবিধাজনক কাজ। অবশ্য যদি দেশের লোক ভোট দেয়।

শুভেন্দু বলল, ঠাট্টা নয়। শুনে থাকবেন এক মিঞা সাহেব গিয়েছিল তখনকার মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেবের কাছে। মিঞা সাহেব তার ছেলের চাকরির উমেদারী করছিল। ছেলেটির বিদ্যা-বুদ্ধির ফিরিস্তি শুনে হকসাহেব বলেছিলেন, ঐ বিদ্যার উপযুক্ত একমাত্র চাকরি যা পাওয়া যায়, তা মন্ত্রীর। ওসব অতীতের কথা। বর্তমানে আমরা আরও কঠিন অবস্থার সম্মুখীন। এদিকে সরকারও নানা সমস্যা নিয়ে বিব্রত। আপরদিকে কম্যুনিষ্টদের অত্যাচারে জনজীবন বিব্রত। এমন অবস্থায় সমস্যার সমাধান করা খুবই কঠিন।

কঠিন জানি, কিন্তু একটা কাজ না হলে তো আর চলে না। কোন সুপারিশের ব্যবস্থা করতে পারেন শুভেন্দুবাবু!

শুভেন্দু চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, পারবেন কাজ করতে?

কেন পারব না!

তা বলছি না। যে কাজ আপনাকে দেওয়া হবে তা করতে পারবেন কিনা তাই জিজ্ঞেস করছি।

আত্মঘাতী কোন কাজ হলে পারব না। সসম্মানে কোন কাজ করার সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই প্রাণ দিয়ে তা করব।

শুভেন্দু বলল, আচ্ছা। দেখি কি করতে পারি। চলুন চা খেয়ে একটা জায়গায় যাব। সেখানে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। তিনি হয়ত কিছু করতে পারবেন।

সাতদিনের মধ্যে আমার চেহারা বদল হয়ে গেল। লাহাবাড়ির সেই গৃহভৃত্য নিমু অথবা ফৌজী হাবিলদার নির্মলকে আবার খুঁজে

বের করা কঠিন হল। আমি পরিচিত হলাম মিষ্টার এন-কে-রে নামে। আমার গতায়াতের স্থান হল সরকারী দপ্তরখানা আর সরকার বিরোধী দলের অফিস।

শুভেন্দু বলল, তোমার স্ত্রী থাকা দরকার। বেশ স্মার্ট স্ত্রী।

বললাম, আমার দুর্ভাগ্য।

অন্তত এমন একজন মহিলার প্রয়োজন যে তোমার সঙ্গে ঘুরতে ফিরতে পারে।

এমন হতভাগী কোথায় পাব শুভেন্দু!

শুভেন্দু হেসে বলল, তোমার চেয়েও বেকার মেয়ে আছে। তাদের একজনকে নিজের মতাবলম্বী করে নিয়ে কাজে লাগাতে হবে। অবশ্য তার এলেম কিছু থাকা দরকার। আচ্ছা আমি দেখছি। তোমাকে ভাবতে হবেনা। তবে সাবধান, জড়িয়ে পড়না। তা হলে তোমার কাজ পণ্ড হবে।

শুভেন্দু পরিচয় করে দিয়েছিল ইলাবতীর সঙ্গে।

নয়নতারার গলির ঘর ছেড়ে এখন বাস করছি সি-আই টি রোডের ফ্ল্যাটে। আমার পরিচর্যা করছে একজন চাকর। সংসার বলতে একা আমিই, আর আমার ভৃত্য পরেশ আমার সংসারের দায়িত্ব নিয়েছে। এই নিভৃত একক জীবনে ইলাবতীকে পেলাম কর্মসঙ্গী রূপে।

ইলাবতী গ্র্যাজুয়েট।

থাকে বিজয়গড়ে। বাবা-মা খুব কষ্ট করে লেখাপড়া শিখিয়েছে মেয়েকে। আশা ছিল, রোজগার করে মেয়ে তাদের সংসার বাঁচাবে। পাঁচ ছয় বছরেও যখন কোন কর্মসংস্থান করতে পারলনা ইলাবতী, তখন একবার তার বিয়ের চেষ্টা করেছিল সবাই। এমন সময় একটা বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করেছিল সে। অনেক মেয়ের ইনটারভিউ নিয়ে শুভেন্দু ইলাবতীকেই যোগ্য মনে করেছিল। কেন যে ইলাবতী যোগ্যতার সার্টিফিকেট পেল তা শুভেন্দু তখন বলেনি।

পরে বলেছিল, যাদের উৎকট দারিদ্র রয়েছে ব্যক্তিগত এবং পরিবার-গত জীবনে, একমাত্র তাদেরই আকর্ষণ থাকে কর্মে। তারা সহজে কর্ম পরিত্যাগ করেনা, অথবা বেইমানীও করে না।

ইলাবতীর গায়ের রঙ উজ্জল শ্যামবর্ণ। দোহারা চেহারা। মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত তার চাহনি।

শুভেন্দুর চিঠি নিয়ে এসেছিল ইলাবতী।

আপনি মিষ্টার রে। পরিচয়ের সূত্রপাতে ইলাবতীর প্রথম কথা।

বলেছিলাম, হঁা।

শুভেন্দু ব্যানার্জী আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

বসুন। আপনিই য়্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছেন?

হ্যাঁ, কিন্তু কি কাজ, কোথায় কাজ তা কিছু বলেন নি। বললেন, মিষ্টার রে আছেন অমুক জায়গায়। তাঁর সঙ্গে দেখা করুন। তিনি যে কাজ দেবেন, যে ভাবে চলতে বলবেন, যেখানে যেতে বলবেন তাই করবেন। মাইনেটা অফিস থেকেই পাবেন।

কাজ! বলে থেমে গেলাম।

অনেকক্ষণ পর বললাম, সাতদিন প্রয়োজন হবে কাজ বুঝতে। অবশ্য এমন কঠিন কিছু নয়। আমাকে মাঝে মাঝেই যেতে হয় সরকারী দপ্তরে। আমার সঙ্গে যেতে হবে। যাতায়াত করলেই বুঝতে পারবেন আমার কাজের ধারা।

ইলাবতীর মুখ শুকিয়ে গেল।

বলল, আমার কেমন ভয় করছে। পারব কি আমি!

আপনি একটি মহান রাষ্ট্রের কর্মচারী, আপনাকে বাধা দেবার কেউ নেই। একমাত্র বস্তু যা সংগোপনে থাকবে তা হল আমাদের পরস্পরের সম্পর্ক। কোথাও আপনি হবেন আমার ভাবী স্ত্রী, কোথাও ভগ্নী, কোথাও বান্ধবী। এই হবে আপনার পরিচয়।

ইলাবতী মাথা নীচু করে বলল, কিন্তু এ পরিচয় কি অশোভনীয় মনে হবে না?

তা বলতে পারেন, কিন্তু একেবারেই কোন পরিচয়হীন অবস্থায় সর্বত্র গতায়াত কি সম্ভব! তার চেয়ে একটা বাহ্যিক পরিচয় সৃষ্টি করে আমরা অনায়াসেই চলতে পারি নিশ্চয়। তাতে আপনার অসম্মান হবে না, আর যদি কখনও অসম্মানিত বোধ করেন, তা হলে বলবেন। দরকার হলে চাকরি ছেড়ে দেবেন।

ইলাবতী মনে মনে ভাবল কিছুক্ষণ। স্থির করতে পারছিল না কি করবে সে। অবশেষে বলল, বেশ তাই হবে।

বললাম, পরে দোষারোপ করবেন না যেন। উভয় পক্ষের সম্মতি ও আগ্রহ বিনা কোন কাজ হয় না মিস্ চৌধুরী। তা হলে আমি লিখে পাঠাই যে মিস্ চৌধুরী আজ থেকে কাজে জয়েন করেছেন! কেমন?

হ্যাঁ। আজকের কাজ কি?

বসুন, বলছি। আমার স্নান খাওয়া হয়নি এখনো। আপনার হয়েছে কি? হয়েছে।—সেই সকালে। আরেকবার খেয়ে নিতে পারেন।

দরকার নেই।

কিন্তু ছুটি পেতে অনেক দেরী হবে। খেয়ে দেয়ে শরীরকে সবল রেখে কাজে নামতে হবে।

ইলাবতী আর কোন বাদ প্রতিবাদ করেনি।

খেতে যাবার আগে এল নেরু, সঙ্গে করে নিয়ে এল ফুচকা, কেলো আর খোকনকে। পাশের ঘরে বসে তাদের সঙ্গে কথা বলা শেষ করে বিদায় দিলাম।

আমার প্রথম দিনের কাজের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ইলাবতী ঘাবড়ে গেল।

শোভাযাত্রা যাচ্ছিল ধর্মতলা স্ট্রীট দিয়ে।

সময় জানা ছিল আগেই। ইলাবতীকে নিয়ে চাঁদনী বাজারের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। শোভাযাত্রা পেরিয়ে গেল আমাদের সামনে দিয়ে

ইলাবতী বলল, এখানে দাঁড়িয়ে কি হবে, চলুন।

এখানে দাঁড়িয়ে থাকাই আমাদের কাজ। দেখুন না কি হয়।

আমার কথা শেষ হবার আগেই দুমদাম আওয়াজ করে বোমা ফাটল কয়েকটা। ছোটাছুটি করতে লাগল পথ চলতি জনতা। একটা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড সুরু হতেই দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেল। ইলাবতী আমার একটা হাত ধরে টানতে টানতে বলল, পালিয়ে চলুন। এখানে থাকলে বিপদে পড়তে হবে।

বললাম, আপনি নির্ভয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকুন। কোন ভয় নেই। আপনাকে আর আমাকে রক্ষা করার ব্যবস্থা রয়েছে যথেষ্ট।

ইলাবতী বুঝতে পারল না। ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেছে, কপালে ঘামের বিন্দু।

পেছন থেকে নেরুর গলা শুনে মুখ ফেরালাম, জিজ্ঞেস করলাম, কি খবর নেরু! সাকসেসফুল মনে হচ্ছে?

আমিও তাই ভাবছি। শোভাযাত্রা ভেঙ্গে গেছে।

পুলিশ ভেঙ্গে দিয়েছে। বোমা পড়তেই শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ। আর তার পরই পুলিশের ওপর ইট আর পটকা পড়তেই পুলিশ ছুটে এসেছে। কার্যসিদ্ধি।

হাত পাতল নেরু।

পাঁচখানা দশ টাকার নোট তার হাতে দিতেই নেরু গদগদ হয়ে বলল, ভয় নেই নিমুদা, এবারও কংগ্রেসের রাজত্ব। এবার কেন, একশ' বছরেও কেউ কংগ্রেসকে হারাতে পারবে না। ভোটের প্রথম ভেট, ভালই হয়েছে। কাল দেখা করব। আপনার আরকোন কাজ না থাকলে সরে পড়ুন।

নেরু ভীড়ে গা ঢাকা দিতেই ইলাবতী কেমন যেন সিঁটকে গেল।

বললাম, চলুন। গাড়ি রয়েছে ওদিকের গলিটাতে। চলুন, বাসায় ফিরে যাই।

বাসায় ফিরে এসে বললাম, এবার বাড়ী যান। আজকের মত আপনার ছুটি।

ইলাবতীর উঠবার কোন লক্ষণ দেখলাম না।

চুপ করে বসে থাকতে থাকতে বলল, আজকের গোলমাল তা হলে আপনার সৃষ্টি?

তা মনে করতে পারেন।

এই বুঝি আমাদের কাজ, সর্বত্র গোলমাল সৃষ্টি করাই হবে আমাদের কর্ম পদ্ধতি।

সব সময় নয়। আজ যা কিছু দেখলেন তা শুধু পরীক্ষামূলক ভাবেই করা হল।

লাভ কি?

অন্যের কি লাভ তা জানি না। আমাদের লাভ হল নিশ্চিন্তে দুমুঠো অন্ন সংগ্রহ।

আমাদের ভাত সংগ্রহ করতে কতকগুলো নিরীহ মানুষ জখম হল, কতকগুলো গ্রেপ্তার হল। এটা আপনি সমর্থন করেন কি?

ব্যক্তিগতভাবে মোটেই সমর্থন করি না। কিন্তু সেই ব্যক্তির অস্তিত্ব রক্ষা করতেই এটা করতে হয়েছে। উপরওয়ালার নির্দেশ। এরজন্য মোটেই চিন্তা করি না, আপনিও করবেন না।

ইলাবতী খুশী হল না আমার কথায়। যাবার সময় বলল, কাল কি কাজ হবে?

সে কথা কাল স্থির হবে। বোধহয় কিছু অভিনয় করতে হবে কাল। তার জন্য প্রস্তুত হয়েই আসবেন। জানেন তো ইলেকশানের আর মোটেই দেরী নেই। এর মধ্যে আমাদের অনেক কাজ শেষ করতে হবে। বহু হ্যাণ্ডবিল পোস্টার আসছে, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

ইলাবতী নিরুৎসাহভরে ঘর থেকে বের হতে হতে বলল, কাল কথা হবে।

আমার কাজ আমার নয়। আমি মেশিন। আমাকে যেভাবে চালাচ্ছে তেমনি চলছি। মনের দিক থেকে সমর্থন না থাকলেও তা করতে হচ্ছে। ইলাবতী প্রথম দিনে আমার এই কার্য পদ্ধতিকে সুসংযতভাবে গ্রহণ করতে পারেনি, অথচ তিনশত টাকা বেতনের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে মানবদরদী হবার মত ক্ষমতাও তার নেই। সেজন্যই তার ইতস্ততভাব। ইলাবতী বোধহয় বুঝতে পারেনি, কিসের দিকে, কিসের জন্য তাকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে।

পরের দিন ইলাবতী বিশেষ সেজেগুজেই এসেছিল। তবুও বললাম, আরও একটু সাজতে হবে মিস্ চৌধুরী। আজ যেতে হবে সরকারী দপ্তরখানায়। শুনলাম, কতকগুলো অবাঞ্ছিত লোককে বসান হচ্ছে বিশেষ বিশেষ পদে। মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করে ঐ সব দুর্জনকে পদচ্যুত করাতে হবে। বলতে বলতে হাসি পেয়ে গেল। হেসেই বললাম আবার, এগুলো আমার কথা নয়। উপরওয়ালার কথা। আর তা মেনে চলাই আমাদের কাজ।

ইলাবতী সাজগোজ শেষ করে আসতেই রওনা হলাম সরকারী দপ্তরের দিকে।

সন্ধ্যাবেলায় যখন ফিরলাম তখন ইলাবতীকে খুবই ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, কিছু খাবেন মিস্ চৌধুরী?

ইলাবতী লজ্জা না করে বলল, মন্দ কি।

খেতে খেতে ইলাবতী বলল, কাজ খুব কঠিন মিস্টার রে। শেষ অব্দি সামলাতে পারব কিনা সন্দেহ!

পারব।

মন্ত্রী তো রাজি হলেন না।

তার নিজস্ব কোন সত্তা নেই মিস্ চৌধুরী। পি-এল-আইনের দয়াতে যারা বেঁচে থাকে, তারা কাটা কৈ মাছের মত লাফায় কিছুক্ষণ, তারপরই চির নিদ্রা দেয় উত্তপ্ত তৈলপূর্ণ কটাহে। প্রথম প্রথম এরা তড়পাবে খুবই। ততক্ষণে আমাদের রিপোর্ট যাবে দিল্লিতে।

দিল্লির কর্তারা চাপ দেবে এখানকার ওপরওয়ালাদের। তারপর, সব ঠিক হয়ে যাবে। আজ যেটা অসম্ভব মনে হচ্ছে কাল সেটাই সম্ভব হবে। শুধু তাই নয়, এই মন্ত্রীমহোদয়টি এরপর আর কখনও ট্যাফো করবেন না।

এতে কার লাভ। স্বাধীনসত্ত্বাবিহীন মন্ত্রীকে দিয়ে দেশের কোন কাজটা হবে বলুন?

বললাম, এ হল আরও হাসির কথা। যদি স্বাধীন সত্ত্বা নিয়েই ওরা কাজ করতে পেত, তা হলে দুনিয়া হত মেছোহাটা, রক্তের গঙ্গা বইত চারদিকে। ওরা গদীতে বসেছে স্বার্থসিদ্ধির জন্য, আমরা ওদের ওপর টেক্কা দিচ্ছি অপরের স্বার্থ রক্ষা করতে আর সেই সঙ্গে নিজেদের রুটি রুজি ঠিক রাখতে। এর বেশি আমরা জানি না। জানার প্রয়োজন হয় না।

কদিন পরে ইলাবতীকে বললাম, আপনাকে মিটিং-এ বক্তৃতা দিতে হবে।

ইলাবতী আশ্চর্য হয়ে গেল।

মজার কথা মনে করছেন। তা নয়। আপনাকে বামপন্থীদলের সঙ্গে গা দিয়ে মিলে মিশে যেতে হবে। সে সব ব্যবস্থা পাকা করেছি। বামপন্থীদের বামাপন্থী করে তুলতে যদি পারেন তা হলে খুবই ভাল। না পারলেও ক্ষতি নেই। আজই আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেব। পরবর্তী কাজ ম্যানেজ করবেন আপনি।

ইলাবতী আমাদের কাজের ধাঁচা বুঝেছে। আপত্তি করল না।

দুপুর বেলায় যে ভদ্রলোক এল তার নাম শুনেছে ইলাবতী, চোখে দেখেনি। বামপন্থীদের বড় একজন লিডার বলেই খ্যাত। ইলাবতী শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে তাকে আহ্বান জানিয়ে বসতে দিল।

পরিচয় পর্ব শেষ করে বললাম, ইনিই মিস্ ইলাবতী চৌধুরী। আপনাদের দলের সদস্যা হতে চান। একে সুযোগ দিন কাজ করবার। দেখবেন আপনাদের জন্য মিস্ চৌধুরী কিনা করতে পারেন।

বামপন্থীদের নেতা সম্মত হল। মৃদুস্বরে বলল, কাল পার্কে একটা নির্বাচনী সভা হবে, তাতে আপনাকে কিছু বলতে হবে।

ইলাবতী সলজ্জভাবে বলল, আমি কি তার উপযুক্ত। আমি পারব না, শেষে ভায়াসে উঠে কেঁদেই ফেলব। তার চেয়ে অন্য কাউকে দিয়ে বলান।

নেতা বলল, তা হবে না। আপনাকেই বলতে হবে। কাল তো বিশেষ কিছু বলবার নেই। আসলে আমরা ভোট চাই। গত কয়েক বছরে কংগ্রেসী দুঃশাসনে দেশের যে দুরবস্থা হয়েছে তা মোটামুটি সবাই জানে, তাদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। তারই একটু গৌড়চন্দ্রিকা করে ক্যাণ্ডিডেটের হয়ে জোরাল ভাষায় কিছু বলবেন।

ইলাবতী আমতা আমতা করে থেমে গেল।

অবশেষে রাজি হল ইলাবতী।

নেতা গোপনে ডেকে বলল। কিছু টাকার দরকার নির্মলবাবু।

কত হলে হবে ?

তা শ দুয়েক। পরে আরও দরকার হবে।

বিনা বাক্যব্যয়ে দুশ' টাকা বের করে দিলাম। খুশী মনে বেরিয়ে গেল নেতা। সে চলে যেতেই ইলাবতী বলল, আপনি এ সব লোককে পাকড়াও করছেন কি ভাবে ?

টাকা দিয়ে। ওরা মুখে বামপন্থী, কাজে মালিকের দালাল। মাসোহারা বন্দোবস্ত আছে। মাস কাবারে গোপনে রাতের অন্ধকারে মালিকের দরজায় হাজির হয় এই শ্রমিক ও কৃষকদরদী নেতারা। দক্ষিণা পেয়ে মাঝপথে আন্দোলনকে কুপোকাৎ করে দেয়। সগর্বে নিজেদের কৃতিত্ব প্রচার করে। পরাজয়কে জয় বলে জাহির করে বাহোবা কুড়োয়। এই সব লোকের কোন চরিত্র নেই। চরিত্রহীনদের সহজেই জয় করা যায় অর্থ দিয়ে। তাই করেছি আমি।

ইলাবতী বিশ্বাস করছিল না।

বললাম, শ্রেণী বিন্যাস সমাজে থাকবে না—এইতো মোদ্দা কথা। বেশ। কিন্তু এই সব নেতা যে সব শ্রেণী থেকে এসেছে, তাদের চরিত্র হল প্রবঞ্চনা। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই সব স্বল্প বিত্তের মানুষ লেখাপড়া শেখে, মার্কস দর্শন পড়ে, তার পর আসে জনতার কল্যাণ করতে। জনতার কল্যাণ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের কল্যাণও কি করে করা যায়, তার চিন্তাও থাকে মনে। অর্থের ঝনঝনানিতে জনতার কথা ভুলে যায়। কেবলমাত্র নিজের চিন্তাটাই প্রবল থেকে যায়। অবশ্য মুখোস থাকে ঠিকই। শ্রেণী সংগ্রামে প্রয়োজন একমাত্র তাদেরই নেতৃত্ব, যারা অত্যাচারিত, যারা অবহেলিত, যারা লাঞ্ছিত। আমাদের দেশে তা নেই, তাই মুখোসই বামপন্থীদের থাকে, বামপন্থী চিন্তা থাকে না। সেই সুযোগের ব্যবহার করছি আমরা।

ইলাবতী আর কোন কথা না বলে নিজের কাজে বেরিয়ে যায়।

আজ সে একাই যাবে পুলিশ অফিসের কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে দেখা করতে। কার্য সিদ্ধ করার দায়িত্ব তার। কাজ হল গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করা। ইলাবতী কদিনেই নিজের কাজ বুঝে নিয়েছে।

ইলাবতীকে শুভেন্দু বুঝিয়ে দিয়েছিল, গোপন সংবাদ সরবরাহ করে সমাজের ও রাষ্ট্রের উচ্চশ্রেণীর মানুষ। বিশেষ করে যারা মদ্যপ এবং ব্যভিচারে লিপ্ত, তাদের কাছ থেকেই সংবাদ সংগ্রহ সহজ। অবনমিত দেশের উচ্চশ্রেণীর মানুষ মর্যাদা পায় অর্থের কৌলীন্যে। এবং অর্থের এই কৌলীন্য অর্জন প্রচেষ্টাই তাদের দুরাচারী করে তোলে। অতএব, সহজ পথ হল এদের সঙ্গে পরিচয় করা এবং সুযোগমত তাদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করা।

শুভেন্দুর কাছ থেকে উপদেশ নিয়ে ইলাবতী আমাকে বলেছিল, এইসব মাতাল ও দুশ্চরিত্র লোকদের সঙ্গে ওঠাবসা করলে নিজের

সত্তা ও সম্মানহানি ঘটবে। আমাকেও তারা তাদের দুরাচারের সঙ্গী করে নেবার জন্য চেষ্টা করবে।

বলেছিলাম, কথাটা ঠিক। তারমধ্যেই নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে হবে মিস্ চৌধুরী। কঠিন পরীক্ষা। আপনার কাজে সন্তুষ্ট হয়েই তো উপরওলা তিনশ' থেকে পাঁচশ'তে আপনার বেতন বৃদ্ধি করেছে! ভবিষ্যতে আরও কিছু হওয়ার আশাও নিশ্চয়ই রাখেন।

ইলাবতী আর কোন উত্তর দেয়নি। এবার থেকে সে নিজেই কাজে নেমেছে।

কতটা সাফল্যলাভ করেছিল তা বলেনি। আমি জিজ্ঞাসা করতেই সে গম্ভীরভাবে বলেছিল, এগোতে দিন, সবুর করুন।

ভোটপর্ব শেষ।

সাতান্ন সাল পেরিয়ে গেল।

ইলাবতী-সাফল্যের গর্বে উদ্ভাসিত। এসে বলল, হয়েছে।

কি হয়েছে।

ও আইন পাশ হবে না। পুলিশ, হোম ডিপার্টমেণ্ট, শ্রমবিভাগ সবাই প্রতিবাদ করেছে।

তা হলে ধামাচাপা পড়ল বলুন?

না, একেবারেই নির্বাসন।

আইনটার নির্বাসন সম্ভব কি? শ্রম আইন সংশোধন হবেই।

হলেও কোন কালেই মালিক-স্বার্থ বিপন্ন হবে না। প্রতিবারই বাধার সম্মুখীন হবে সরকার। আর বাধা দেবে সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং আমাদের অতি বশম্বদ নেতারা।

চিৎকার করে বললাম, ইলাবতী জিন্দাবাদ! এমন কঠিন কাজ সম্পন্ন করা আমার পক্ষেও সম্ভব ছিল না। আপনি অসাধ্য সাধন করেছেন।

ইলাবতী হাত বাড়িয়ে দিল।

বুঝতে পারলাম না।

রসদ চাই, বলল ইলাবতী।

কয়েকখানা নোট তার হাতে দিয়ে বললাম, এই কাজের জন্য।

ইলাবতী হেসে বলল, টাকার জন্যই এই কাজ।

আমার কেমন ভাবান্তর হল ইলাবতীর আচরণে। কাজ সে করেছে ঠিকই, পুরস্কার পেয়েছে, টাকাও পেয়েছে। কাজ, পুরস্কার তার কাছে অবান্তর বিষয়, আসল হল টাকা। তা হলে কি ইলাবতীও অর্থের জন্য সব কিছুই করতে পারে!

ভেবে ঠিক করতে পারলাম না।

সেদিন ইলাবতীকে বললাম ঘরে ফিরে যেতে। আমি নিজের শয্যায় গা এলিয়ে দিয়ে ভাবছিলাম। ভাবতে ভাবতে দেহটা ঝিম ঝিম করে উঠল। আমিও কি অর্থের জন্যই কাজে নেমেছি। নিশ্চয় তাই! আমিও তো বাঁচতে চেয়েছিলাম! আজ বাঁচার মত বাঁচতে পেরেছি। অভাব অভিযোগ কিছু নেই। স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে কাজ করছি। কাজের জাতি বিচার করা আমার ধর্ম নয়। আমার ধর্ম কাজ কবা। তাই কবছি। ভাড়াটীয়া জীবন, কর্মের বিনিময়ে পারিশ্রমিক।

ইলাবতীর সঙ্গে বৎসরাধিক কাল কাজ করছি। ঘনিষ্ঠতা জন্মেছে, কোথাও সামান্যতম চক্ষুলজ্জা অথবা ইতস্তত ভাব নেই। অন্য ক্ষেত্রে হয়ত অনুরাগ জন্মাত। সে সুযোগ ঘটে নি। তবুও ইলাবতী সময় মত হাজিরা না দিলে দৃষ্টি জানালা পেরিয়ে সদর রাস্তায় ছুটে যায়, কাজ থেকে মনটা কোথায় যেন হাওয়াতে ভাসে। ইলাবতীর চাল চলনে কোন সময় বুঝতে পারিনে তার মনের কথা। বিশেষ আগ্রহীও ছিলাম না। ইলাবতী সম্বন্ধে সজাগ হয়েছিলাম সেইদিনই, যেদিন সে খবর দিল তার এনগেজমেন্টের।

বললাম, শুভ সংবাদ। কবে নেমতন্ন পাচ্ছি?

চিঠি পাবেন। কিন্তু আমার কর্মজীবনেও ইস্তাফা দিতে হবে মনে হচ্ছে।

সেটা আপেক্ষিক। আপনার অভিরুচির ওপর নির্ভর করছে।

ইলাবতী-মুখ ঘুরিয়ে বলল, জীবনকে এভাবে পেতে চাইনি নির্মল বাবু।

আমার মুখ দিয়ে অসারে বের হল, কেন?

নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখেছি এতটা কাল। কিন্তু প্রতিষ্ঠার বদলে ধ্বংসকেই ডেকে এনেছি বলে আমার বিশ্বাস।

ইলাবতী আর ব্যাখ্যা করে নি। তার প্রয়োজনও ছিল না। সারা জীবনের অনন্ত প্রশ্নভরা সমস্যা তার সামনে, তাকেই খুঁজতে হবে তার সমাধান। তার মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে নিজের কর্মক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করতে চাই না।

তবুও ইলাবতী যেদিন বিয়ের আসর থেকে সংসারের আসরে নামল, যেদিন সে বিদায় নিল আমাদের কর্মক্ষেত্র থেকে, সেদিন মনে হয়েছে একটি মূল্যবান রত্ন হারালাম আমরা। যে ইলাবতীকে এত কাল ভেবেছি অর্থের দাসী, সে ইলাবতী আজ অর্থকে ব্যঙ্গ করে অনর্থপূর্ণ সংসারে কেন যে পা দিল, তা সেদিন বুঝতে পারিনি। পরে বুঝেছিলাম, অন্নের দাসত্ব করার চেয়েও আরও বড় কিছু আছে। তারজন্যই ইলাবতী অর্থের মোহ পরিত্যাগ করতে পেরেছিল।

নতুন অফিসার এসেছে মিষ্টার কডগেল।

এসেই হিসাব নিতে বসল কাজকর্মের। কাজের ফিরিস্তি আর ফলাফল দেখে কডগেল খুশী মনে একদিন ডেকে বলল, আমাদের কয়েকজনা মহিলা কর্মী দরকার!

বললাম, অনেকেই তো আছে!

ঠিক কাজের উপযোগী যে ক' জন তা বুঝতে পারছি না।

কাজের উপযোগী যে মেয়ে সেতো বিয়ে করে চলে গেল। তাকে চাকরিতে রাখা সম্ভব হয়নি। অবশ্য সে কমিশনের ভিত্তিতে কাজ করতে সম্মত হয়েছে।

তাকে খবর পাঠাও নির্মলবাবু। তাকে আবার মাসিক বেতনে বহাল করা হোক।

খবর পাঠিয়েছিলাম কিন্তু ইলাবতী আর কনসাল অফিসে আসে নি। একদিন সূর্য উঠবার আগে ইলাবতী আমার ফ্ল্যাটে এসে হাজির। সোজাসুজি প্রশ্ন করল, আমাকে কেন আবার ডেকে পাঠিয়েছেন নির্মলবাবু!

আপনাকে পাকা চাকরি দেবে মার্কিন সরকার।

কি কাজ?

যে কাজ করছিলেন।

আমি দুঃখিত। নিম্নবিত্তের মানুষ আমরা। দুটি খেয়ে পড়ে বাঁচতে চাই। আমার পক্ষে আর ওকাজ করে চলা মোটেই সম্ভব নয়। সমাজের যারা উচ্চশ্রেণীর মানুষ, তাদের স্পৃহা বেশি, তাদের কাছে দেশ ও দেশের মানুষের কোন মূল্য নেই। তারাই পারে, আমরা পারি না। দারিদ্র বিপথে টানে সত্যি, কিন্তু দরিদ্রের যদি মর্যাদা-বোধ থাকে তা হলে সে আত্মবিক্রয় করতে পারে না, আমিও পারব না নির্মলবাবু। আমার মনে হয়,...

কি মনে হয় মিসেস মজুমদার!

আপনিও এই কাজ থেকে মুক্তি নিন। তাতে আপনার ব্যক্তিসত্তা বাঁচবে, আপনার দেশ বাঁচবে। দেশের অগণিত দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের দুঃখের অংশীদার হতে পারবেন, আর সেইটেই হবে সবচেয়ে বড় কাজ। আপনার অর্থ আছে, সম্পদও হয়ত সৃষ্টি হয়েছে। আপনি নিজের গাড়িতে ছুটে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু কিসের বিনিময়ে তা ভেবেছেন কি?

উত্তর দিতে পারলাম না।

ইলাবতী কথা না বাড়িয়ে চায়ের পেয়ালা খালি করে বেরিয়ে গেল।

পরাজয়ের গ্লানিতে আমি মরমে মরে গেলাম। একটি মেয়ের যে সাহস, সে সাহস আমার কেন নেই তা ভেবে ঠিক করতে পারলাম না।

ইলাবতী আমার চোখ খুলে দিতে চেষ্টা করেছে, কতটা সফল হয়েছিল, তা বলতে পারি না।

বিকেলবেলায় এক দঙ্গল ছেলে মেয়ে হাজির। কনসাল অফিস বড়ই ব্যস্ত। ছেলেমেয়েরা এসেছে মার্কিন মুলুক থেকে, ভারত দর্শনে। তাদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শহর দেখাবার দায়িত্ব দিল আমাকে। আঠার থেকে বাইশ বছরের ছেলে মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডেপুটেশনে এসেছে ভারতীয় ভাবধারা ও জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হতে।

পরদিন তাদের নিয়ে বের হতে হল।

গাড়ির শোভাযাত্রা। আমার গাড়ি পাইলট।

ঘুরতে ঘুরতে বিশ্রামের আশায় সবাই এসে বসলাম বোটানিক্যাল উদ্যানে।

নারীপুরুষের কলরবে নীরব দুপুর মুখরিত, উদ্যানের পরিবেশে নতুন একটি স্পন্দন। আমি দূরে বসে উপভোগ করছিলাম। একক কেউ নয়। সবাই নিজ নিজ সঙ্গী বা সঙ্গিনী নিয়ে ব্যস্ত। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান কতটা না বুঝতে পারলেও বুঝতে পারলাম ওরা সবাই সেই আদিম মানব আর মানবী। ভারতের আর আমেরিকার মেয়ে পুরুষের পার্থক্য খুব কোথাও নেই। যৌবনের দূত, ভোগবিলাসের পুরোধা, হাস্য-লাস্যের পাণ্ডা ওরা সবাই।

থাকত যদি ইলাবতী, তাকে ডেকে দেখাতাম সত্যকার জীবন কি! ঘোমটা টেনে বাসন মেজে সংসার সাজাবার চেয়েও কত বেশি সুন্দর এই জীবন তা বুঝিয়ে দিতাম ইলাবতীকে।

একজোড়া নারী-পুরুষ, দম্পতি নয়।

এসে দাঁড়াল সামনে।

মেয়েটা বলল, আমি ফিলিস গ্রীন। ফিলাডেলফিয়ার মেয়ে।

ছেলেটা তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলল, আমি ডিক হাণ্টার। ওহিও থেকে এসেছি।

জিজ্ঞেস করলাম, কেমন লাগছে এ দেশটা।

তুজনেই হেসে উঠল।

বলল মেয়েটা, দয়া পেতে পার।

ছেলেটা বলল, কিন্তু মর্যাদা পেতে পার না।

লজ্জায় মাথা নীচু করে রইলাম।

ভিখিরী, ভিখিরী, ভিখিরীর দেশ। আমরা দেই, তাই তোমরা বেঁচে আছ। ভিখিরীকে ভাললাগা কি সম্ভব! তোমাদের মন্ত্রীরা হল ভিখিরীর লিডার। তারা আমাদের দেশে যায় ভিক্ষা করতেই।

ছেলেটাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল মেয়েটা।

অসভ্যের মত কথা বলছ ডিক্। আমরা এদেশের অতিথি। আমরা সমালোচনা করতে আসিনি। আমরা এসেছি, কতটা সাহায্য এদের করতে পারি তারই জরিপ করতে।

ডিক লজ্জিত হল না। তবে পরাজিত হল। আর কোন কথা বলার সাহস তার হল না। রক্তচক্ষু নারী তাকে সংশোধন করে দিলেও কোন মতেই তাকে ডিঙ্গিয়ে নিজের কথা বলতে পারল না।

তুমি তুঃখিত হয়ো না মিষ্টার। ডিক্ বড়ই অশালীন ব্যবহার করেছে। আমি তুঃখিত।

তু জনের বক্তব্য এত বেশি পরিষ্কার যে তুঃখ জানিয়েও আমার মনের গ্লানি মোচন সম্ভব হয়নি সেদিন। সেদিনই প্রথম বুঝতে পেরেছিলাম, আমার তথা ভারতের মর্যাদা পশ্চিমীদেশের চোখে কতটা হীন। আমি নীরবে সহ্য করেছি, উপায় ছিল না।

সেদিনের ভ্রমণ শেষ করে যখন বাড়ি ফিরলাম তখন মনে মনে ইলাবতীকে প্রশংসা করলাম। দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে আমাদের বিপথে চালনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে জেনেই সে আমাদের সংসর্গ ত্যাগ করেছে, সে জন্য তাকে ধন্যবাদ।

আমার মত আরও শত শত জন দারিদ্রের নিষ্পেষণ থেকে নিষ্কৃতি পেতে আমার মতই আত্মবিক্রয় করেছে ও করছে। এই

দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য শাসককুল কোন সময়ই আগ্রহী নয়। কারণ, তারা না বললেও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, দেশের অশিক্ষা আর দারিদ্র্যকে মূলধন করেই শাসকরা তাদের শাসন কায়েম করার বেশি সুযোগ পায়। আর সে সুযোগ সম্পূর্ণই গ্রহণ করেছে তারা।

তারপর একদিন নিজেকে বিশ্লেষণ করবার সুযোগ এল। বাল্যকাল থেকে নিজেকে গড়ে তোলার অজ্ঞাত কারণগুলো যখন চুপিসারে জ্ঞাত হবার উপক্রম করছিল তখন ভাবতে পারিনি এই অবাধ্য মনটা আমার সঙ্গে বেইমানি করবে। শুধু বাঁচার জন্য জীবনের বিভিন্ন পথ বেয়ে আনমনা হয়ে চলতে চলতে কখনও যে আর্থিকলাভের মাধ্যমে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিক্রি করে ফেলব তা ভাবতেও পারিনি। ব্যক্তিস্বার্থে নিজেকে বিক্রি করা সব চেয়ে ঘৃণ্য কিছু নয়। কর্মজীবনে নিজস্ব সত্ত্বাকে বড় করে দেখবার উৎকট আকাঙ্ক্ষা থাকলে পরাজয় বরণ করা ভিন্ন দ্বিতীয় কোন পথ খোলা থাকে না, তাই নিজেকে বিক্রি করা অপরাধ মনে করেনি। কিন্তু বিক্রীত মানুষ যখন অপরের নীতিবোধকে হত্যা করে তখনই তা হয় সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজ। আমি সে কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম, অবশ্যই অজান্তে।

যেদিন নীতিবোধের কাছে নিজের পরিচয় আর গোপন রইল না, যেদিন বাইরের জীবনকে অন্তরের জীবন দিয়ে দেখতে পেলাম, সেদিন নিজেকে আর ক্ষমা করতে পারলাম না।

নিজেকে প্রশ্ন করেছি, আমি কি চেয়েছি!

অনন্ত এই প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর, বাঁচতে চেয়েছি।

বাঁচতে চেয়েছি ঠিকই, বাঁচার জন্য প্রয়োজন কি!

প্রয়োজন!

আহার্য!

আর কি?

সৃষ্টি।

কে যেন কানের কাছে মুখ রেখে বলল, বাঁচ, বাঁচতে দাও। ক্ষুদ্রতম পরিবেশে আহার্য জোটাও, পরিবার সৃষ্টি করে তাদের বাঁচাও। এই-ই যুগ যুগান্তের ধ্রুব সত্য, সৃষ্টির অমোঘ নির্দেশ।

তাকিয়ে দেখ, জীবন্ত সব কিছুই বাঁচতে চায়, সৃষ্টি করে। তোমার ধর্মও তাই। গাছ বাঁচে, ফুলে ফলে সৃষ্টির আনন্দ পায়! পশু আহার্য সংগ্রহ করে, সন্ততিকে স্তন্যপান করায়, সন্ততির আহার্য খুঁজে আনে স্বীয় সৃষ্টিকে রক্ষা করতে। এই তো প্রয়োজন, এই তো আকাঙ্ক্ষা জীবনধর্মের! তুমি তো ব্যতিক্রম নও।

আরও চাই!

সে হল অলঙ্করণ, লোভের প্রচণ্ডতা। তাতেই তো দেখা দেয় বঞ্চনার প্রবৃত্তি, তার জন্যইতো অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে, তার জন্যই তো নীতিহীনতা।

ভাবতে ভাবতে চোখের ঘুম গেল ছুটে, মন ছুটল পেছনে ফেলে আসা দিনের দিকে।

মেনকাদিদির বাড়িতে ছুটে গেলাম।

আমার রঙীন হিন্দুস্থান গাড়িখানা গিয়ে দাঁড়াল তিনকোনা পার্ক পেরিয়ে মেনকাদিদির বাড়ির সামনে।

গাড়ি থেকে নেমে হট্‌হট্ করে ঢুকলাম জামাইবাবুর চেম্বারে। আমাকে চিনতে পারল না জামাইবাবু। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই জিজ্ঞেস করল, ঠিক চিনতে পারলাম না তোমাকে।

হাত জোর করে বললাম, আমি নিমু, নির্মল।

চশমাটা কপালে তুলে জজসাহেব বিস্মিতভাবে বলল, Oh God! তা ভাল আছ তো!

আপনাদের শ্রীচরণের কৃপায় মোটামুটি দিন কাটছে।

বস বস। কি করছ আজকাল। তোমার মেনকাদিদিকে খবর দিচ্ছি। এখানেই আসবে। বস। হ্যাঁ নিমু, বলেই জজসাহেব অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, পুরুষস্য

ভাগ্যম। গাড়িটা নিশ্চয় তোমার! রাখু, তোর মাকে ডেকে দেতো।

আজ্ঞে হাঁ।

রাখু মেনকাদিদিকে ডেকে দিয়েছিল। আমাকে মেনকাদিদি প্রথমে চিনতেই পারেনি। অনেকক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, তুই তো নিমু।

বললাম, আজ্ঞে হাঁ।

তা বাইরে কেন, ভেতরে আয়।

মেনকাদিদি ভেতরে ডেকে নিয়ে গেল, সেই পুরোনো টুলখানা টেনে দিয়ে বলল, বস। তোকে দেখে মনে হচ্ছে বেশ ভালই আছিস আজকাল।

আপনার দয়া।

তোর সৌভাগ্য দেখাতে এসেছিস বুঝি!

লজ্জায় কান মুখ লাল হয়ে গেল।

বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াতেই দেখেছিলাম তোকে। ঠিক চিনতে পারিনি, কেমন সন্দেহ হচ্ছিল। মুখোমুখি দেখে চিনতে আর কষ্ট হলনা। কিন্তু কোথায় পেলি এত সব!

ভগবান।

ওটা বিশ্বাস করিনা। তিনটাকা বেতনের নিমুচাকর, যার বিদ্যা-শিক্ষা আমার কাছে, তাকে নিজের গাড়ি হাঁকিয়ে আসতে দেখলে অনেক কথা মনে হয়। হয়ত লটারির টিকিট পেয়েছিস্, না হয় চোরাকারবার করছিস।

মেনকাদিদিকে বাধা দিয়ে বললাম, কোনটাই নয়। কমিশন পাচ্ছি। কাজ করতে পারলে মোটা দক্ষিণা, তার সদ্ব্যবহার করছি।

মেনকাদিদির মুখটা কালো হয়ে গেল, তার মুখ দেখে মনে হল আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেনি। শুকনো হাসিতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, আমার কাছে সেদিনের সেই নিমু

বিনা তুই আর কিছুই নোস। ভগবান যদি দিয়ে থাকেন, তাকে ধন্যবাদ দি।

দেওয়াটাকেই বড় করে দেখলেন বড়দিদি। যেদিন একটুকরো শুকনো রুটির জন্য পথে পথে ঘুরেছি সেদিনের না-দেওয়াটাকে ছোট করে দেখলে চলবে না। না-দেওয়াটাইতো দেওয়ার পথে টেনে নিয়ে চলে চিরকাল।

মেনকাদিদি বিজ্ঞের মত বলল, আমি সন্তানের মা, আবার গৃহস্থ ঘরের বউ, কারও বোন, কারও মেয়ে। আমার এই সামান্য জীবনেও কত ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। তেমনি জীবনের সব কিছুই চলতে থাকে নানা ভূমিকায় একই মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের উপর দিয়ে। আমরা অভিনেতা, অভিনয় করি। ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়লেও অভিনয়ের শেষ নেই মৃত্যু অবধি। দেওয়া আর না-দেওয়া তুল্যমূল্য মনে করেই চলতে হয়। ছোট-বড় কোনটাই নয়।

সহসা উঠে মেনকাদিদির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই মেনকাদিদি বলল, আবার প্রণাম কেন!

জীবনে একটি মানুষই পেয়েছিলাম যে আমাকে পাথেয় দিয়েছিল বাঁচার এবং বাঁচতে শেখার। সে আপনি। কিন্তু পাথেয় হয়ত কখনও কখনও অপব্যবহার করেছি, তার জন্য মার্জনা ভিক্ষা করে নিচ্ছি। আমি সেদিন যেমন নিমু ছিলাম আজও তেমনি রয়েছি।

মেনকাদিদি কিছুই বুঝতে পারল না। কিছুক্ষণ বিস্মিত ভাবে চেয়ে থেকে বলল, বিয়ে করেছিস নিমু?

হেসে বললাম, না।

কবে করবি! বয়স তো বাড়ছে।

বিয়ের বয়স সব সময়ই থাকে। নিজেকে রক্ষা করতে গলদঘর্ম, অপরকে রক্ষা করার সামর্থ্য আছে কিনা ভেবে ঠিক করতে পারিনি।

মেনকাদিদি হেসে বলল, প্রথমে তাই মনে হয়, শেষে সহ্য হয়ে যায়। দু'জনকে দু'জনেই রক্ষা করে, পরস্পর নিমিত্ত মাত্র। নে

খেয়ে নে। এবার যখন আসবি তখন গাড়ি হাঁকিয়ে আমার দরজায় আসিস না যেন। বরং গাড়িটা দূরে কোথাও রেখে হেঁটে আসিস, নইলে তোর সঙ্গে কথা বলে সুখ হবে না। তোকে নিমু না ভাবতে পারলে খুবই কষ্ট হবে। নির্মলবাবু মনে করবার মত মন এখনও তৈরী হয় নি। আর তা যদি না পারিস তা হলে আসিস না। কেমন!

কথা শেষ হবার আগেই জজসাহেব ভেতরে এসে দাঁড়ালো। বলল, তোমার নিমুকে দেখছ তো। কেমন পরিবর্তন হয়েছে। ভগবান ওর সুমতি দিক, মঙ্গল করুক।

মেনকাদিদি কোন উত্তর না দিয়ে মৃদু হাসল।

হাসছ কেন গো। ও যদি তোমাদের ঘরে থাকত তা হলে নিমু চাকর হয়েই থাকত। আমার কাছে থাকলে বড়জোর আদালতের বেয়ারা হত। এই তো ভাল হয়েছে। তোমাকে কতবার বলেছি, পুরুষের ভাগ্য। ছিলাম মুনসিফ, হয়েছি জজ। ভাগ্য বিনা আর কি বলতে পার। ইংরেজ থাকলে সবজজ হয়েই বিদায় নিতে হত। ভাগ্য এমনি ভাবেই খোলে। আমি বলছি নিমু আরও বড় হবে।

মেনকাদিদি বাধা দিয়ে বলল, তোমার কাচারির বেলা হয়ে গেল, স্নান করতে যাও।

যাচ্ছি। কিন্তু আজ একটা জাজমেণ্ট লিখতে গিয়ে হদিস খুঁজে পাচ্ছি না। একবার মনে হচ্ছে আসামী অপরাধী আবার মনে হচ্ছে আসামী নির্দোষ। কি যে করি ভেবে পাচ্ছি না।

ওসব তোমার উকীল ব্যারিষ্টারদের সঙ্গে আলোচনা করগে। এখন খেয়েদেয়ে কাচারি যাও।

তা বটে। বলতে বলতে জজসাহেব নিজের ঘরে ঢুকলেন।

আমিও দাঁড়িয়ে বললাম, আজ তা হলে আসি বড়দিদি।

মেনকাদিদি কোন কথা না বলে মাথা নাড়লেন।

বাইরে এসেই মনে হল, আশ্চর্য! বোধহয় আভিজাত্যের অহমিকায় মেনকাদিদি আমার সৌভাগ্যকে সহ্য করতে পারল না!

বিশ্বাস করতে পারলাম না। কেমন জট পাকানো মেনকাদিদির কথাগুলো।

ফিরে এসে নির্দেশ পেলাম দিল্লি যাবার। দিল্লীতে ওয়ার্কিং কমিটির সভা। সেখানে মার্কিন স্বার্থের পরিপন্থী কোন প্রস্তাব যাতে গৃহীত না হয় তার জন্য সদস্যদের হাত করতে হবে, কয়েকজন প্রভাবশালী নেতাকে নিশ্চয়ই বশে রাখতে হবে।

ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে সপ্তাহ কেটে গেল। সভার দেরী তখনও সাত আটদিন। একদিন বিকেলে কেমন খেয়াল হল, ফিরে যেতে মন চাইল সেই পুরানো দিনে। পোষাক বদল করে পুরানো ছেঁড়া ট্রাউজার আর গলাখোলা সার্ট পরে পায়ে হেঁটে বের হলাম পথে।

একদল মেয়ে যাচ্ছিল হাসিখুশীভাবে। তাদের পেছন পেছন চলছিলাম কলেজ স্ট্রীট ধরে। তাদের আলোচ্য বিষয়গুলো মন দিয়ে শুনছিলাম। সব না হলেও কিছুটা কানে আসছিল। বসন্ত বাতাসের প্রথম পর্যায় তারা পেরিয়ে এসেছে। কলেজ জীবনও বোধহয় তাদের শেষ। নিজেদের রূপের সঙ্গে পুরুষের রূপের তুলনা করতে তারা সিদ্ধ। বিশেষ করে পর্দার অভিনেত্রীদের চেয়ে অভিনেতাদের কৌমার্য অথবা রূপ তাদের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। পর্দার মানুষরা যে কে কি, তার ঠিকুজিকুষ্ঠি তাদের নখাগ্রে। মাঝে মাঝে নিজেদের প্রণয়ভাজনদের উল্লেখও করছে। তাদের কথাও বেশ বিন্যাস করে বলছে। যৌবনধর্মী তারা, যৌবনের তেজ অথবা কর্মক্ষমতা কতটা রয়েছে তা বলা কঠিন। কিন্তু যৌনজীবনই যে যৌবনের মূখ্যধর্ম সে সম্বন্ধে সবাই সমান ওয়াকিবহাল।

হরলালকার দোকানে তারা ঢুকল।

আমিও প্রবেশ করলাম তাদের পেছন পেছন।

এতক্ষণে তাদের দৃষ্টি পড়ল আমার ওপর। বেশ ভূষায় নেহাত মজুর শ্রেণীর তাই দৃষ্টিতে কোন জিজ্ঞাসা নেই, বরং উপেক্ষা। জিনিসপত্র দাম করেই তারা ফিরে গেল। কেনার আগ্রহ অথবা

সামর্থ্য বুঝা গেল না। দোকান থেকে বেরিয়েই গেল হকারস কর্ণারে। আমিও পিছু পিছু চললাম। এবার তাদের দৃষ্টিতে সংশয়। আমি যে তাদের পেছন পেছন চলছি অনেকক্ষণ ধরে তা তারা বুঝতে পেরেছে। হকারস কর্ণারে বিলম্ব না করে মির্জাপুর ধরে পুব দিকে এগোতে থাকে ওরা সবাই।

আমিও চলেছি ওদের পেছন পেছন।

পূরবীতে এসে ওরা ঢুকে পড়ল ভেতরে। টিকিট ওদের কাটাই ছিল, সিনেমা দেখতে বেরিয়ে বাজার যাচাই করছিল মাত্র। মনে মনে হাসলাম। তাড়াতাড়ি একটা সর্বোচ্চ শ্রেণীর টিকিট কেটে আমিও ঢুকে পড়লাম সিনেমা হলে।

আজকের এ খেয়াল কেন যে মাথায় ঢুকল তা জানিনা, কিন্তু মেয়েদের দলটার ওপর নজর রাখার ইচ্ছা মোটেই সংযত করতে পারছিলাম না।

সিনেমা দেখতে বসে ভাবছিলাম নিজের কথা।

ইন্টারভ্যালে বেরিয়ে পড়লাম হল থেকে। ট্যাক্সি করে সোজা গেলাম নিজের বাসস্থানে। কাপড়জামা বদলে গাড়ি নিয়ে বের হলাম। যখন আবার সিনেমা হলে এসে পৌঁছলাম তখনও সিনেমা শেষ হতে পনর বিশ মিনিট দেরী! আবার গিয়ে বসলাম নিজের আসনে।

জীবনের অভিনয়। মেনকাদিদি ঠিকই বলেছে।

হল থেকে যখন বের হলাম তখন আমি নতুন মানুষ। আজ আমার এ-এক নতুন অভিনয়!

গেটের সামনে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

হল থেকে বেরিয়ে ওই মেয়েরাও শঙ্কিতভাবে খুঁজছিল আমাকে। কিন্তু একটুকাল আগেকার সে মানুষটিকে আর খুঁজে পেল না। অনেকটা নিশ্চিন্তমনে তারা এসে দাঁড়াল পার্কের কোনায়।

বাবা, লোকটাকে দেখেই বুঝেছি গুণ্ডা।

বাড়িতে বলিস না যেন, তা হলে মা আর বেরুতে দেবে না।

সত্যি ভাই কলকাতায় এতদিন আছি কোনদিন বদমাইশের পাল্লায় পড়িনি। বদমাশটা গেল কোথায়!

দেখল কোন আশা নেই তাই পালিয়েছে।

সবাই এগিয়ে চলল মির্জাপুর ধরে পশ্চিম দিকে।

হাসতে হাসতে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলাম।

অভিনয়টা মন্দ হয় নি।

সোজা গেলাম ওয়ার্কিং কমিটির একজন সদস্যের বাড়িতে। আমার জন্যই অপেক্ষা করছিল। ঘরে ঢুকতেই সাদরে বসতে দিয়ে বলল, আপনার কথা ভেবেছি মিষ্টার রায়, কিন্তু আমার একার মতের ওপর তো সব কিছু নির্ভর করছে না। বিশেষ করে যারা শক্তিশালী তাদের হাত করতে না পারলে কোনই লাভ নেই। শ্রমনীতি নির্ধারণ নিশ্চয়ই কঠিন ব্যাপার। জনসাধারণের বন্ধু সেজে থাকতে হবে, তাদের মনে সন্দেহ জাগলে আমাদের কপাল ভাঙ্গবে। তাতো বোঝেন। কিন্তু!

কিন্তু কি?

শক্তিশালী লোকদের হাত করতে হলে অর্থের প্রয়োজন।

আমরা তার জন্য প্রস্তুত।

কিন্তু দু দশ টাকার ব্যাপার নয়।

দু দশ হাজার!

তাতো বটেই।

দরকার হলে পঞ্চাশ ষাট থেকে লক্ষ লক্ষ দেবার সঙ্গতিও আছে। আপনি ব্যবস্থায় নেমে পড়ুন। টাকা এখানেই দিতে হবে কি। না দিল্লিতে!

নেতামহোদয় মাথা চুলকে বলল, কিছু এখানে কিছু দিল্লিতে।

ভাল কথা। কাল বিকেলে পাবেন। কিন্তু দেখবেন কোন ক্রমেই যেন মার্কিন স্বার্থ বিপন্ন না হয়।

নিশ্চয় নিশ্চয়।

ভুড়িভোজনের ব্যবস্থা ছিল। সৎকার করে বেরিয়ে পড়লাম। গাড়ি পর্যন্ত এসে নেতামহোদয় গাড়ীতে তুলে দিল। আমিও খুশী মনে ফিরে এলাম।

বাড়িতে ফিরে চিঠি পেলাম মেনিমাসীর। তার জবানীতে চিঠি লিখেছে কোন মেয়ে। চিঠিখানা ঘুরতে ঘুরতে প্রায় পনর দিন পরে হাতে এসে পৌঁছল। সংবাদ নয়, দুঃসংবাদ। এবার সত্যি সত্যি মেনিমাসী কঠিন রোগগ্রস্ত। হিসাব করে দেখলাম, তার রোগ আর তার বয়স। পনর দিন আগের চিঠি। হয়ত মেনিমাসী এতদিন বেঁচে নেই, থাকলেও নিজের কাজ ছেড়ে মেনিমাসীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া সম্ভব নয়।

বিবেকের কেমন দংশন অনুভব করতে থাকি। রোগগ্রস্ত মেনিমাসীর সংবাদ নেওয়া কর্তব্য। কাগজ কলম নিয়ে বসলাম। মেনিমাসীকে উদ্দেশ করে লিখলাম, দিল্লি থেকে ফেরবার পথে মেনিমাসীর কাছে যাব। চিঠিখানা রাতের বেলায় ডাক ঘরে পাঠালাম। শেষে ডাকে দিতে যদি ভুলে যাই, তার চেয়ে অগ্রিম সেরে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

দিল্লিতে কার্য সিদ্ধি করতে তিরিশ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিল। ওয়ার্কিং কমিটির সভায় শ্রমনীতি নিয়ে বিশেষ কোন প্রসঙ্গই উত্থাপিত হয়নি। সমাজতন্ত্রের সেই পচা বুলি আউড়ে যে যার ঘরে ফিরে গেল। আমিও যেন ওয়াটারলুর যুদ্ধ জয় করে কলকাতার পথ ধরলাম। বিমানে দিল্লি গিয়েছিলাম, ফিরছিলাম ট্রেনে। প্রয়োজন ছিল দেওঘর যাবার।

দেওঘরে পৌঁছেছিলাম ভোর বেলায়।

টাঙ্গা ডেকে মেনিমাসীর আস্তানায় পৌঁছে দেখি খাঁচা শূন্য।

মেনিমাসী বিদায় নিয়েছে চিরতরে। বাড়িওয়ালার কাছে সংবাদ নিয়ে জানলাম, প্রায় সতর দিন আগে মেনিমাসী সজ্ঞানে দিব্যলোকে চলে গেছে। মৃত্যুর পূর্বে একটি উইল করে গেছে। উইলটি রয়েছে রামধারী মিশ্র উকিলের কাছে।

উইল সম্বন্ধে আমার কোন আগ্রহ ছিল না। তবুও বাড়িওয়ালার পীড়াপীড়িতে রামধারী মিশ্রকে খুঁজে উইল দেখতে চাইলাম।

উইলে তার সঞ্চিত অর্থ সর্তাধীনে আমাকে দিয়ে গেছে মেনিমাসী। সর্তটি ছিল তার পছন্দ করা মেয়েটিকে তিন বছরের মধ্যে বিয়ে করতে হবে। যদি বিয়ে না করি তা হলে সব কিছু সম্পত্তি পাবে তার পছন্দ করা সেই মেয়েটিই।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

পরের ট্রেনেই কলকাতা ফিরলাম। ফেরবার আগে সংবাদ নিয়েছিলাম মেনিমাসীর সইয়ের। তারা দেওঘর ছেড়ে কোথায় গেছে তা কেউ জানে না। তবে এরকম অন্যত্র যাওয়া তাদের পক্ষে নতুন নয়। এর আগেও দুতিনবার অজ্ঞাত স্থানে ওরা গেছে, আবার ফিরে এসেছে। এবারও নিশ্চয়ই তারা ফিরে আসবে।

সংবাদটি আমার পক্ষে খুব প্রয়োজনীয় না হলেও জেনে নিলাম। কেননা, পছন্দ করা মেয়েটি মেনিমাসীর সইয়ের মেয়ে।

কলকাতা এসেই প্রথম দেখা নেপার সঙ্গে।

নেপা মাঝে মাঝে আমার কাজ করে। বিশেষ করে সে হল বোমা তৈরীতে ওস্তাদ। কোথাও গোলমাল বাধাতে হলে নেপার শরণাপন্ন হতে হয়। অবশ্য নেপা বাদেও আমার আরও কয়েকটি সঙ্গী রয়েছে। নেপার বিশেষত্ব সে খুবই অনুগত। অন্য সব হাঙ্গামাকারীর মত মনিব বদল করে না।

আমাকে দেখেই নেপা বলল, দাদার অপেক্ষায় আছি।

কেন রে?

মন্ত্রীরা আমাদের সবাইকে ডেকেছিল।

কাকে ?

আমাকে। নেপা বলল, লাল ঝাণ্ডাওয়ালারা খুবই শয়তান। ওরা নানা আন্দোলন করে সরকারকে বিব্রত করছে। কিছু ব্যবস্থা করতে হবে।

বললাম, নিশ্চয়।

ওরা বলল, ওরা যখন পুলিশের সামনে আসবে তখন গোলমাল বাধাতে হবে।

বললাম, ওটা তো নতুন কিছু নয়।

নতুন না হলেও জনমত আছে। লোকে নিন্দা করে। বলে, সরকার নিরীহ শোভাযাত্রীদের পেটায়। তাই।

হেসে বললাম, তাই তোরাও দল নিয়ে শোভাযাত্রায় থাকবি। শোভাযাত্রার মাঝ থেকে পুলিশকে পটকা মারবি। পুলিশ যখন পেটাবে তখন লাল শালাদের ওপর বোমা মারবি।

কিন্তু।

টাকা তো ওরাও দেবে, কিন্তু লাল শালাদের শায়েস্তা করা চাই।

নিশ্চয় নিশ্চয়।

নেপা একগাল হেসে হাত বাড়াল।

তার হাতে কয়েকখানা নোট গুঁজে দিয়ে বললাম, আমি বিয়ে করব ঠিক করেছি।

অবাক হয়ে নেপা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আপনি বিয়ে করেন নি দাদা ?

সময় পাইনি।

হেসে নেপা আবার বলল, আমরা বিয়ে করে বউ পালবার পয়সা পাই না তাই বিয়ে করি না, পচা হাড়কাটা গলির অন্ধকার পথে ঘুরে জীবন কাটাতে হয়। আর পয়সা থেকেও আপনার অবসর মেলে নি বিয়ে করার, আশ্চর্য !

হেসে বললাম, তাই হয় রে, তাই হয়। যা নিজের কাজে যা।

নেপা দাঁড়িয়ে বলল, একটা কথা বলব দাদা!

কি কথা?

একটা খুব ভাল মেয়ে আছে। তবে খুব গরীব। বাবা মরে গেছে, লেখাপড়াও কিছু জানে।

বাধা দিয়ে বললাম, তোদের দলের কারও বুঝি।

না দাদা। নেপা গুণ্ডা মদ খায়, বেশ্যা বাড়ি যায়, চোলাই বিক্রি করে কিন্তু সেও ভাল মন্দ চেনে। আমাদের দলের মেয়ে হলে আপনাকে সে কথা বলব কেন। যদি নিজে বিয়ে না করেন, কারও সাথে বিয়ে দিয়ে দিন, কিম্বা একটা চাকরি।

হেসে বললাম, নেপা যে এত মহত তা আজ জানলাম। চাকরি মানে ঝিয়ের চাকরি!

সেকি দাদা! মেট্রিক পাশ মেয়ে।

তাই নাকি। আচ্ছা ভেবে দেখব।

তিন দিন পরে খবরের কাগজ খুলে দেখলাম, গতকাল সন্ধ্যার শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ। শোভাযাত্রীরা পুলিশের ওপর বোমা মারতেই পুলিশ মৃদু লাঠি চার্জ করেছিল। বোমার আঘাতে তিনজন পুলিশ বিক্ষত আর একুশজন শোভাযাত্রী লাঠির আঘাতে অল্পবিস্তর আহত হয়ে হাসপাতালে স্থান নিয়েছে।

এরপর নেপাকে আশা করছিলাম।

অনেক বেলায় নেপা এল। মাথায় ব্যাণ্ডেজ।

একি নেপা?

নেপা হাসতে হাসতে বলল, উল্টো ফল। শালারা চিনে ফেলেছিল। তারপর গলিতে টেনে নিয়ে চরম ধোলাই দিয়েছে।

আমি শঙ্কিত হলাম।

বর্মার যুদ্ধ ফেরতা নির্মল যেন ভয় পেল।

সত্যিই তো, নিরীহ মানুষ পেটানোর পেছনে রাজনীতি থাকলেও

সে রাজনীতি হল শাসকদলের আত্মহত্যাকারী রাজনীতি, কেননা এর পেছনে কোন সুনীতি নেই। নেপা তার প্রথম নিদর্শন। চোরের দশ দিন পুলিশের একদিন। অনেক অন্যায় করলেও একদিন তারও যে জবাবদিহী করতে হবে তা বুঝতে পেরে আমি শঙ্কিত হলাম।

নেপার হাতে টাকা দিয়ে বললাম, ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা কর।

পকেটে টাকা রাখতে রাখতে নেপা বলল, সেই যে মেয়েটার কথা বলেছিলাম। তার মাকেও বলেছিলাম। দেখতে যাবেন একবার।

যাব, বলেই মনে হল বিয়ের ব্যাপারে পরিচয় হল বড় কথা। জ্ঞাতি গোত্র কুটুম্ব সাক্ষাতের পরিচয় দরকার। আমার কি পরিচয়! কে আমার বাবা, কে আমার মা, কি আমার অতীত! এসব প্রশ্ন উঠলে আমার বিয়ে হওয়া মোটেই সম্ভব নয়। কথাটা ভেবে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম।

কি ভাবছেন দাদা?

ভাবছি যাব কিনা!

যেতে কি দোষ। বিয়ে করাটা আপনার ইচ্ছা। পছন্দ না হলে বিয়ে করবেন না।

নেপার যুক্তি অকাট্য।

বললাম, বেশ। দিন ঠিক করে আসিস।

দিন আপনি ঠিক করুন। মেয়ে পক্ষের আবার দিনক্ষণ কি!

তা বটে! আচ্ছা, আগামী বুধবারে যাচ্ছি। তুইও থাকিস নেপা।

তা বলতে। আমি কন্যাপক্ষের মাসী বরপক্ষের পিসী সেজে শুভ কাজটা ঘটিয়ে দিলে টুপাইস তো হবে দাদা?

তা হবে। বলে হাসলাম।

নেপাকে বিদায় করে নিজের মনেই হাসলাম।

ছোট বেলায় রামখেলাওন আর নিরুপিসীকে দেখেছি, আরও দেখেছি মেনিমাসী আর অনিলমেসোকে। তাদের রুগ্ন মনের সঙ্গে

পাল্লা দিয়ে যৌন অভিসারও নজরে পড়েছে। তার প্রতিক্রিয়া কখনও চিন্তা করিনি। বড় হয়ে সোলেমান ও অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে স্থানে অস্থানে বেড়িয়েছি, তাদের যৌনবিলাসের নগ্নরূপও দেখেছি। যৌন পিপাসা মনের কোনে পাকাপাকি বাসা বাঁধতে পারেনি। আজ কেন নারীর সঙ্গ ও সাহচর্য পেতে এরকম আবেগ জন্মাল তা ভেবে দেখিনি। তবুও মনে হয়েছে বিয়ে করাটা আমার প্রয়োজন, প্রয়োজনের তাগিদ এতবেশি যে নেপার মত লোককেও আমার মনের কথা বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা অনুভব করিনি।

আবার কাজের নেশায় মেতে উঠলাম।

যথাযথ নির্দেশ পাওয়া মাত্র নিজের কাজে জড়িয়ে পড়ি। সঙ্গী সঙ্গিনীরা আমার সঙ্গে কাজ করতে করতে গলদঘর্ম হয়ে ওঠে। কাজের শেষ নেই।

নির্দেশ পেলাম, যে কোন উপায়ে লাল ঝাণ্ডা দলে নাম লিখিয়ে তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে হবে। তাদের মধ্যে মার্কিনী মনোভাবসম্পন্ন লোক খুঁজে সংবাদগুলো দলের প্রধান কার্যালয়ে পৌঁছে দিতে হবে। নির্দেশ প্রতিপালন যে কত কঠিন তা ভেবে ঠিক করার চেয়ে কার্যক্ষেত্রে তার রূপদেখা বেশি ভয়ঙ্কর।

মিত্তির মশায়কে চিনতাম। পুরানো কমরেড। নেমতন্ন করলাম একদিন। আমার বাড়িতে সঙ্গী সঙ্গিনীরা হাজির ছিল। তাদের সঙ্গে পরিচয় করে দিলাম। নিজেকে তাদের দলের হিতাকাঙ্ক্ষী বলে পরিচিত করতে বেশ মোটা হাতে চাঁদা দিলাম তাদের সংবাদ-পত্র ফণ্ডে।

মিত্তির হেসে বলল, আপনার মত পার্টি দরদী—

বাধা দিয়ে বললাম, বেশি প্রশংসা নিন্দনীয়। আমার কর্তব্য আমি করেছি। সামর্থ্য থাকলে আরও করতাম। কিন্তু আমার মত দরিদ্র সেবকের এর বেশি কিছু করার নেই।

মিত্তির খুশী মনে বলল, নিজেকে ছোট করতে চাইলেই ছোট

হওয়া যায় না নির্মলবাবু। মার্কসীয় দর্শন বুঝাতে আমরা গলদঘর্ম হয়ে যাই, 'বিপ্লব বিপ্লব' করে চিৎকার করলেও বিপ্লবের উপযুক্ত জমি তৈরী করতে পারিনি আজও। কারণ, শক্তিশালী ধনতন্ত্রীদের কুক্ষিগত থাকে দরিদ্রদেশের অশিক্ষিত মানুষেরা। আমাদেরও তাই হয়েছে। দ্বিতীয় পথ খুঁজে দেবার দায়িত্ব আমাদের। কিন্তু সেটা কেতাবী কথা, আমরা পথ খুঁজে দিতে পারিনি এখনও। তবে আশা রাখি মানুষ আরও সচেতন হবে, বিপ্লবের পথও প্রস্তুত হবে। আমাদের কাজের পথে অন্তরায় হল আর্থিক দৈন্য। এই দীনতা আমাদের প্রচার ব্যবস্থাকেও অচল করে রেখেছে। আপনার এই সাহায্য সেই প্রচার ব্যবস্থার পথে কিছুটা সাহায্য করবে, সেজন্য ধন্যবাদ।

কথা না বাড়িয়ে নিজের গাড়িতে করে মিত্তিরকে পৌঁছে দিলাম তার বাড়িতে।

আমার কাজ করার প্রাথমিক পর্যায় মোটামুটি সাফল্যজনক মনে হল। রাত পেরিয়ে দিন হতে না হতেই দেখা গেল দুচার জন কমরেড আসা যাওয়া আরম্ভ করেছে আমার ফ্ল্যাটে। আমিও তাদের স্বাগত জানিয়ে ষোড়শোপচারে আপ্যায়ন করতে থাকি। ওদের ওপর মহলেও আমি পরিচিত হলাম। নীচের মহলে আমার জালে পা দিতে লাগল কেউ কেউ। তখনও আসল উদ্দেশ্য সফল হতে অনেক বিলম্ব।

ভাঙ্গন ধরাবার পথ খুলে গেল।

গোপনে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আলোচনা চলল।

সংবাদ সংগ্রহ করে তা যথাসময়ে পাঠানো হতে থাকে। এত বড় শক্তিশালী দলের সভ্যদের এভাবে জালে ফেলা যাবে তা ভাবতে পারিনি। মিত্তিরের অমোঘ যুক্তিই জয়লাভ করল। শক্তিশালী ধনতন্ত্রীদের কুক্ষিগত হল দরিদ্র কমরেডরা। এদের অনেকেই টেস্‌-টেড কমরেড। অনেকে ছোটখাট নেতা, যারা ভবিষ্যত গড়বার স্বপ্ন

দেখছে নেতৃত্বের শিখরে বসে। কিন্তু চোরে কামারে দেখা হয় না কখনও। পরস্পরের কাছে পরস্পর অপরিচিত। তাই সংবাদ যাচাই করার সুযোগ থাকে বেশি।

নেপার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে মেয়ে দেখতে গেলাম সারপেনটাইন লেনের একটা দোতালা বাড়ির নীচের তলার একটি ছোট্ট অন্ধকার ঘরে।

বাইশ তেইশ বছরের মেয়ে অমিয়া। স্বাস্থ্য ভাল, গায়ের রং শ্যামবর্ণ, মুখের, কাটিং চলন সই। আমার সামনে এসে বসল অমিয়া।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নাম।

মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল, অমিয়া হালদার।

আপনি কতদূর লেখাপড়া করেছেন ?

ম্যাট্রিক পাশ করেছি দ্বিতীয় বিভাগে।

আর পড়েন নি কেন ?

বাবা মারা যাওয়াতে পড়া বন্ধ করতে হয়েছে।

একটা কথা বলতে চাই, সেই কথাটার ওপরই আমার আর আপনার সম্মিলিত জীবন নির্ভর করছে। যদি সে সব কথা শুনে আপনি বিয়ে করতে রাজি থাকেন আমাকে, তা হলে আমার দিক থেকে কোন আপত্তি নেই।

মৃদুস্বরে অমিয়া বলল, বলুন !

আমার বাবাকে আমি দেখিনি। আমার মা কোন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেন। আমাকে ঈশ্বরের করুণার ওপর ছেড়ে দিয়ে মা চলে যাবার পর পরের দয়াতে আমাকে বাঁচতে হয়েছে। সেই বাঁচার জীবনটা মোটেই গৌরবের নয়।

অমিয়া ততক্ষণ ঘেমে উঠেছে। তার চোখমুখ লাল। আমি থেমে গেলাম।

কিছুক্ষণ থেমে বললাম, আপনার বাবার নাম ?

নাম বলতেই চমকে উঠলাম। পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে গেল। গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, কোন রকমে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার মায়ের নাম কি বিরজা?

অমিয়া মাথা নেড়ে বলল, হাঁ।

আমি আর কিছু বলতে পারলাম না। কোন রকমে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালাম।

নিজেকে সামলাতে তিনটে দিন কেটে গেল।

চারদিনের দিন কাগজ কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসলাম। লিখলাম:

কল্যাণীয়া অমিয়া,

তোমার মুখে তোমার বাবার ও মায়ের নাম শুনেই পালিয়ে এসেছি। তিনদিন ভেবেছি তোমাকে কি লেখা উচিত! অনেক ভেবে ছোট্ট এই চিঠিখানা লিখছি। তোমার মা বিরজা আমারও মা। আমার এই মা শৈশবে আমাকে ফেলে রেখে তোমার বাবার সঙ্গে গৃহত্যাগ করেন। কোনদিন আমার কোন সংবাদও নেননি, আমিও আজ পর্যন্ত আমার মাকে দেখিনি। সম্পর্কে আমরা একই মায়ের গর্ভজাত সন্তান, ভাই ও বোন। আমাদের সম্মিলিত জীবন সম্ভব ভাই বোন হয়ে, স্বামী-স্ত্রী রূপে নয়। তাই আমার কথা তোমাকে জানিয়ে ক্ষমা চাইছি। ইতি:

নির্মল

চিঠিখানা ডাকে দিয়ে সারাদিন পায়চারি করলাম সারা ঘরময়। অশান্তি! কেন অশান্তি! জীবনে শান্তিতো পাইনি একটি দিনের জন্যও। অথচ অজেকের এই অশান্তি যেন সবচেয়ে মর্মান্তিক! কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না।

ছায়াছবির মত সারাজীবনের ঘটনাগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠল।

কি করেছি এতকাল। ভেবেছি সারারাত। সকাল বেলাতেও শেষ হয়নি সে ভাবনা।

শুধু বাঁচার নেশায় ছুটে বেরিয়েছি দেশ দেশান্তরে, নিজের দেশের সর্বনাশের পথ খুলে দিয়েছি শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থ বজায় রাখতে, কলঙ্কিত করেছি নিজেকে নিজের কর্ম দিয়ে। আর নয়।

টেলিফোন বেজে উঠল।

কে?

আমি অমিয়া। আপনার চিঠি পেয়েছি দাদা।

কথা আটকে গেল গলায়।

আপনি আসুন একবার।

না।

কেন? মা লজ্জিত দুঃখিত এবং অসুস্থ।

মাপ করতে হবে অমিয়া।

অভিমান। কি চান আপনি?

বাঁচতে, শুধু বাঁচতে। আমাকে বাঁচতে দাও অমিয়া। সামান্য সম্বল নিয়েই বাঁচতে দাও।

টেলিফোন ছেড়ে দিলাম।

ছুটে বের হলাম ঘর থেকে। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে সোজা গেলাম চৌরঙ্গিতে। বিচলিত মনের ছবি ফুটে উঠেছিল আমার অবয়বেও। আমার চেহারা দেখে চমকে উঠল কডগেল। আমার মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে কডগেল জিজ্ঞেস করল, তুমি কি অসুস্থ?

ধৃত অপরাধীর মত বিনীতভাবে বললাম, না।

কিন্তু তোমাকে দেখে তাই মনে হচ্ছে। কোথাও কিছু অঘটন যে ঘটেছে তা বুঝতে পারছি।

ধপাস করে চেয়ার টেনে বসে পড়লাম। হাঁপাতে হাঁপাতে

বললাম, আমি বিদেশে যেতে চাই মিস্টার কডগেল। কেমন একটা অশরীরির ভীতি আমাকে উদ্ব্যস্ত করে তুলেছে। তার হাত থেকে মুক্তি চাই। আমার বিদেশ যাবার ব্যবস্থা করে দাও মিস্টার কডগেল।

অতি শান্তকণ্ঠে কডগেল বলল, তোমার মানসিক বিভ্রান্তি ঘটেছে। এক পেয়ালা কফি খাও। শরীর আর মন দুটোই সুস্থ হবে। বেয়ারা দুপেয়ালা কফির ব্যবস্থা কর। তোমার বিশ্রাম প্রয়োজন। যে দায়িত্বপূর্ণ কাজ তুমি করছ তাতে সাময়িক উত্তেজনা ঘটা স্বাভাবিক।

অসম্ভব নয়। আমার বিশ্বাস কিছুকাল বাইরে থাকতে পারলে এই উত্তেজনা হ্রাস পাবে। তুমি তার ব্যবস্থা করে দাও।

তার ব্যবস্থা অবশ্যই করব। তোমার দেহ ও মন যে ক্লান্ত তা তোমার মুখের চেহারায় বেশ ফুটে উঠেছে। বাড়িতে বুঝি ঝগড়া করেছ!

হেসে বললাম, বাড়ি বললে যা অর্থ হয় সে বাড়ি আমার নেই, ছিল না, কখনও হবেও না। ঝগড়া করছি নিজের মনের সঙ্গে, বিবেকের সঙ্গে।

কফি খেতে খেতে কডগেল বলল, ফরমগুলো সই করে কয়েক কপি ফটো দিয়ে যেও। তোমার বাইরে যাবার ব্যবস্থা আমি করে দেব। কেমন!

বললাম, যথা অভিরুচি।

পনরদিন না পেরোতেই কডগেল ডেকে বলল, তোমার পাশপোর্ট এসেছে নির্মলবাবু। কোথায় যাবে স্থির করেছ?

বললাম এখনও ঠিক করিনি।

ভিসা চাই। ভিসা নেবার জন্য স্থান নির্বাচন প্রয়োজন।

অবশ্যই। আমাকে ভাবতে দাও। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমি ফিজিতে যাব।

ফিজি !

ফিজির নাম শুনে কেমন চমকে উঠল মিস্টার কডগেল।

অদ্ভুত তোমার চয়েস। তার চেয়ে ইউরোপ ঘুরে এস। সেখান থেকে ন্যুইয়র্ক। দেখে এস আমাদের দেশ। সেখানে তোমার মন বদলাবে, দৃষ্টিভঙ্গী বদলাবে।

আমি স্বেচ্ছা নির্বাসন চাই। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ছোট্ট ঐ ফিজি দ্বীপে অশান্ত মনকে লাগাম দিয়ে পরিতৃপ্তি পেতে চাই। ফিজিতে অনেক ভারতীয় আছে, তাদের মাঝে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে নিজের কৃতকর্মকে ভুলতে চাই।

আশ্চর্য !

আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হবে। প্রাচ্য আর প্রতীচ্য দুটোর মাঝে রয়েছে পার্থক্যের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। সেই প্রাচীরের এক পাশে বসে রোদন করছে প্রাচ্যের অনুন্নত মানুষের দল, আরেক পাশে আনন্দ উল্লাসে ভেঙ্গে পড়ছে বিলাসবহুল প্রতীচ্য জীবন। আমি রোদনের সহচর হতে চাই। কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করব, অশ্রুতে ক্ষমার আবেদন পৌঁছে দেব মানুষের ঘরে ঘরে। ভিক্ষা চেয়ে নেব তাদের সহানুভূতি।

আমাকে বুঝতে পারলনা কডগেল। স্নায়বিক দুর্বলতা মনে করে চুপ করে রইল। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বললাম, দরিদ্র মানুষের নীতিবোধ থাকা উচিত নয়। থাকেও না ! আমিও নীতিবোধকে অজ্ঞাতে হত্যা করেছি। প্রাণ থাকলে বাঁচার প্রেরণা থাকে। প্রাণী মাত্রেই বাঁচতে চায়, আমিও চেয়েছি। চাওয়ার মাত্রা হারিয়ে নিজেকে বিক্রী করেছি, অন্নদাস থেকে ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছি। বোধশক্তি হারিয়ে পাশব বৃত্তিকে বেশি মূল্য দান করেছি। আর্থিক প্রাচুর্য এসেছে ঠিকই, জীবনধর্মকেও করেছি ভোগবহুল, কিন্তু কিসের বিনিময়ে !

কডগেল চমকে উঠল এবার। বক্তব্য কিছুটা স্পষ্ট।

বললাম, তুমি আমার কাছ থেকে এসব উক্তি নিশ্চয়ই আশা করনি কখনও। তবুও বলছি, কেন বলছি জানো? বিবেক। বিবেক আমাকে প্রেরণা দিচ্ছে বলতে। আমার ব্যক্তিগত সম্পদ সমষ্টিকে নিধন করে, সমষ্টির স্বার্থ বলী দিয়ে, দেশের সর্বনাশকে ডেকে এনে। এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি থাকতে পারে বলতে পার?

বাধা দিয়ে কডগেল বলল, কি বলছ নির্মলবাবু!

ঠিক বলছি বন্ধু। তুমি ভারতে এসেছ তোমার দেশের স্বার্থ বজায় রাখতে। সারা ভারত জুড়ে তোমরা যে ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়েছ তারই একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিন্দু তুমি। অথচ তোমার দান তোমার দেশের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আমি কি করেছি। অন্নের আশায়, ব্যক্তিগত প্রাচুর্যের আশায়, ভোগবৃদ্ধির আশায় আমি আত্ম-বিক্রয় করেছি, দেশের স্বার্থকে বলী দিয়েছি। তোমার আর আমার পার্থক্য কর্মগত। তুমি ভ্রান্ত হলেও জাতীয় আদর্শ আঁকড়ে ধরে রয়েছ, আর আমি, আমি নিজেকে অভ্রান্ত মনে করে আমার দেশের স্বার্থহানি ঘটাতে আদর্শহীন হয়েছি। পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলোতে তোমাদের স্বার্থ বজায় রাখতে আমার মত হাজার হাজার বিশ্বাস-ঘাতক সৃষ্টি হয়েছে। তারা বিশ্বাসঘাতক হয়ে জন্মায়নি। তাদের দারিদ্রের মাঝে ঠেলে দিয়েছে সমাজের শীর্ষ ব্যক্তিরা। তাদের দারিদ্রের সুযোগ নিয়েছ তোমরা, তাই ভাল মানুষের দল একদিন একটু একটু করে ধীরে ধীরে নিজের অজ্ঞাতে বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। এবার আমি বিশ্রাম চাই। পরম ও চরম বিশ্রাম পেলেও আমার কোন অভিযোগ থাকবে না।

কডগেল বোধহয় ফিরে পেল তার মনকে। মৃদুস্বরে বলল, ঠিকই বলেছ নির্মলবাবু। তুমি অবশ্যই দারিদ্রের পেষণ সহ্য করতে না পেরে আত্মবিক্রয় করেছ। কিন্তু তোমাদের তথাকথিত নেতারা কেন অর্থের জৌলুষে নিজেদের হারিয়ে ফেলেছে! তোমাদের প্রতিটি

দলে, সরকারী প্রশাসনের উচ্চশীর্ষে যারা বসে আছে, তারাও আমাদের অনুচর, এ বিষয়ে তোমার বাস্তব জ্ঞান রয়েছে নিশ্চয়ই।

লোভ। সামান্য থেকে মানুষ বেশির দিকে অগ্রসর হয়। অবচেতন মনে থাকে সম্পদ লিপ্সা। সামান্যপ্রাপ্তি ঠেলে নিয়ে চলে অধিকপ্রাপ্তির দিকে। পথ যখন থাকে না তখন কুপথকে আশ্রয় করতে হয়। দেশ, জাতি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, পরিবার সব কিছু ভুলে ব্যক্তিগত সম্পদের দিকে হাত বাড়ায়। এরাও তাই করছে ও করবে ভবিষ্যতে। কিন্তু সেটা বিচারের মানদণ্ড নয়। আমার মত তারাও বাঁচতে চেয়েছে, সে বাঁচার মূল্য দিতে সর্বনাশ ডেকে আনছে দেশের ও দশের। তারা জানে, তারা জ্ঞানপাপী, ক্ষমার অযোগ্য।

বলতে বলতে হাঁপিয়ে পড়েছিলাম।

কডগেল তখনও ধীর স্থির। বিনা উত্তেজনায় ধীর কণ্ঠে বলল, তুমি উত্তেজিত হয়েছ নির্মলবাবু। তোমার মানসিক বিপর্যয় ঘটেছে। স্থান পরিবর্তনই তোমার উপযোগী। তোমার ফিজি যাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কাগজপত্রগুলো প্রস্তুত করে দিয়ে যেও।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে এলাম কনসাল অফিস থেকে।

সোজা এলাম গঙ্গার ধারে। গাড়ি পার্ক করে বসলাম গোয়ালিয়র স্তম্ভের নীচে। খোলা বাতাসে শরীর আর মন জুড়িয়ে গেল। ক্লান্তির হাত থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি পেলাম।

সময় এগিয়ে চলছে।

হাতঘড়ি দেখবার সময় পাইনি।

রাতের আলো জ্বলছে। স্টাণ্ডের কালো পীচ চকচক করছে। গঙ্গার বুক বেয়ে ছুটে আসছে মিঠে হাওয়া। আলোর ছাপ পড়েছে নদীর বুকে। নদীর বুকে নৌকা, স্টিমার আর জাহাজের ভীড়। মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতাভঙ্গ করে স্টিমার ছুটছে নদীর বুকে ঢেউ তুলে। দেখছি। অস্তের দিকে দৃষ্টি অনন্তের সন্ধানে।

অন্ধকার গাছের তলায় জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে কয়েকটি বাচ্চা নিয়ে একটা কুকুর। বাচ্চাগুলো মায়ের বুকে মুখ গুঁজে দুধ খাবার জন্য লড়াই করছে নিজেদের মধ্যে। পাশেই ইঁট সাজিয়ে রান্না করছে একটি দম্পতি। তাদের ছেলেমেয়েরা শুয়ে রয়েছে মাটিতে। উন্মুক্ত আকাশতলায় তাদের সংসার। ভাবনা নেই পর দিবসের, আজকের মত তারা বাঁচার রসদ ফোটাচ্ছে মাটির হাঁড়িতে। কুকুরটা মাঝে মাঝে মুখ উঁচিয়ে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে দেখছে রন্ধন-ব্যবস্থা, আশা করছে উপরি পাওনার।

সামনে দূরান্তে যাবার সারিবদ্ধ জাহাজ থেকে কালো ধোঁয়া আকাশটাকে কালো করে তুলছে। ভোঁ আওয়াজ তুলছে সময়ের সঙ্কেত দিতে।

সম্বিত ফিরে পেলাম। কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম।

হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলেছি।

আর নয়।

ফিরে এসে গাড়িতে স্টার্ট দিলাম। জনমানব বিরল ময়দানে ছুটে চলেছে আমার গাড়ি। গাড়ির গতি মিটারের শেষ কাঁটায়, গতিপথ খিদিরপুরের দিকে। কোথায় যাচ্ছি নিজেই জানিনা। গাড়ি সঙ্কেত দিল তেল নেই। থামলাম পেট্রল পাম্পে।

গাড়ির গতি পথ বদল করে ঘড়িতে দেখলাম বারটা বাজতে বিশেষ দেরী নেই।

গ্যারেজে গাড়ি তুলে রেখে ঘড়িতে দেখলাম একটা।

কাগজ চাই।

লিখে রেখে যেতে চাই আমার কাহিনী। মানুষ জানুক, শুনুক, পড়ুক। কি চেয়েছি কি পেয়েছি তার হিসাব লেখার কাগজ চাই। শত চাওয়ার মাঝে যে চাওয়া সবচেয়ে বড় চাওয়া তার জন্যই আত্ম-বিক্রয় মনুষ্য সমাজে নতুন কোন ঘটনা নয়। আমার কাছেও নয়।

আজই প্রথম মনে হয়েছে আত্মবিক্রয়ের ফলাফল কত ভয়ঙ্কর। সেই ভয়ঙ্কর জীবনের ঠিকুজী লিখে রাখতে চাই কাগজে। কাগজ চাই আমার।

আলো নিভিয়ে শুয়েছিলাম।

অন্ধকারে টেবিল, ড্রয়ার খুঁজে দেখছি। কাগজ চাই, কাগজ পাওয়ার আশায় অন্ধকারে সারাটা ঘর ঘুরে বেড়াচ্ছি। অন্ধকার ঘরে আরও অন্ধকার আমার মনটা ক্রমেই যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিল। ক্লান্তিতে আবার শুয়ে পড়লাম।

কাগজ চাই না।

সংবাদপত্রও তো কাগজ। সংবাদপত্রের সংবাদদাতাদের ক দিন আগে মোটা হাতে দক্ষিণা দিয়েছি সত্যকথা না বলার উপদেশ দিয়ে। তারা মার্কিনী স্বার্থরক্ষা করতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে অর্থ পকেটে তুলেছে। কাগজ সত্য কথা বলে না। আমার লেখা কাগজও হয়ত সত্যকথা বলবে না। নেতিবাচক কথা হয়ত সম্মতিবাচক হবে। চাই না কাগজ। আমার মনের কথা মনেই থাকুক।

আলো জ্বাললাম।

সেলফ থেকে একখানা বই বের করে কয়েকটি পাতায় চোখ বুলিয়ে আবার বই বন্ধ করলাম। অসহ্য মনে হল এই বইকে আর বইয়ের লেখককে। লেখকের ছিল মনুষ্যধর্ম। সেই মনুষ্যধর্মকে হত্যা করতে আমিই উৎকোচ দিয়েছি পকেট ভর্তি করে। পরের বইয়ের ধরন বদলে গেল, মার্কিনী জয়গান প্রচ্ছন্ন রইল বইয়ের অভ্যন্তরে। আমার গুণমুগ্ধ লেখক তার নতুন বই উৎসর্গ করল আমাকে। সেই বই। নক্কারজনক, আমি জানি নক্কারজনক। দেশের সুস্থ মানুষকে বিপথে টেনে নিয়ে যেতে লেখক চেষ্টার ক্রটী করেনি আমারই অঙ্গুলি সঙ্কেতে। কিন্তু কে বোঝে, কে জানে সে গোপন তথ্যটি। বুঁজিয়ে রাখলাম বইখানা।

রাত পেরিয়ে গেল।

অনিদ্রায় কাটল সারারাত।

সকাল বেলায় ট্রামে চেপে গেলাম মেনকাদিদির বাড়িতে।

আমাকে দেখে মেনকা দিদি বসতে বলল, মুখের ওপর চোখ রেখে বলল, তোর কি অসুখ করেছে নিমু? তোর চেহারা এমন হল কেন?

কাল সারা রাত ঘুম হয়নি বড়দিদি। অসুখ বিসুখ সাধারণত আমার হয় না। কয়েক বছর মিলিটারীতে থাকায় শরীরটা বেশ পটু করে তুলতে পেরেছিলাম। তাই ডাক্তারকে দিব্যি কলা দেখিয়ে আসতে পেরেছি এতদিন। আপনার কাছে ছুটে এসেছি একটা সংবাদ দিতে।

কি এমন গুরুতর সংবাদ যে সারা রাত না ঘুমিয়ে সকাল বেলায় ছুটে এসেছিস্!

আমি দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি বড় দিদি।

কোথায়?

অনেক অনেক দূরে। ফিজি দ্বীপে।

থ' হয়ে গেল মেনকা দিদি। নিজের মনেই বলল, ফিজি!

সেখানে চাকরি পেয়েছিস বুঝি?—জিজ্ঞেস করল মেনকা দিদি।

না। সেখানে জীবনের বাকি কটা দিন বাস করব। আর কোন দিন আপনার চরণ দর্শন ভাগ্যে হবে কিনা জানি না, তাই ছুটে এসেছি দেখা করতে।

চিন্তিতভাবে মেনকাদিদি বলল, অত দূরে না গেলেই কি নয়!

এ কথা আমিও ভেবেছি বড় দিদি। ভেবে দেখলাম আরও দূরে সুমেরু অথবা কুমেরুতে যেতে পারলে আরও যেন ভাল হত। সংসারে চাইনি কিছু, পেয়েছি অনেক। নিমু চাকর নির্মলবাবু হয়েছে। অর্থের কৌলিন্যে আজ সে উপরতলায় ঘুরে বেড়ায় অবাধে। কিন্তু আমার জীবনের বড় চাওয়ার আজও কোন সমাধান হয়নি বড়দিদি। চেয়েছি অন্ন, পেয়েছি অনন্ত, চেয়েছি কোলীন্য, পেয়েছিও

অনন্ত, পাইনি শুধু বাঁচার মত বাঁচার অধিকার। তাই দেশে থাকবার অভিরুচি আর নেই, সে আকাঙ্ক্ষা বিলীন হয়ে গেছে মনের গোপন কন্দরে।

এত বৈরাগ্য ভাল কি!

বৈরাগ্য নয় বড়দিদি। বিতৃষ্ণা। বাঁচার রসদ জোটাতে আবিষ্কার করলাম আমি মৃত। আমিত্ব লোপ পেয়েছে, আমি একটা যন্ত্র আর সেই যন্ত্রের না আছে কোন সত্ত্বা, না আছে কোন অস্তিত্ব। মৃত মানুষ যখন সংসার চায় তখন সেটা হয় পরিহাস। চরম পরিহাস হল আমার পরিবার গঠনের পরিকল্পনা। যাকে সাথী করব ভেবে ছুটে গিয়েছিলাম তাকে পেলাম আমার গৃহত্যাগিণী মায়ের সন্তান রূপে। আমার মা কখনও চিন্তা করেননি আমার ভবিষ্যত, মায়া-মমতা তার ছিল অজ্ঞাত অনুভূতি, অথচ সেই মায়ের কন্যা অমিয়ার বিয়ের জন্য মা বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, আর পাত্ররূপে নির্বাচিত হয়েছিলাম আমি। এর চেয়ে পরিহাস আর কি থাকতে পারে বড়দিদি। শতাব্দীর অভিশাপ দারিদ্র, সেই দারিদ্র আমাকে দান করেছে মৃতের অট্টহাস্য। টেনে নিয়ে গেছে নীতিধর্মের কবরে। আমি আর আমি নই, আমি সমাজের কলঙ্ক, যুগের অভিশাপের প্রতীক।

মেনকাদিদি গম্ভীরভাবে আমার কথা শুনছিলেন। আমার সংলাপে কোন অংশ গ্রহণ না করলেও আমার বুঝতে ভুল হল না যে মেনকাদিদি গভীরভাবে আমারই বিষয় চিন্তা করছেন।

আমিও দম নিয়ে ভাবলাম।

মেনকাদিদি ঝিকে বলল খাবার দিয়ে যেতে।

আমি বললাম, মায়ের সঙ্গে দেখা করিনি, তেমন মনের শক্তি আমার ছিল না। দেখা করলে নিশ্চয়ই জানতে চাইতাম কোন উপাদানে তার হৃদয় ধর্মটি তৈরী।

মেনকাদিদি প্রবোধ দেবার ভঙ্গীতে বলল, বিয়ে তো হয় নি।

নাইবা হোল কিন্তু চাওয়ার যবনিকা নেমে এল পরিহাসের মাধ্যমে। পেটের দায়ে আত্মবিক্রয় করেছি। মার্কিন গুপ্তচর বাহিনীর এজেন্ট হয়ে দেশের সর্বনাশ করছি। সংসার পেতে নিজের ভগ্নীর পাণিপীড়ন করতে গেছি। তাই জীবনের মুখ্য তুটি পাওনা থেকে নিজেকে আলাদা করে নেবার চিন্তা করছি এখন। আপনি বলবেন, আরও মানুষ তো আছে এদেশে যারা আত্মবিক্রয় করেছে ও করছে। হ্যাঁ আছে। সমাজের প্রতিটি স্তরে রয়েছে, বিশেষ করে উচ্চপদে যারা আছে তাদের মধ্যেই আত্মঘাতী রয়েছে বেশি। কিন্তু এটা তো কৃতিত্বের কথা নয় বড়দিদি। এই কলঙ্ক আর বহন করতে পারছি না। পেটকে বঞ্চনা করতে পারিনি কিন্তু বিবেককে বঞ্চনা করেছি। অসহ্য!

ঝি খাবারের প্লেট সামনে রাখতেই মেনকাদিদি বলল, বড়ই উত্তেজিত হয়েছিস। পেটভরে খেয়ে নে। খাওয়ার পর আলোচনা করব।

খাওয়ার পর আর কোন আলোচনাই হয় নি। ঢিপ করে মেনকাদিদিকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লাম। সেইদিন মেনকাদিদির মুখের দিকে তাকিয়ে লাহাবাড়ির সেই স্নেহশীলা তরুণীকে আবার যেন দেখতে পেলাম। মা ও ভগ্নীর অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল তার দৃষ্টিতে। আমার জন্য তার যে ব্যথা তা প্রকাশ পেল তার স্থির প্রশান্ত ব্যথাতুর দৃষ্টিতে।

ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরেছিলাম।

দেশ ছেড়ে যাবার সংবাদ জানাবার মত আর কাউকে খুঁজে পেলাম না। মেনিমাসীও নেই, নিরুপিসীও নেই। ওরাই ছিল কমবেশি আমার আপন জন।

কদিন পরে কডগেল বলল, তোমার ভিসা রেডি। এবার এয়ার বুকিং কর।

এয়ার! না। আমি জাহাজে যাব মিস্টার কডগেল।

জাহাজে খুব কষ্ট হবে। সময় নষ্ট হবে। এয়ার প্যাসেজ পেলে তিন দিনে পৌঁছবে।

জানি। কিন্তু আমার দেশ থেকে লাফ দিয়ে অপরের দেশে গিয়ে বসতে চাই না। আমি দেশকে, দেশের মানুষকে দেখতে চাই দূরে দাঁড়িয়ে। বিমানের সোয়ারী হলে তা সম্ভব হবে না। জাহাজ ধীরে ধীরে ভারতের মাটি ছাড়বে, ভারতের দরিয়া পেরিয়ে যাবে, আমি জাহাজের রেলিং-এ দাঁড়িয়ে মন-প্রাণ দিয়ে দেখব আমার দেশকে, অন্তর দিয়ে অনুভব করব আমার দেশের বেদনাকে, কান পেতে শুনব অসহায় মানুষের রুদ্ধ ক্রন্দনকে।

কডগেল আর কথা বাড়ায় নি।

আমি জাহাজের টিকিট কিনতে পাঠালাম বেয়ারাকে।

ওসাকা মারু।

জাপানী জাহাজ। সুদূর প্রাচ্যে তার গতিপথ।

খিদিরপুর ডকে জাহাজে উঠলাম। আশ্রয় নিলাম কেবিনে।

প্রথম রাতে গঙ্গায় জল কম। জাহাজ চলবার কোন লক্ষণ নেই। মাঝ রাতে জোয়ার এলে জাহাজ ছাড়বে।

আজ শুক্লা দ্বাদশী।

আকাশ পরিষ্কার।

জ্যোৎস্নায় প্লাবিত দশ দিক।

ডেক চেয়ার পেতে বসে রইলাম জাহাজের ব্রীজে। কলকাতাকে শেষ বারের মত প্রাণ ভরে দেখতে থাকি। কেল্লা, ময়দান, নতুন সরকারী কর্মালয়, মহাধিকরণ আরও অনেক কিছু চোখের সামনে ভীড় করে দাঁড়ায়। ওপারে শালিমার ইয়ার্ডেও আলোর ছড়াছড়ি, চাঁদের আলোতে গা মিলিয়ে বিজলী আলোগুলো সলজ্জে যেন মুখ লুকাতে চায়। কলকাতার রুক্ষ হৃদয়হীন জীবনের পেছনে এত সৌন্দর্য যে জমা রয়েছে তা কখন ভাবতেও পারিনি। পাথর, পীচ,

ইট, কাঠ, বালি আর লোহার স্তূপ, পাথরের মত নীরস মানুষের হৃদয়, তার মাঝে রূপের বেসাতি নিয়ে বসে আছে কলকাতা শহর। কলকাতার জ্যোৎস্নাস্নাত রাত অলক্ষ্যে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে হাত ছানি দিচ্ছে আমাকে তোমাকে সবাইকে। এই সৌন্দর্যের আবরণে লুকিয়ে আছে কত ব্যথা, কত অশ্রু, কত তঞ্চকতা,—কে তার হিসাব জানে!

জাহাজ নড়ে উঠল।

ভোঁ শোনা গেল বার বার।

জাহাজ পথ করল নদীর বুক কেটে।

বিকাল বেলায় কেউ আসেনি আমাকে বিদায় অভিনন্দন জানাতে। সহকর্মীদের কেউ কেউ আসতে চেয়েছিল, তাদের নিষেধ করেছি। একা যাব, একা থাকব, একা সহ্য করব, একা উপভোগ করব, একা হাসব, একা কাঁদব—সঙ্গী চাইনা। চাইনা। কাউকে প্রয়োজন নেই আমার।

নেপা আমার জিনিসপত্র গোছগাছ করে দিয়েছে। সেই খবর নিয়েছে, সেই বারবার অনুরোধ করেছে দেশ ছেড়ে না যেতে।

হেসে বলেছিলাম, তোর রুজি রোজগার বন্ধ হবে বুঝি!

নেপার চোখ ছল ছল করে উঠেছিল।

বলেছিল, নেপা গুণ্ডা হলেও একটা মানুষ। জন্মেই গুণ্ডামি করিনি দাদা, আমাকে গুণ্ডা তৈরী করেছে সাদা টুপিওলা বাবুরা। এখন ওরা মন্ত্রী টন্ত্রী আর আমি চিরকালের গুণ্ডা। তবে তাদেরও যে আসতে হয় আমাদের কাছে, তাতো জানেন। তাই বলে ভাল-মন্দ বুঝতে আমরাও যে জানি না, তা মনে করবেন না দাদা। আমিও একটা মানুষ ছিলাম, এখনও কিছুটা মানুষ রয়েছি।

ভেবেছিলাম নেপা থাকবে জাহাজ ঘাটে।

তাকিয়ে দেখলাম। কেউ নেই। শূন্য। বিরাট শূন্যতা।

এইতো চেয়েছি, এইতো পেয়েছি।

জাহাজ চলছে ধীরে, এঁকে বেঁকে পথ করে এগোচ্ছে সমুদ্রের দিকে।

শেষ রাতের ফিকে জ্যোৎস্নায় স্নান করেছে আমার দেশ। নদীর কিনারায় গাছগুলো স্পষ্ট, ঘরবাড়িগুলো স্পষ্ট। আমি অপার তৃপ্তির দৃষ্টি দিয়ে দেখছি আমার দেশকে। এত সুন্দর, মহিমময় যে আমার দেশ, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। আজই প্রথম দেখলাম আমার দেশের প্রকৃত রূপ। এ রূপের কোন পরিচয় দেওয়া যায় না, এ রূপের ব্যাখ্যা করা যায় না। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করছি আমার দেশকে। জাহাজ এগোচ্ছে। সকাল বেলায় জাহাজ যখন নদীর বুক ছেড়ে সমুদ্রের বুকে আশ্রয় নেবে তখন দেখা যাবে নদী আর উপকূলের রূপ, সেরূপের বর্ণনাও যে অসাধ্য তা জানি।

জাহাজ চলছে।

ছল-ছল কল-কল আওয়াজ ভেসে আসছে কানে। শোনা যাচ্ছে ইনজিনের শব্দ। সকাল বেলায় তীররেখা সরে গেল চোখের সামনে থেকে, দূরে মিলিয়ে গেল ভারত। দিগন্তে শুধু জল আর জল। ডেক চেয়ার ছেড়ে উঠে গেলাম কেবিনে। বিছানা পাতা ছিল। শুতে শুতেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন অনেক বেলা। দেহের জড়তা তখনও কাটেনি। তবুও ছুটে গেলাম ডেকে। রোদে পিঠ দিয়ে ডেক চেয়ারে বসলাম। ভারতের তীরভূমি তখন অনেক অনেক দূরে, ছায়াটিও আর চোখে পড়ে না। আমার জীবনে সেই বোধহয় প্রথম দিন যে দিন সমস্ত অনুভূতি একত্রিত হয়ে প্রকাশ পেল অশ্রুতে। চোখ ভেঙ্গে নামল বন্যার মত জলের ধারা। রুমাল দিয়ে বারবার চোখ মুছেও সে প্লাবন রোধ করতে পারছিলাম না।

ওসাকা মারু চলছে গজেন্দ্র গতিতে। তার সঙ্গে ভেসে চলেছে আমার অতীত ব্যথা বেদনার স্মৃতির বোঝা।

আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থরাজি

বাংলা সমালোচনা ও সাহিত্য আলোচনা

বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস—ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়		...	১৮·০০
রবীন্দ্র মনীষা	ঐ	...	৫·০০
বাংলা সমালোচনার ইতিহাস	ঐ	...	১৫·০০
বীরবল ও বাংলা সাহিত্য	ঐ	...	৮·০০
আধুনিক বাংলা গীতিকবিতা [ওড]—ডঃ জীবেন্দ্র সিংহরায়		...	৮·০০
আধুনিক বাংলা গীতিকবিতা [সনেট]—	ঐ	...	৮·০০
শ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি—রঞ্জিত সিংহ	...	...	৫·০০
একান্তে—চাণক্য সেন	...	...	৬·০০

উপন্যাস

মোগল দরবার—বারীন্দ্র নাথ দাশ		..	...	১৪·০০
গড় নাসিমপুর	ঐ	..	...	৮·০০
সেদিন কৌশাম্বী	ঐ	..	...	৭·০০
লাল মহল	ঐ	...	..	৮·০০
ফুলমোতিয়া—প্রশান্ত চৌধুরী		...	...	৫·০০
উত্তরল্যাং দিশি—বিজন চক্রবর্তী		...	..	২·০০
কেয়া ফুল—সনৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়		...	.	২·০০
ডানকার্কের পতন—স্বরঞ্জন সেন (যন্ত্রস্থ)				
সিয়া একটি গোপন চক্র—বেদুইন		..	...	৮·০০
সে নহি সে নহি—চাণক্য সেন		...	...	১০·০০
মুখ্যমন্ত্রী—	ঐ	..	...	১০·০০
রাজধানী—স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়		...	...	১০·০০
দুপুর গড়িয়ে বিকেল	ঐ	...	...	৮·০০
শতাব্দীর অভিশাপ—বেদুইন		...	...	৮·০০
চোখ নীল আকাশ নীল	ঐ	...	...	৩·০০

উপন্যাস

মৌরী গ্রামের মেয়ে—যজ্ঞেশ্বর রায় ... ... ৪'৫০
কাছের জানালা—বীরেন্দ্র মিত্র ... ... ৪'০০
শুন বরনারী—সুবোধ ঘোষ ... ... ৩'০০
ছায়াবৃতা ঐ ... ... ২'৫০
চুম্বন—বিজন চক্রবর্তী ... ... ৪'০০
পূর্বমেঘ— ঐ ... ... ২'০০
বিদিশার নিশা—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ... ৩'০০
নতুন নাম নতুন ঘর ঐ ... ... ২'০০
মধ্যদিনের গান ঐ ... ... ৩'০০
মেঘরাগ—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ... ... ২'৫০
আলোকাভিসার—অজিত গাঙ্গুলী ... ... ২'০০
সুবর্ণ নগরী—বিষাণ মিত্র ... ... ৭'০০
রঙমহল—পরেশ ভট্টাচার্য ... ... ৫'০০
ঘানার কালো মানুষ—বেদুইন ... ... ৮'০০
নির্বাপিত সূর্যের সাধনা—জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় ... ৭'০০
কালবৈশাখী—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ... ... ২'৫০
তামস তপস্যা ঐ ... ... ৫'০০
মন্বন্তর — — ঐ ... ... ৮'০০
সৈকত—সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ... ... ৫'০০
স্পাই—বিক্রমাদিত্য (যন্ত্রস্থ)

গল্প গ্রন্থ

কুসুমেষু—সুবোধ ঘোষ ... ... ২'৫০
ভোরের মালতী—সুবোধ ঘোষ ... ... ২'০০
জতুগৃহ—সুবোধ ঘোষ ... ... ২'০০
রূপনগর—সুবোধ ঘোষ ... ... ২'৫০
কাচ ঘর—বিমল কর ... ... ২'০০
মনোমুকুর—সমরেশ বসু ... ... ২'৫০